মনের বিকার
ও প্রতিকার
ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

মনের বিকার ও প্রতিকার

মনের বিকার ও প্রতিকার

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী কল্যাণীকে

ভূমিকা
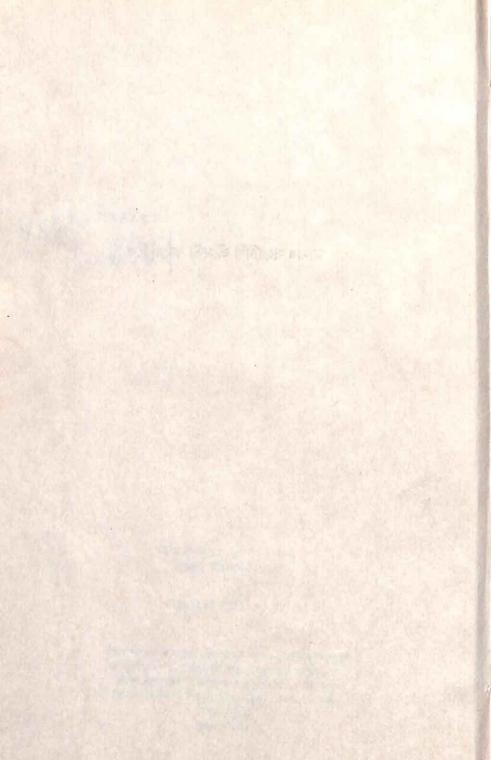
গত শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য। পরাধীন ভারতে ইংরেজ ও ইংরাজীর দাপটে বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান বা দর্শনগ্রন্থ শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা পায়নি। দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার পর চার দশক কেটে যাওয়ার পরেও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখার তেমন প্রসার দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ হয়ত অনেক এবং তা দূর করাও খুব সহজ নয়। তবে আমি বিশ্বাস করি বিজ্ঞানীদের অনাগ্রহই এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাংলায় বিশেষজ্ঞদের লেখা গ্রন্থের অভাব ছাত্র-শিক্ষক সকলেই অনুভব করেছেন।

কিছু কিছু প্রকাশক সংস্থা এদিকে কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। আশা করি প্রয়োজনের চাপে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার সহায়ক গ্রন্থ আরও বেশী প্রকাশিত হবে।

কিন্তু সমস্যা হলো জনসাধারণের পাঠোপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ কে লিখবেন ? কেই বা প্রকাশ করবেন ? আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল বিষয় নিয়ে লেখার যোগ্য বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে আসবেন কবে ? তাদের লেখা গ্রন্থ প্রকাশ করতে প্রস্তুত অভিজ্ঞ প্রকাশকই বা কৈ ?

কিছু শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দীর মত স্বনামধন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই মানসিক রোগ সম্বন্ধে শিক্ষিত জনসাধারণের পাঠোপযোগী একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

ডাঃ নন্দী শিক্ষক, চিকিৎসক এবং গবেষক হিসাবে যথেষ্ট সুপরিচিত। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মানসিক রোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্য নানা ভাবে চিকিৎসক, শিক্ষক, স্বাস্থ্য-কর্মী, সমাজকর্মী এবং শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি মানসিক রোগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য, ধারণা ও চিকিৎসা পদ্ধতি দেশের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং এ বিষয়ে জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করার জন্য অনলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন।

গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞের লেখা হলেও পাঠক কোথাও লেখকের পাণ্ডিত্যের ভারে পীড়িত হবেন না। কোথাও অতিকথন নেই, আবার কোথাও অতিসংক্ষেপের অস্পষ্টতাও নেই। বেশ ঝরঝরে ভাষায় কঠিন বিষয়কে সহজ করে বুঝিয়েছেন। মানসিক রোগের কারণ, বৈচিত্র্য, ব্যক্তিত্বের বিকার, যৌন বিকার, মানসিক রোগের চিকিৎসা, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই গ্রন্থে লেখক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা নিয়ে সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার প্রয়াস পেয়েছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করবে।

মুখবন্ধ

মানসিক রোগ বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ে আগ্রহী শিক্ষিত জনসাধারণের কথা মনে রেখে এই বই লেখা। মানসিক রোগ চিকিৎসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে যে মানসিক রোগ চিকিৎসার প্রধান অন্তরায় জনগণের এ বিষয়ে অজ্ঞতা এবং এই রোগগুলিকে ঘিরে নানা কুসংস্কার যা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এবং দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত আছে। মনের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে সেগুলির চিকিৎসা পদ্ধতির তেমন কোন অভাব নেই। অভাব হচ্ছে এই রোগ-চিকিৎসাকে গ্রহণ করার প্রতি লোকের আগ্রহের। এই আগ্রহকে উদ্বুদ্ধ করতে দরকার—উপযুক্ত বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার দ্বারা রোগ নিরাময় করে লোকের মনে আস্থার সঞ্চার করা এবং রোগ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের প্রচার। এই বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সাধারণ জনগণের মধ্যে এই রোগ বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান ও প্রতিকার ব্যবস্থার প্রচার। আশা করা যায় এ বিষয়ে শিক্ষিত জনগণকে অবহিত করতে পারলে সেই জ্ঞান সর্বজনের মধ্যে প্রবেশ করবে। এই বই লেখার সময় সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী সর্বশ্রেণীর শিক্ষক এবং যে সমস্ত রোগী আর তাদের অভিভাবকদের সংস্পর্শে আমি এসেছি তাদের কথা বিশেষ ভাবে মনে ছিল। এই বই স্নাতক শ্রেণীর ডাক্তারী ছাত্রদের এবং মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদের মানসিক রোগ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে। জেনারেল মেডিকেল চিকিৎসকদের (General Medical Practitioner) তাদের দৈনন্দিন কাজে এই বই সাহায্য করবে আশা করি। এই বই-এর আকৃতি ছোট রাখার চেষ্টা করেছি যাতে অল্প সময়ে সবটা পড়ে ফেলা যায়। এর বিষয়বস্তু নির্বাচনে—যেগুলি এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন সেগুলিই মাত্র আলোচনা করা হয়েছে।

এই বই-এ যে সমস্ত রোগীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাঁদের যাতে চিনতে না পারা যায় সে বিষয়ে সর্বদা সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। আশা করি যারা ডাক্তার নন এমন কোন পাঠক এই বই পড়ে ওষুধ প্রয়োগ করতে যাবেন না।

যদি কিছু লোকেরও এই বই পড়ে এই সব রোগ বিষয়ে আগ্রহ জন্মায় তাহলেই আমার লেখা সার্থক হয়েছে মনে করবো।

কলিকাতা,
বড়দিন,
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯১

ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অসংখ্য ছাত্র, সহকর্মী, রোগী এবং রোগীদের আত্মীয়স্বজন যাঁদের কাছে এই বই লেখার প্রাথমিক উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রী অদ্রীশ বর্ধনের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী—তাঁরই উৎসাহে এই বইলেখার প্রেরণা পাই এবং তাঁর সক্রিয় সহায়তা ছাড়া এই কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ছাত্র এবং সুহৃদ ডাঃ গোরাচাঁদ বড়াল, অধ্যাপক গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিশ্বজিৎ সেন, মনঃসমীক্ষক শ্রীমতী পূর্ণিমা গুপ্ত, বন্ধুবর শ্রীঅমিত পাল ও মনঃসমীক্ষক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বসু যাঁরা নানাভাবে আমাকে এই কাজে সাহায্য করেছেন তাঁরা আমার অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

অধ্যাপক ডাঃ ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী এম ডি (ক্যাল) এফ আর সি পি, পি-এইচ ডি (এডিন), যিনি বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তিনি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এর জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কয়েকটি ছবির জন্য 'The Mind', 'The Abnormal Psychology and Modern Life' এবং 'Modern Clinical Psychiatry' প্রভৃতি বইয়ের প্রকাশক যথাক্রমে Time-Life International, Scott Foresman এবং W.B. Saunders প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি ঋণী।

পরিশেষে আমার পরিবারের আমার কন্যা ডঃ শ্রীমতী শিবানী বেরা, দুই পুত্র ডাঃ সব্যসাচী নন্দী এবং ডাঃ পার্থসারথি নন্দী এবং দুই পুত্রবধূ শ্রীমতী অরুণিমা ও শ্রীমতী দীপান্বিতা, এঁরা সকলেই আমার এই কাজে সহায়তা করেছেন। আমি এঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

বিষয়সূচী

: চিত্রসূচী :

১
উপক্রমণিকা

মানসিক রোগ আমাদের সমাজে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কিন্তু কিছুদিন আগেও সাধারণ মানুষ এই রোগকে তেমন একটা আমল দিত না।

কারণ এর মূলে ছিল অনেক অন্ধ কুসংস্কার, ছিল অনেক অদ্ভুত ধারণা—যে সব ধারণা হাস্যকর, যুক্তিহীন এবং একেবারেই ভুল।

একটা ধারণার কথা আগে বলা যাক। মানসিক রোগ নাকি অনুন্নত আর গরিব দেশের সমস্যা নয়—এ সমস্যায় ভুগছে শুধুমাত্র সেইসব দেশ যারা যথেষ্ট উন্নত আর সমৃদ্ধ। বিচিত্র এই ধারণাই এককালে মনের মধ্যে পোষণ করে গেছে সমাজের সাধারণ মানুষ। নিঃসন্দেহে অজস্র ভ্রান্ত বিশ্বাস আর সীমাহীন অজ্ঞতা থেকেই এহেন হাস্যকর ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। ফলে, মনের রোগকে শরীরের রোগের মত গ্রাহ্য করা হয়নি। শরীরকে দেখা যায়, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খবরও মোটামুটি সকলের জানা আছে—সুতরাং শরীরের অসুখ বিসুখকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা যায়। কিন্তু মন? তাকে তো দেখাই যায় না—তার আবার অসুখ কি?

আজকের দিনে এই ধারণা একেবারেই অচল এবং অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু এই সেদিনও এবং এখনও সমাজের কোন কোন স্তরে মনের মধ্যে মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসেছে অত্যন্ত আশ্চর্য একটা ভুল ধারণা, মানসিক রোগ নাকি দূষিত হাওয়া বাতাসের জন্যই ঘটে! অর্থাৎ ভূত প্রেতের প্রভাব আর দেবতার অভিশাপে মনের রোগ ঘটছে। অতীতে বা পূর্বজন্মে যারা গর্হিত পাপকর্ম করেছে—সেই পাপের সাজা পেয়ে এখন মনোবিকারে ভুগছে।

খুবই স্বাভাবিক যে এই ধরনের বিচিত্র বিশ্বাস মনের মধ্যে যুগ যুগ ধরে শেকড় গেড়ে বসে থাকলে, মানসিক রুগীর আশে পাশের মানুষরা রোগের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন না—ধরনা দেন ওঝাদের কাছে। তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক, তাবিজ মাদুলি প্রয়োগ করে অপদেবতা আর ভূত বিতাড়নের বহুবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন।

মন্দির মসজিদ-গির্জাতে পূজো আর প্রার্থনার রেওয়াজ আগে ছিল এবং এখনও আছে, যাতে ঈশ্বর অশুভ প্রেতাত্মাদের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করে তার মনের রোগ সারিয়ে দেয়। পাপ কাজ করে যারা মনের অসুখে ভুগছে, তাদের জন্যে বিধান দেওয়া হত (এবং এখনও হয়)—দান খয়রাৎ করা হয়, হরির লুঠ দেওয়া হয় যাতে পাপ দূর হয়ে যায়। নানা ধরনের ভৌতিক প্রক্রিয়া এবং তাবিজ, কবচ, বালা, মাদুলি ইত্যাদি ধারণ করিয়ে

মানসিক রোগের প্রতিকার করার চেষ্টা হয়ে থাকে। এ শুধু অজ্ঞতা নয়—ঔদাসীন্য। বিভ্রান্তি নয়, অন্যায়। এই অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য আর বিভ্রান্তি শুধু যে অশিক্ষিত আর গ্রাম্য সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল তা তো নয়—শহরের শিক্ষিত সমাজও যে এই কু ধারণা পোষণ করত, তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়—স্নাতক স্তরে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পাঠক্রমে মানসিক রোগকে বিশেষ কোন স্থান দেওয়া হয়নি। আজও কি হয়েছে ? না, আজও সেই প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণাই প্রচ্ছন্নভাবে শিক্ষিত সমাজকেও আচ্ছন্ন করে তাকে উদাসীন রেখেছে। আজও চিকিৎসা বিদ্যায় যাঁরা স্নাতক হতে চলেছেন, তাঁরা মনোরোগ বিষয়ে শিক্ষার তেমন কিছু সুযোগ পান না। এর চেয়ে চরম অব্যবস্থা আর কি হতে পারে ? ডাক্তার যিনি হতে যাচ্ছেন, তিনি মনের অসুখের বৃত্তান্ত না জেনে ডাক্তার হচ্ছেন। আশ্চর্য এই অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য আর অবহেলার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান কিন্তু বসে নেই। মনের রোগ নিয়ে গবেষণা হয়েই চলেছে। জানা যাচ্ছে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য। দুটি জিনিস জানা গেছে খুব ভালভাবে।

তার একটি হচ্ছে : মানসিক রোগ আমাদের সমাজে গ্রামে এবং শহরে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে—যা উন্নত দেশের তুলনায় কম নয়।

দ্বিতীয়টা এই : মানসিক রোগের চিকিৎসায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে—যার ফলে অন্যান্য রোগ সারানোর মতই ওষুধ দিয়ে বেশীর ভাগ মানসিক রোগ সারানো সম্ভব হচ্ছে। আগে ধারণা ছিল—মনের রোগ চিকিৎসায় সারে না। যদিও বা সারে, তা অত্যন্ত খরচের ব্যাপার—এবং বড় বড় শহরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আর হাসপাতালেই তা সম্ভব।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছে এই সব ধারণাকে এবং প্রমাণ করে দিয়েছে যে অন্যান্য রোগের মতই সাধারণ ডাক্তারদের দিয়েও মানসিক রোগের চিকিৎসা হতে পারে।

ভারতবর্ষের গ্রামে এবং শহরে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, অন্ততঃ শতকরা একজন লোক যে কোন সময়ে কঠিন মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন এবং যে সব মানসিক রোগের চিকিৎসা অবশ্যই প্রয়োজন, তার পরিসংখ্যান হচ্ছে শতকরা অন্তত দশ। এছাড়াও দেখা গেছে, জনগণের অসুস্থতা-অক্ষমতার অন্তত এক পঞ্চমাংশ মানসিক কারণ থেকে ঘটছে। এছাড়াও আর একটা কথা আমাদের জেনে রাখা ভাল। সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের একটা শপথবাণী 'আলমা আটা'র ঘোষণাবাণী বলে পরিচিত। শপথ বাণীটা এই :

২০০০ সালের মধ্যেই সর্বজনের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার নেওয়া হবে। এই ঘোষণায় স্বীকৃতি জানিয়ে স্বাক্ষর করেছে ভারত। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে এবং সর্বতোভাবে এই শপথবাণীকে দৃঢ়ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করার কর্তব্যও থেকে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে।

উপস্থিত আমাদের যা দরকার, তা এই : মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বকে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বর সামিল করতে হবে এবং সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী আর সমাজকর্মীকে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এর ফলে এঁরা স্বাস্থ্যের অন্যান্য বিষয়ের মত মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান প্রচার করতে পারবেন জনগণের কাছে এবং প্রয়োজনে তাঁদের পথ প্রদর্শক হয়ে সব রকম সাহায্যও করতে পারবেন। তবেই সমাজে প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের মূলোৎপাটন সম্ভবপর হবে এবং সমাজ প্রকৃতই প্রগতির পথে আরও অগ্রসর হবে।

আপনাদের মত যাঁরা সমাজের মঙ্গল কামী অথবা স্বাস্থ্যকর্মী, এই সুমহান কর্মযজ্ঞে

নেতৃত্ব দিতে হবে তাঁদেরই, যাতে স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব নাগরিকই এই কাজে সামিল হতে পারেন।

মনে রাখবেন, স্বাস্থ্য কেবল একজনের নিরোগ দেহেরই পরিচায়ক নয়—স্বাস্থ্য একটি প্রগতিশীল জাতির প্রগতির প্রতীক। এই স্বাস্থ্য দৈহিক মানসিক এবং সামাজিক সুখ শান্তির বাহক॥

২

মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক রোগ

একই সঙ্গে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে যিনি সুস্থ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তিনিই প্রকৃত স্বাস্থ্যের অধিকারী।

স্বাস্থ্য ভাল হতে গেলে অবশ্যই রোগ মুক্ত থাকতে হবে। তার মানে এই নয় যে রোগ না থাকলেই স্বাস্থ্য উন্নতমানের হয়ে গেল।

এ তো গেল সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের কথা। এখন দেখা যাক, মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি ?

একজনের হাব-ভাব-ব্যবহার (মানসিকতা) কি রকম হলে আমরা বুঝব তার মানসিক স্বাস্থ্য ভাল ? মানসিক স্বাস্থ্য বিচার করতে হলে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে তাঁর কোন মানসিক রোগ অথবা জড়বুদ্ধি নেই। তিনি মদ্যপানে অথবা অন্য মাদকদ্রব্যে আসক্ত নন। তাঁর সমাজবিরোধী ভাব অথবা যৌন বিকৃতি নেই। এ ছাড়াও তাঁর আরও কিছু গুণ থাকা দরকার।

যেমন :

১) তিনি সহজে বিচলিত না হয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সমাজের অন্যান্য লোকের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য ভাবে চলতে পারেন।

২) তিনি আত্মবিশ্বাসী, বাস্তবধর্মী, নিজের এবং অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে থাকেন বা কাজ করেন, তাঁদের ক্ষমতার সীমা বুঝে চলতে পারেন।

৩) তিনি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুশি মনে কাজে নিযুক্ত থেকে নিজের সৃজনী শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করতে পারেন এবং অন্য যাঁদের সঙ্গে কাজ করেন, তাঁদেরও নিজেদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশের উপযোগী সুযোগ করে দেন।

৪) তিনি জীবনকে অর্থপূর্ণ এবং উপভোগ্য মনে করেন এবং বেঁচে থাকার সার্থকতা উপলব্ধি করেন।

৫) সাধারণভাবে তিনি নিরাপত্তা বোধ করেন, মামলা-মোকদ্দমার ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পারেন এবং জীবনের সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারেন।

৬) তিনি অন্যের ভাল কাজের প্রশংসা করতে পারেন এবং নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করতে পারেন এবং নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে সংশোধনের চেষ্টা করতে সমর্থ।

৭) তিনি সুখে বিবাহিত এবং পারিবারিক জীবন যাপন করতে পারেন।

এর মধ্যে এত সব ভাল ভাল গুণের কথা বলা হল যা থেকে মনে হতে পারে—এ সব গুণ না থাকলে বুঝি মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আদর্শস্থানীয় হতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে সেরকম নাও থাকতে পারেন। এখানে যে সব গুণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি দিয়েই মানসিক স্বাস্থ্যের উচ্চ-নিম্ন মান খানিকটা অনুমান করা যায়—এগুলি একেবারে সঠিকভাবে নির্ণয় করার পন্থা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

অনুরূপভাবে মানসিক ক্ষেত্রে কে স্বাভাবিক আর কে অস্বাভাবিক, এটার বিচারও খুব কঠিন কাজ, এর চুলচেরা বিচার করা খুব মুস্কিল। বেশি সূক্ষ্ম বিচার ছেড়ে ব্যবহারের উপযোগী (কাজ চলার মত) আপেক্ষিকভাবে দেখাই শ্রেয়। উপস্থিত সর্বসম্মত স্বাভাবিক মানসিকতা ঠিক করার চেষ্টা না করাই ভাল।

এত অসুবিধে সত্ত্বেও আমরা কিভাবে মানসিক রোগের অস্তিত্ব বুঝতে পারি, এবার তা দেখা যাক।

এ বিষয়ে শারীরিক অসুখের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির কতকগুলো বিশেষ তফাৎ আছে। শরীরের অসুখের ক্ষেত্রে প্রায়ই আমরা দেখি, সেই রোগে শরীরে কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয় যেমন—আঘাতে ক্ষত, প্রদাহ, রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন, অবক্ষয় (degeneration) টিউমারের আবির্ভাব, ইত্যাদি। অথবা রোগের কারণ হিসেবে কিছু জীবাণু শরীরকে আক্রমণ করে এবং ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, সিফিলিস, টিউবারকিউলোসিস ইত্যাদি রোগ শরীরে ভোগান্তি সৃষ্টি করে।

মানসিক রোগে শরীরের অস্বাভাবিক পরিবর্তন অথবা রোগের নির্দিষ্ট কারণ হিসেবে জীবাণুর অস্তিত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। এ ছাড়া আর একটা অসুবিধে হচ্ছে এই : মনের অসুখ বলছি বটে, কিন্তু মন বলে শরীরে কোন অঙ্গ নেই। যেমন ধরুন, শরীরের অসুখে আমরা বলি হৃৎপিণ্ডের, লিভারের, কিডনির অথবা পাকস্থলীর ব্যাধি। সেইভাবে দেখলে মন কি রকম এবং শরীরের কোথায় থাকে, তাতো আমরা জানি না। মন যে আমাদের আছে, তা আমরা বুঝি ; কিন্তু মন কি, সেটা সহজে বলতে পারি না।

প্রশ্নের জবাব দার্শনিকভাবে অবশ্য দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের আলোচনা দার্শনিক আলোচনা নয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলতে গেলে আমরা বলি—মন কি, তা আমরা জানি না। কিন্তু মন কি করে, তা অবশ্যই আমরা কিছুটা জানি। সেজন্যেই আমরা মনের কার্যকারিতা দেখতে চাই। মনের কাজগুলোকে আমরা সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করি :

১) প্রত্যক্ষজ্ঞান (Cognition)

মনের যে কাজের দ্বারা আমরা জ্ঞান বা ধারণা করতে পারি। যেমন, জাগতিক বস্তুর উপলব্ধি (perception), কল্পনা (imagination), স্মৃতি (memory) বিচার-বিবেচনা (reasoning), ইত্যাদি।

২) আবেগ বা অনুভূতি (Affection)

মনের এই কাজ বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আমাদের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-ঘৃণা, ইত্যাদি নির্ধারণ করে।

৩) ইচ্ছা (Conation)

মনের এই কাজের দ্বারা আমাদের ইচ্ছা (will), উদ্দেশ্যমূলক কাজ (Goal directed activity) ইত্যাদি স্থির হয়।

এখন আমরা দেখবার চেষ্টা করব মানসিক রোগ বা মনোবিকারের লক্ষণ কিভাবে প্রকাশ (manifested) পায়, যার ফলে রোগের অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি এবং রোগ নির্ণয় করি। সাধারণতঃ মানসিক রোগের লক্ষণ তিন ভাবে প্রকাশিত হয় :

১) দৈহিকভাবে (**Biologically**)
যেমন বুক ধড়ফড় করা, বুকে যন্ত্রণা, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, অনিদ্রা, মাথাধরা, আহারে অনাগ্রহ, শরীরের দুর্বলতা ও ক্লান্তি, যৌন ইচ্ছার অভাব, শরীরের নানারকম ব্যথা, যন্ত্রণা অথবা অক্ষমতা, ইত্যাদি।

২) মানসিকভাবে (**Psychologically**)
যেমন বুদ্ধি অথবা স্মৃতিশক্তির অভাব, স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান লোপ, ভ্রমাত্মক চিন্তা, ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ, অকারণ উৎকণ্ঠা অথবা বিষাদ, ইত্যাদি।

৩) সামাজিকভাবে (**Socially**)
যেমন, মেলামেশায় অনাগ্রহ, আক্রমণাত্মক ভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি ঔদাসীন্য, পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি আগ্রহের অভাব, অশালীন আচরণ, ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়ই নানারকম অবস্থার বিপাকে মানসিক যন্ত্রণা, দুঃখ ভোগ করি। কখনও বা কারও বা কোনকিছুর প্রতি অত্যন্ত রাগ, আক্রোশ, ঘৃণা বোধ করি। আবার কখনও কখনও ভয় ভীতি উদ্বেগে বিহ্বল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। এই সব অবস্থা সচরাচর দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। বহুদিন ধরে আমাদের কাজকর্মের ক্ষতি করে না, অথবা এর জন্যে অন্যদের জীবনযাত্রায় তেমন বিঘ্ন ঘটায় না। আমরা সকলেই এই ধরনের মানসিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত, এগুলিকে আমরা মানসিক রোগ বলি না। কিছুক্ষণ অথবা কিছুদিন পরেই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাই।

যেমন ধরুন, পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল হল না, চুরি-ডাকাতি অথবা প্রতারণার শিকার হলাম, অথবা কোন প্রিয়জন বিয়োগ ঘটল। এইরকম দুরূহ অবস্থায় কিছু মানসিক অশান্তি তো হবেই। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণতঃ আমরা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফিরে যাই। কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই যদি ঐ রকম মানসিক অবস্থা হয়, অথবা যে কোন কারণেই হোক না কেন, সেটা যদি অনেকদিন ধরে থেকে যায়, তাহলে মানসিক বিকার হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

এখন আমরা দেখছি, মানসিক বিকার আছে কিনা বুঝতে গেলে দেখতে হবে এতে ঐ ব্যক্তি নিজে কতটা বিচলিত হচ্ছেন, কতটা ওঁর জন্যে অন্য লোকে পীড়িত হচ্ছেন, এবং তাঁর কাজকর্মের পক্ষে এটা কতটা অন্তরায় হচ্ছে। এ ছাড়া দেখতে হবে, এই অবস্থা কতদিন স্থায়ী হচ্ছে।

৩

মনের রোগ কেন হয়

দেহের রোগের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায় যে একটি বিশেষ অসুখ একটি নির্দিষ্ট কারণে ঘটছে। যেমন দেখা যায় সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে। বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণু শরীর আক্রমণ করলে তবেই ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড, প্রভৃতি রোগগুলি হয়।

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু একটি মাত্র নির্দিষ্ট কারণে একটি রোগ হচ্ছে, এমন ঘটনা খুব কমই পাওয়া যাবে। বেশির ভাগ মানসিক রোগে একাধিক কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই রোগের সূচনা ঘটে।

কতকগুলো কারণ দীর্ঘদিন ধরে কারো দেহ-মনের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করলে সেই ব্যক্তির রোগ হবার প্রবণতাকে বাড়িয়ে রাখে। তারপর রোগ প্রকাশিত হবার ঠিক আগের কিছু ঘটনা সেই ব্যক্তির মনের ওপর এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে যে তার ফলে রোগ প্রতিরোধের শক্তিকে পরাভূত করে রোগের সূচনা ঘটাতে পারে।

ধরা যাক, একজন মাঝবয়সী স্ত্রীলোকের শরীর ভেঙে পড়েছে পর-পর পাঁচটি সন্তান প্রসব এবং তাদের লালন পালন করার ফলে। একই সঙ্গে অভাবের সংসারে মদ্যপায়ী স্বামীর দৈনন্দিন অত্যাচারের ফলে কমে এসেছে মানসিক শক্তি। এই অবস্থায় কদিনের জ্বরে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেল ছোট ছেলেটা। এর পরেই দেখা গেল কঠিন বিষণ্ণতা রোগে (depression) আক্রান্ত হয়েছেন ভদ্রমহিলা। এক্ষেত্রে, ছেলের মৃত্যু শেষ আঘাতটি হেনেছে ঠিকই, কিন্তু এর আগেই তার দেহ মনের শোচনীয় অবস্থাটা তার বিষণ্ণতা রোগের প্রবণতাকে যথেষ্ট ভাবে বাড়িয়ে রেখে দিয়েছিল।

প্রতিটি রোগ আক্রমণের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে প্রায়ই দেখা যাবে, ব্যক্তির রোগের প্রবণতা অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধের শক্তির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এই প্রবণতা আবার নির্ভর করে কিছু জন্মগত প্রভাবের ওপর, এবং বেশিরভাগ নির্ভর করে জন্ম থেকে শুরু করে তার দেহমনের ওপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার ওপর।

এখন মানসিক রোগের কারণগুলির বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক—

মানসিক রোগের কারণ

১) বংশগত কারণ :

বংশগত কারণ মানসিক রোগ ঘটাতে কতটা দায়ী, সেটা স্থির নিশ্চিতভাবে বলা খুবই কঠিন। এটা অবশ্যই দেখা যায় যে, একই পরিবারে একাধিক ব্যক্তি একই ধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে ; অথবা মা-বাবার কারো মানসিক ব্যাধি আছে এবং সন্তানেরও ঐ অসুখ হয়েছে। এইসব ঘটনা লক্ষ্য করে কি এমন মন্তব্য করা যায় যে, বংশ পর্যায়ে জিনের (gene) মাধ্যমে এই সব অসুখ বাবা-মা'র দিক থেকে সন্তানের মধ্যে চালান হয়ে গেছে ? নিশ্চিতভাবে এমন মন্তব্য করা যায় না। যে পরিবারে কারো মানসিক রোগ আছে, সেই পরিবারের সামাজিক আবহাওয়া কি দূষিত হয়নি ? যে মা মানসিক অসুখে ভুগছে, সে কি সন্তানের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠনের উপযোগী পরিবেশ দিতে পেরেছে ? তাহলেই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে, কতটা জীববিজ্ঞান আর কতটা সমাজবিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করছে এই মনোবিজ্ঞানের ওপর ? যাই হোক, এর জন্যে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যেতে পারে।

২) মস্তিষ্ক এবং মানসিক রোগ :

মনোবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের একটা বিশেষ স্থান আছে। মানসিক বৃত্তিগুলি মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। মস্তিষ্কের ক্রিয়া আবার নির্ভর করে তার গঠনের ওপর। শৈশবে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ঠিকমত না হলে সেই শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিগুলিরও ঠিকমত বিকাশ হয় না। ফলে, শিশু জড়বুদ্ধি হয়। তেমনই জীবনের যে কোন সময়ে মস্তিষ্কে আঘাত অথবা রোগ তার গঠনের বিকৃতি ঘটাতে পারে এবং তার ফলে নানা মানসিক রোগের উৎপত্তি হতে পারে। এই জন্যেই দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত, এনকেফালাইটিস (encephalitis), মস্তিষ্কে টিউমার, ইত্যাদিতে প্রায়ই মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

এমনও দেখা যায় যে মস্তিষ্কের গঠনের কোন ওলটপালট না ঘটলেও মস্তিষ্কের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এমন যেসব রাসায়নিক দ্রব্য (biochemical substances) আছে, সেগুলির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং তার ফলেও মনোবিকারের সূচনা হতে পারে।

৩) গর্ভাবস্থা :

শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে, সেই সময়ে মায়ের কঠিন অসুখ, অপুষ্টি, ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদিতে শিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটতে পারে, এবং তার থেকে জড়বুদ্ধি এবং পরবর্তী জীবনে নানা মানসিক ব্যাধি ঘটতে পারে। এই জন্যেই সুস্থ সন্তানের আশায় গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষার খুবই দরকার।

৪) সন্তানের জন্ম (Birth of a baby):

সন্তান জন্মাবার সময়ে নানাভাবে শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত লাগতে পারে, অথবা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ফলে, পরবর্তী জীবনে এপিলেপসি (epilepsy), জড়বুদ্ধি, মানসিক ব্যাধি হতে পারে।

৫) শৈশবে শিশুর লালন পালন:

উপযুক্ত পুষ্টি শিশুর শরীর গঠনের সহায়ক। অপুষ্টি শরীরের বিশেষত মস্তিষ্কের গঠনের অন্তরায় হয়ে মনোবিকার ঘটাতে পারে— এটা ঠিক—কিন্তু শৈশবে স্নেহ ভালবাসার অভাব উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুতর অন্তরায় হয় এবং শিশুর অপূরণীয় ক্ষতি করে যা পরবর্তী জীবনে মনোবিকারের কারণ হতে পারে। স্নেহভালবাসা থেকে শিশু যাতে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্যে দরকার গৃহের

শান্তিপূর্ণ, উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ।

৬) **ক্ষতিকারক সামাজিক পরিবেশ এবং সমাজব্যবস্থা :**

কোন কঠিন অশান্তি যেমন— আত্মীয় বিরোধ, ঝগড়াঝাঁটি, অথবা কোন দুরূহ সমস্যার মধ্যে (যেমন, নিজের এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র জীবনহানিকর শাসানি) যদি দীর্ঘদিন কাটাতে হয়, তাহলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। আবার কোন নিকট আত্মীয় বা বন্ধুর অকাল মৃত্যু, গুরুতর সম্মানহানিকর ঘটনা (যেমন, বেকারত্ব, পদচ্যুতি, প্রতারণার শিকার, যৌন অথবা অন্য কোন অপরাধের মামলায় জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি) মানসিক ভারসাম্য টলিয়ে দিতে পারে।

৪

মনের রোগ কিভাবে চেনা যায়

মনের কাজের বিকার মানসিক রোগের লক্ষণ রূপে প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মধ্যেও স্বল্পক্ষণ স্থায়ী মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা যেতে পারে যেমন— ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন আমরা দেখি তাকে বাস্তবে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় সেগুলি মনোবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে আমরা বাস্তবে ফিরে আসি, ঐ অবস্থা আর স্থায়ী হয় না। দিবাস্বপ্নের কল্পনায়, প্রিয়জন বিয়োগের শোকে অথবা ক্রোধন্মত্ত অবস্থায় মানুষের চিন্তা এবং আচরণকে মানসিক রোগের লক্ষণ বলেই মনে হয়। কিন্তু এগুলি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এজন্য এই সব অবস্থাকে মনের রোগ বলা হয় না। একজনকে মানসিক রোগী বলতে হলে তার বিকারগ্রস্ত অবস্থাটাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে এবং এই বিকারের ফলে তার অথবা তার সংস্পর্শে যারা আছে তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণ যথেষ্ট পরিমানে ব্যাহত হতে হবে, তবেই তাকে মানসিক রোগী বলা যাবে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির সঙ্গে মানসিক রোগীর চুলচেরা তফাৎ করা খুব কঠিন। একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে অল্পবিস্তর মানসিক লক্ষণ থাকতে পারে। তবে সেইসব বৈলক্ষণ্য তাকে অথবা তার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় তেমন বাধার সৃষ্টি করে না। স্বাভাবিক লোকের মধ্যেও এমন কিছু কিছু হাব-ভাব, আচার-আচরণ দেখা যায় যেগুলি মানসিক লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন—একজন ব্যক্তি দৈনিক বাড়ী ফিরে তার ছাতাটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় না রাখতে পারলে চলে না, একজন লাল কালিতে কিছুতেই লিখবেন না, এমন লোক আছে যে কিছু কাজ কয়েকবার গুণে গুণে না করলে পারেন না। এই ধরনের অল্পবিস্তর বাতিকগ্রস্ত লোক আছে যারা এসব থাকা সত্ত্বেও নিজের বিশেষ কিছু অসুবিধা অনুভব করে না বা অন্যের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না। এই জন্যই বলছিলাম মানসিক রোগী এবং স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে চুলচেরা প্রভেদ করা কঠিন। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে মানসিক লক্ষণ ছাড়া নানা রকম শারীরিক লক্ষণ, যেমন—অনিদ্রা, ক্ষুধার অভাব, মাথার যন্ত্রণা, দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় করা, ইত্যাদি প্রায়ই দেখা যায়।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা লোকের সংস্পর্শে আসি তাদের মধ্যে কখনও কখনও মানসিক রোগীও দেখি। কিছু রোগীর বিবরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। দেখুন এমনটি আপনিও লক্ষ্য করেছেন কি না ?

(১) সমীরের বয়স ২৪/২৫ বছর হবে—কিছুদিন যাবৎ সে বাড়ী থেকে বেরুতে চায় না, কারো সাথে মেলামেশা করে না এবং কথা বিশেষ বলে না। সে আপন মনে বিড়

বিড় করে--- কি যেন বকে এবং একা বসে অকারণ হাসে। স্নান করতে চায় না—বেশী পীড়াপীড়ি করলে চটে যায়, উত্তেজিত হয়ে মারপিট করতে যায়। ওর ভাল ঘুম হয় না এবং আহারে কোন আগ্রহ নাই।

(২) রমলার বয়স হবে ৩০। বিবাহিতা। দুটি সন্তানের মা। সংসারে অভাব অথবা তেমন কোন সমস্যা নাই। কিছুদিন যাবৎ রাত্রে তার ভাল ঘুম হচ্ছে না। মনে তার খুশির অভাব, আনন্দ স্ফূর্তি তেমন নাই। ক্ষিদে কমে গেছে, কোন কিছুতে আগ্রহ নাই। সিনেমা, টিভি আগে এত ভাল লাগত, এখন সে তার ধারে কাছেও যেতে চায় না, সদাই বিরক্ত ভাব। আজকাল তার প্রায়ই মনে হয়— এমনভাবে বেঁচে থাকা দুষ্কর, এর চেয়ে মরে গেলেই ভাল হত।

(৩) রামচরণের বয়স হবে ৩৫। বি· এ· পাশ, সরকারী আপিসের একজন কেরানী। আপিসের কাজ মোটামুটি ঠিকই করেন কিন্তু স্ত্রীর চরিত্রে তাঁর অহেতুক সন্দেহ—তিনি মনে করেন তাঁর স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে। এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। বাস্তবিক তার স্ত্রীর চরিত্রের কোন দোষ নাই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এঁরা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর ঐ বিশ্বাস কিছুমাত্র বদলায়নি। স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হয়—স্ত্রী সহ্য করতে না পেরে কয়েকবার ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছেন। দু-একবার আত্মঘাতীও হতে গেছেন। কিন্তু এসবে রামচরণের ঐ ধারণা বিন্দুমাত্র বদলায়নি।

(৪) মালতীর বয়স হবে ১৯/২০। কলেজে পড়ে। লেখাপড়ায় ভাল। কিছুদিন যাবৎ অত্যন্ত বেশি কথা বলছে— একেবারে অপরিচিত লোককেও ডেকে কথা বলতে চাইছে। কোন কারণ নেই, অথচ বেশি বেশি স্ফূর্তির ভাব। কথা-বার্তায় একটু হামবড়া ভাব। সাজসজ্জায় একটু বিলাসিতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সামান্য কারণে রেগে যাচ্ছে। আজকাল লোকজনকে অযথা গালাগালি মারধর করতে যাচ্ছে—সেজন্য তাকে বেঁধে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে।

(৫) সুমতি ৭/৮ বছরের মেয়ে। কিছুদিন পর পর তার খিঁচুনি, ফিট হচ্ছে— ফিটটা ২/৩ মিনিট থাকে। স্কুলেও হচ্ছে, বাড়ীতেও হচ্ছে, রাতে ঘুমের মধ্যেও হয়। ফিটের মধ্যে হাত-পা ছোঁড়ে, শরীরের নানা জায়গায় কেটে ছিঁড়ে গেছে। দু-একবার দাঁতের মধ্যে জিভ পড়ে জিভটা কেটে গেছে। সেদিন পুকুরের ধারে ফিট হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় জলে পড়ে গিয়েছিল, লোকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ওকে জল থেকে তুলে না ফেললে ও মরেই যেতো।

(৬) কৃপানাথ ২২ বছর বয়স, কলেজে পড়ে। কিছুদিন যাবৎ তার নানা দুশ্চিন্তা— কি হবে কি হবে ভাব। ঘুম কমে গেছে, পড়ায় ভাল মত মন দিতে পারছে না। এমনিতে তার স্বাস্থ্য ভাল ; কিন্তু তার মনে হয় শরীর দুর্বল, আগের মত শক্তি পাচ্ছে না। নানা রকম শারীরিক কঠিন অসুখের ভয়। যৌন দুর্বলতা অনুভব করে। তার ধারণা, হয়ত মৈথুন এবং স্বপ্নদোষে অধিক বীর্যক্ষয়ের ফলেই তার এই অসুখ।

(৭) ইসমাইলের বয়স হবে ৮/৯ বছর। স্কুলে যাচ্ছে না। সে হাঁটাচলা, কথাবলা সব দেরী করে শিখেছে। এখনও কথা পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারে না।

(৮) প্রবীরের বয়স ৩২ বছর হবে। বি· কম· পাশ। একটি ব্যাঙ্কে কাজ করে। সে কোথাও একা একা যেতে পারে না, যেখানেই যাবে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। একা যেতে হলেই তার ভয় হয়, বুক ধড়ফড় করে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঘেমে ওঠে।

(৯) রহিমার বয়স হবে ১৮/১৯ বছর। বিবাহিতা। কোন কারণে মন খারাপ হলে অথবা ভয় পেলে মূর্চ্ছা যায়, হাত মুঠো হয়ে যায়, দাঁত লেগে যায়, শরীর শক্ত হয়ে কখনও কখনও ধনুকের মত বেঁকে যায়, খিঁচুনিও হয়—ঐ অবস্থাটা আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। এই ফিটের মধ্যে কখনও শরীরে কোন আঘাত লাগেনি, অথবা জলে কিংবা আগুনে পড়ে যায়নি।

(১০) হরিহর দাশ, ৫৫/৫৬ বছর বয়স। বি· এ·, বি· টি· পাশ, শিক্ষকতা করতেন। ঠিকমত কাজ করতে না পারায় ওঁকে অবসর নিতে হয়েছে। উপস্থিত এক বছর যাবৎ খুব ভুল হচ্ছে, গতকালের ঘটনা আজ মনে থাকছে না। পরিচিত লোককেও চিনতে পারছেন না। আজকাল সামান্য বুদ্ধির কাজ যেমন—ছোট যোগ-বিয়োগ অথবা টাকা পয়সার হিসাব গোলমাল করে ফেলছেন। সেদিন তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে তারপর ফেরার সময় বাড়ী চিনতে না পেরে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিলেন, জানাশুনা লোকে ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যান।

(১১) শান্তনু, ১৪/১৫ বছর বয়স হবে—পড়াশুনায় মন নাই। সব সময় বাড়ীর এবং অন্যান্য লোকের ক্ষতি করার প্রবণতা। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা এবং নানারকম নেশার দিকে ঝোঁক। অনেক বোঝান হয়েছে, মারধর করা হয়েছে—কিন্তু কিছুতেই শোধরান যাচ্ছে না। দয়া মায়া বলে ওর কিছু নাই।

(১২) রীনা, ২১/২২ বছর বয়স হবে, বিয়ে হয়েছে, একটা ছেলে আছে দু' বছরের। কিছু দিন যাবৎ সব জিনিসকে ওঁর নোংরা মনে হচ্ছে, বারে বারে সব কিছু ধুচ্ছে। এত বাড়াবাড়ি যে সংসারে কাজকর্ম সময়মত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁকে অনেক বার বোঝান হয়েছে এবং তিনি নিজেও বোঝেন নোংরা নেই, কিন্তু তাতেও তাঁর ধোয়ার বাতিক চলে যাচ্ছে না।

এখানে যে ১২টি রোগীর বিবরণ দেওয়া হল তারা কে কোন রোগে ভুগছেন সেগুলি পরিষ্কার বোঝা যাবে যখন ঐ সব রোগের বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এখানে রোগের নামগুলি দেওয়া থাকছে পরে মিলিয়ে দেখবেন।

(১) সিজোফ্রেনিয়া (২) বিষণ্ণতা রোগ (৩) ভ্রমবিকার (৪) ম্যানিয়া (৫) এপিলেপসি (৬) উৎকণ্ঠা (৭) জড়বুদ্ধি (৮) আতঙ্ক বা ফোবিয়া (৯) হিস্টিরিয়া (১০) চিত্তভ্রংশ (Dementia) (১১) অপরাধ প্রবণ শিশু (১২) অবসেসিভ—কমপালসিভ নিউরোসিস।

৫

মনোরোগের শ্রেণীবিভাগ

মনের রোগ মাত্রই যে সব এক রকমের হবে এমন নয় ; শরীরের রোগ যেমন নানা ধরনের (ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, হেপাটাইটিস অর্থাৎ যকৃতের প্রদাহ, ব্রেনটিউমার ইত্যাদি), তেমনি মনোরোগেরও নানা প্রকার-ভেদ আছে।

মনের রোগগুলোকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যায় :

১। শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধি (organic mental disorder)

২। শরীরভিত্তিক নয় এমন মানসিক ব্যাধি।

১) শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধি

এইসব ব্যাধির লক্ষণগুলো শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকার (pathological condition) থেকে উদ্ভূত হয়। মনের কাজের সঙ্গে শরীরের যে অঙ্গের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেটি হচ্ছে মস্তিষ্ক। সেইজন্যেই মস্তিষ্কের পীড়ায় মানসিক লক্ষণ দেখা যায়।

যেমন, কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনায় মাথায় কঠিন আঘাত পেলেন। তারপর চিকিৎসায় তাঁর জীবন রক্ষা হল। কিন্তু দেখা গেল তাঁর বুদ্ধি, স্মৃতি, বিবেচনা-শক্তি, স্বাভাবিক আবেগ-অনুভূতি— এ সব নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ চেহারায় সেই আগের মানুষটি থাকলেও আচার-ব্যবহারে সেই মানুষটি যেন একেবারেই অন্যজন। এক্ষেত্রে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মাথার আঘাত মস্তিষ্কের গঠনকে কিছু ওলোটপালোট করে দিয়েছে— যার ফলেই এই অস্বাভাবিক অবস্থা।

অনুরূপভাবে, মস্তিষ্কের অন্যান্য পীড়ায়— যেমন, এনকেফালাইটিস (encephelitis) সেরিব্রেল থ্রম্বোসীস (cerebrel thrombosis), ব্রেন টিউমার (brain tumour) ইত্যাদিতেও মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

আবার এমন কতকগুলো শারীরিক অসুখ আছে, যেগুলো প্রাথমিকভাবে মস্তিষ্কের পীড়া নয় এবং মস্তিষ্কের গঠনের কোন বিপর্যয়ও এরা ঘটায় না ; কিন্তু দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, যাতে মস্তিষ্কের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, ফুসফুস (lungs) ঠিকমত কাজ করতে না পারলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং বস্তুত অল্প পরিমাণে অক্সিজেনের অভাবেই মস্তিষ্কের কাজ বিকল হয়ে যায়। তেমনই কিড়নি (kidney) কিংবা লিভারের পীড়াতেও শরীরের যে সমস্ত দূষিত পদার্থ এই সব অঙ্গ (organ) স্বাভাবিক অবস্থায় শোধন করে দিত, অথবা

শরীর থেকে বার করে দিত এই অবস্থায় সেইসব দূষিত দ্রব্যগুলো শরীরে বেশি মাত্রায় জমে গিয়ে মস্তিষ্কের কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং মানসিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

মানুষের দেহে কতকগুলি গ্রন্থি[১] (gland) আছে যেগুলোকে নল বিহীন গ্রন্থি (ductless gland) বলে। যেমন, পিটুইটারি (pituitary), থাইরয়েড thyroid) সুপ্রারেনেল (suprarenel), ইত্যাদি। এদের সিক্রিশন অর্থাৎ ক্ষরণগুলো (গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস যা শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়) মস্তিষ্কের কাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই গ্রন্থিগুলো কোন কারণে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অথবা কম সিক্রিশন তৈরি করতে থাকলে তখন মস্তিষ্কের কাজকে বিকল করে মানসিক রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে, নানা প্রকার দৈহিক পীড়া মনোবিকার ঘটাতে পারে। এই ধরনের রোগগুলিকেও শরীরভিত্তিক মানসিক রোগ বলা যায়।

শরীরভিত্তিক মানসিক রোগগুলোকে তাদের তীব্রতা (intensity) এবং আরম্ভ (onset) কিভাবে হয়, সেই অনুসারে আবার তাদের দু-ভাগে ভাগ করা যায় :

ক) তীব্র এবং অল্পদিন স্থায়ী (acute), এবং

খ) দীর্ঘস্থায়ী (chronic)।

ক) তীব্র এবং অল্পদিন স্থায়ী শরীরভিত্তিক মনোরোগ (Acute organic mental illness):

এই রোগগুলি হঠাৎই শুরু হয়, অল্প সময়ের মধ্যে বেড়ে যায় এবং অল্পদিন স্থায়ী হয়। এই অল্পদিনের মধ্যেই হয় রোগ নিরাময় হয়ে যায়, না হয় রোগ দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ে (chronic) চলে যায়, অথবা রোগী মারা যায়। এই অসুখগুলিকে সাধারণতঃ ডিলিরিয়াম (delerium) বলা হয়। অনেক কঠিন শারীরিক ব্যাধি— যেমন টাইফয়েড, মেনিনজাইটিস, ইত্যাদির মধ্যে ডিলিরিয়াম দেখা যায়। সুরাপানে আসক্ত ব্যক্তি সুরাপান ছেড়ে দিলে তাঁর ডিলিরিয়াম হতে পারে। কোন বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করলেও তার ফলে ডিলিরিয়াম হতে পারে।

খ) দীর্ঘস্থায়ী শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধি (Chronic organic mental illness):

এই রোগগুলি অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে শুরু হয়, আস্তে আস্তে বাড়ে এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। কোন কারণে মস্তিষ্কের জীবকোষ (nerve cell)গুলির অবক্ষয়(degeneration) শুরু হলে দেখা যায় সেই ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতি, আবেগ-অনুভূতি, ইত্যাদি সূক্ষ্ম মানসিক ক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমে ক্রমে সেই ব্যক্তি জীবিত থেকেও মনের দিক থেকে অন্য মানুষ হয়ে যায়—অর্থাৎ, সেই আগের মানুষটির কোন চিহ্ন তাঁর মধ্যে আর দেখা যায় না। এই অবস্থাকে বলা হয় ডিমেনসিয়া (dementia)। এটা যে দীর্ঘস্থায়ী শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধি, সেটা সহজেই বোঝা যায়।

২) শরীরভিত্তিক নয় এমন মানসিক ব্যাধি

এতক্ষণ শরীরভিত্তিক মনোরোগের কথা আলোচনা করা হল, এবার এমন কতকগুলি

[১] গ্রন্থি (gland)—আমাদের দেহের গ্রন্থিগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় : (ক) নলসমন্বিত গ্রন্থি,যে সব গ্রন্থির ক্ষরিত রস (secretion) নল (duct)এর সাহায্যে শরীরের অন্যত্র প্রেরিত হয় সেগুলিকে বলা হয় নলসমন্বিত গ্রন্থি যেমন প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি, এবং (খ) নলবিহীন গ্রন্থি,যে সব গ্রন্থির ক্ষরিত রস অন্যত্র প্রেরণের জন্য নল থাকে না সেগুলিকে বলা হয় নলবিহীন গ্রন্থি। নলবিহীন গ্রন্থির ক্ষরিত রস রক্তে শোষিত হয়ে দেহের অন্যত্র প্রেরিত হয় ে থাইরয়েড গ্রন্থি।

মনোবিকারের কথায় আসা হচ্ছে, যাদের মধ্যে শরীরভিত্তিক কোন কারণই নির্দেশ করা যায় না, এগুলিকে ফাংশনাল অথবা নন-অরগ্যানিক (functional or non-organic) মানসিক রোগ বলা যায়।

এই ফাংশনাল বা নন-অরগ্যানিক ব্যাধিগুলোকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায় :

ক) নিউরোসিস (neurosis) বা বায়ুরোগ, এবং খ) সাইকোসিস (psychosis) বা উন্মাদ রোগ।

ক) নিউরোসিস (Neurosis) বা বায়ুরোগ

নন-অরগ্যানিক মানসিক রোগের মধ্যে এগুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু। আগের পরিচ্ছেদে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ৬, ৮, ৯ এবং ১২ এগুলি নিউরোসিস বা বায়ুরোগ।

এই নিউরোসিসগুলোকে তাদের লক্ষণ অনুসারে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক রোগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেমন :

১। অ্যাংজাইটি নিউরোসিস (anxiety neurosis) বা উৎকণ্ঠা

২। ফোবিয়া (phobia) বা আতঙ্ক

৩। হিস্টিরিয়া (hysteria)

৪। অবসেসিভ-কমপালসিভ নিউরোসিস (obsessive-compulsive) বা আবেশিকঅনুকর্ষি বায়ু

৫। ডিপ্রেসিভ-নিউরোসিস (depressive neurousis)

৬। নিউরাস্থেনিয়া (neurasthenia)

৭। হাইপো কন্ড্রিয়েসিস (hypochondriasis)

খ) সাইকোসিস (psychosis) বা উন্মাদ রোগ

ফাংশনাল (functional) মানসিক ব্যাধির মধ্যে এগুলি অপেক্ষাকৃত দুরূহ জটিল রোগ। এগুলির মধ্যে আছে :

১। সিজোফ্রেনিক ব্যাধি (schizophrenic disorders)

২। ভ্রম বিকার [delusional (paranoid) disorder]

৩। ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (depressive psychosis)

৪। ম্যানিক সাইকোসিস (manic psychosis)

আগের পরিচ্ছেদের উদাহরণগুলির মধ্যে ১, ২, ৩ এবং ৪ এগুলি সাইকোসিস।

সাইকোসিস এবং নিউরোসিস রোগের মধ্যে চুলচেরা তফাৎ করা খুবই কঠিন। তবে কাজের উপযোগী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য এদের মধ্যে মানা হয় এবং এদের মধ্যে প্রভেদ করার চেষ্টা করা হয়। নিচে পার্থক্যগুলি দেখানো হয়েছে :

সাইকোসিস এবং নিউরোসিসের পার্থক্য

সাইকোসিস	নিউরোসিস
১) এদের চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি এবং আচার-আচরণের মধ্যে যথেষ্ট অবাস্তবতা এবং অস্বাভাবিকতা দেখা যায়।	১) এরকম সাধারণতঃ হয় না।

২) স্থান, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে এদের জ্ঞান নষ্ট হতে পারে।	২) সাধারণতঃ এরকম হয় না।
৩) এরা যে অসুস্থ-অস্বাভাবিক, এ বিষয়ে এরা যথেষ্ট সচেতন থাকে না।	৩) সাধারণতঃ এরা অসুস্থতা সম্বন্ধে সচেতন থাকে।
৪) এরা ভুল ধারণা (যা সত্য নয়, যথার্থ নয়) দৃঢ় ভাবে মনে পোষণ করতে পারে— যেমন—রোগী মনে করছে— সে সর্বশক্তিমান,তার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব, অথবা সে মনে করছে— তার সমস্ত চিন্তা সে কিছু না বললেও লোকে বুঝে ফেলেছে।	৪) সাধারণতঃ এমন হয় না।
৫) যে সব বিষয়ের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই সেই সব বিষয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারে। যেমন— যেখানে কাছাকাছির মধ্যে কোন লোকজন নাই এবং শব্দ শোনা যাচ্ছে না, সেখানে রোগী পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে তার সম্বন্ধে কেউ কথা বলছে।	৫) সাধারণতঃ এমন হয় না।
৬) বাস্তব জগৎ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।	৬) এমন সাধারণতঃ থাকে না।
৭) বাস্তব জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা এদের নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নিজেদের কল্পনার জগৎকে বাস্তব জগৎ মনে করতে পারে।	৭) এমন সাধারণতঃ হয় না।
৮) এই ধরনের রোগীরা নিজেদের পক্ষে অথবা অন্যদের পক্ষে বিপদজনক হতে পারে। এরা রোগের বশে যেমন নিজেদের বিষয়বস্তুর ক্ষতি করতে পারে, নিজেদের দৈহিক ক্ষতি এমন কি আত্মহত্যা করতে পারে, তেমনই আবার এরা অন্যের বিষয় বস্তুর ক্ষতি, অন্যের দৈহিক ক্ষতি, এমনকি হত্যাকাণ্ডও ঘটাতে পারে।	৮) সাধারণতঃ এমন হয় না।
৯) প্রায়ই এদের মানসিক রোগের হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হয়।	৯) হাসপাতালে ভর্ত্তির প্রায়ই দরকার হয় না।
১০) সমাজে চলবার ক্ষমতা অল্প বিস্তর	১০) সাধারণতঃ হয় না।

নষ্ট হয়।	
১১) শুধুমাত্র মনোচিকিৎসায় (psychotherapy) এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায় না।	১১) শুধুমাত্র মনোচিকিৎসাতেই যথেষ্ট ভাল ফল হতে পারে।

বিঃদ্রঃ এমন কোন বিশেষ লক্ষণ নাই যা দিয়ে এদের পার্থক্য বোঝা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে বিচার করে বুঝতে হয়। কোন কোন সময় অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর পক্ষেও এদের প্রভেদ করা কঠিন সমস্যা হতে পারে।

এ পর্যন্ত মনোবিকারের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে যে আলোচনা হল, তাতে দেখা যাচ্ছে মানসিক রোগগুলিকে প্রথমতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে— শরীরভিত্তিক এবং শরীরভিত্তিক নয় এমন মানসিক ব্যাধি।

এরপর শরীরভিত্তিক নয়, এমন মানসিক রোগগুলিকে পুনরায় দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—নিউরোসিস এবং সাইকোসিস্।

তাহলে এখন বোঝা যাচ্ছে যে মানসিক রোগে তিনটিই প্রধান বিভাগ :

১। শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধি,
২। নিউরোসিস (Neurosis) এবং
৩। সাইকোসিস (psychosis)।

এই প্রধান রোগগুলি ছাড়া শরীর-মনের আরও কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা আছে যেগুলির সঙ্গে মানসিক রোগের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে সামগ্রিকভাবে মনোবিকারের আলোচনা করতে গেলে এই ধরনের অবস্থার পর্যালোচনা অপরিহার্য।

মানসিক রোগের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এমন অস্বাভাবিক শরীর-মনের বিষয় এখানে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। পরে এদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

১) জড়বুদ্ধি (**Mental Deficiency or Mental subnormality or Mental Retardation)**

নানা কারণে শৈশবে সময়মত এবং উপযুক্ত মাত্রায় মস্তিষ্কের বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে মনের বৃত্তিগুলিরও পূর্ণ বিকাশ হয় না। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শিশুর বয়স বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বয়সের অনুপাতে তার মনের স্ফুরণ ঘটছে না। এরপর দেখা গেল, বয়েসে বড় হলেও তার মানসিক বৃত্তি ছোটদের মতই থেকে গেছে। প্রায়ই দেখা যায়, জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের শারীরিক গঠনেও ত্রুটি থেকে যায়। এরা সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। বরং কমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করে। এদের মধ্যেও বুদ্ধির তারতম্য থাকে। সাধারণের তুলনায় কারো সামান্য কম আবার কারো ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় বুদ্ধি কম হতে পারে। বুদ্ধি কম থাকার জন্যে সমাজে চলার ক্ষমতা অন্য সাধারণের তুলনায় সীমিত থাকে।

২) সাইকোসোমাটিক ব্যাধি (**Psychosomatic or Psychophysiological Illness)**

এই রোগগুলি প্রকাশ পায় শারীরিক রোগ হিসাবেই কিন্তু রোগগুলির কারণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে অবচেতন মনের প্রবল প্রভাব এর মধ্যে দেখা যায়। এদের লক্ষণগুলি শারীরিক গঠনের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হলেও তাদের মধ্যে মানসিক আবেগের প্রভাব অনস্বীকার্য। পেপটিক আলসার (peptic ulcer) এবং একজিমা (eczema) এগুলিকে

সাইকোসোম্যাটিক ব্যাধি বলা হয়। পেপটিক আলসারে দেখা যাবে দৈহিক পরিবর্তন ঘটেছে পাকস্থলীতে, একজিমার ক্ষেত্রে দেখা যাবে চামড়ায় ; কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে মনের আবেগের কত নিকট সম্পর্ক রয়েছে এই সব অসুখের।

৩) ব্যক্তিত্বের বিকার (Personality Disorder)

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁদের আচার-আচরণ এমনই যে এর জন্যে তাঁদের নিজেদের বেশ অসুবিধা হচ্ছে—অথবা, যাঁদের সঙ্গে তাঁরা থাকেন বা কাজ করেন, তাঁদেরকেও নানাভাবে বিব্রত হতে হচ্ছে। এঁদের এইসব আচার-আচরণগুলি শৈশব থেকেই অথবা বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময়ে প্রকাশ পায়, এবং প্রায় সারাজীবন এগুলি থেকেই যায়। সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্ব (paranoid personality disorder) এক রকম ব্যক্তিত্বের বিকার। অল্প বয়স থেকে শুরু করে প্রায় সারা জীবনই এঁরা অন্য লোকের স্বাভাবিক আচার-ব্যবহারকে নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা অভিসন্ধিমূলক মনে করেন।

৪) মাদক দ্রব্যে আসক্তি (Alcohol and Drug Dependence)

মদ এবং অন্যান্য কতকগুলি মাদক দ্রব্য, যেমন— গাঁজা, চরস, ভাং, আফিং, মরফিন, পেথোডিন, হেরোইন, কোকেন, তামাক, ইত্যাদির প্রতি কিছু কিছু লোকের অধিক আসক্তি দেখা যায়। এ সব দ্রব্যে একবার নেশা ধরে গেলে তারপর তার থেকে বেরিয়ে আসা মুস্কিল। নেশা একবার ধরে গেলে তখন হয় একটা বিশেষ মানসিক অনুভূতি পাবার জন্যে, অথবা শারীরিক কিছু অস্বস্তির উপশম ঘটাতে নেশার দ্রব্যগুলির বারে বারে ব্যবহারের দিকে প্রবল ঝোঁক জাগে। সচরাচর দেখা যায়, একই ব্যক্তি একই সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হতে পারেন।

৫) যৌন বিকৃতি (Paraphilia)

স্বাভাবিক যেভাবে যৌন আকর্ষণ—অথবা যৌন উত্তেজনা হয়, যৌন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যৌন ভাব প্রকাশের ধারা এত অসংখ্য প্রকারের হতে পারে যে তার থেকে কোনগুলি যে স্বাভাবিক, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবুও প্রচলিত ধারা থেকে লোকের মোটামুটি ধারণাটা এইরকম :

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে সামাজিক সমর্থন আছে এমন একজন স্ত্রীলোকের যৌন মিলনকে সাধারণতঃ স্বাভাবিক যৌন মিলন বলা হয়, যদি সেই স্ত্রী লোকটির বয়স পুরুষটির বয়সের কাছাকাছি হয়। এর ব্যতিক্রম হতে পারে নানা ভাবে। যেমন, একজন পুরুষের যৌন আকর্ষণ কেবলমাত্র যদি একজন পুরুষের প্রতি থাকে, ঠিক তেমনই একজন নারীর যৌন আকর্ষণ যদি কেবলমাত্র একজন নারীর প্রতি থাকে, অথবা যৌনসঙ্গী হিসেবে মানুষের চেয়ে জীবজন্তুর (যেমন, কুকুর, ছাগল, গরু, ভেড়া, ইত্যাদি) প্রতি বেশি আকর্ষণ থাকে— তখন এগুলিকে যৌন বিকৃতি বলা হয়।

৬

উৎকণ্ঠা (Anxiety Neurosis)

যখনই কোন বিপদের সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে হয়, তখনই আমরা ভয় পাই। ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা-এই কথাগুলো প্রায়ই আমরা একই অর্থে ব্যবহার করি। বন্যার জল এগিয়ে আসছে যখন, তখন অনেক সময় ক্ষয়ক্ষতির কথা আমাদের মনে আসে বলে আমরা ভয় পাই, উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত হই সামনের বিপদের কথা ভেবে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সমস্যার শেষ নেই। সব কিছুরই মোকাবিলা সহজেই হয়ে যাচ্ছে, অথবা পেয়ে যাচ্ছি, সব সমস্যাই মিটে যাচ্ছে এমন নয়। অতএব চাহিদা না মিটলে, সমস্যার সমাধান না হলেই আমরা ক্ষয়ক্ষতি,অল্প-বিস্তর বিপদের কথা ভাবি। এই সব চিন্তা-ভাবনার মূলে ছোট-বড় ক্ষতি, অভাব বা বিপদের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এমন কিছু লোক আমাদের মধ্যে আছে, যারা ভয়, ক্ষতি বিপদের বাস্তবিক যথেষ্ট কারণ ছাড়াই আতঙ্কিত হচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। এখানে আমাদের আলোচনা তাদের নিয়ে যারা যথেষ্ট কারণ ছাড়াই উদ্বিগ্ন হচ্ছে বা ভয় পাচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানে ভয় (fear) এবং উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা (anxiety) কে পৃথক করে দেখা হয়। সাধারণ জীবনে বাইরের জগতের বাস্তবিক কারণে যখন বিপদের সম্ভাবনা দেখি, তখন তাকে বলা হয় ভয় (fear); আর বাইরের জগতের পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই যখন শঙ্কিত হই, তখন তাকে বলা হয় উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা।

যেমন ধরুন, সুন্দরবনে বেড়াতে গেছেন। পেছন থেকে ঘাড়ে বাঘ লাফিয়ে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কা করছেন। অথবা, গ্রামের ঝোপঝাড়ের সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ে মনে হচ্ছে সাপ বেরিয়ে পড়বে না তো ? এই ধরনের আশঙ্কার মধ্যে বাস্তবিকই বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই এগুলিকে ভয় হয়। কিন্তু ধরুন, এমন যদি হয় যে আপনি কলকাতা শহরের একটা বহুতল পাঁচতারা হোটেলের সাত তলার কোন ঘরে বসে সব সময়েই বাঘ কিংবা সাপের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। তাহলে বুঝতে হবে, এই বাঘ অথবা সাপ বাস্তবিক জঙ্গলের নয় ; এ আপনার মনের, একেই বলা হয় উৎকণ্ঠা।

উৎকণ্ঠা সচরাচর দু-ভাবে প্রকাশ পায় :

১) এক ধরনের উৎকণ্ঠা হয় যেটা কোন বিশেষ অবস্থা অথবা কোন বিশেষ বস্তুর সম্মুখীন হলে তখনই হয়, তাছাড়া অন্য সময়ে হয় না। এগুলিকে বলা হয় বস্তুগত (objectove) অথবা স্থানগত (situational) উৎকণ্ঠা। এমন লোক আছেন যিনি টিকটিকি, কেঁচো, আরশোলা, ছাগল কিংবা কুকুরের বাচ্চা দেখলে আতঙ্কগ্রস্ত হন, এগুলি বস্তুগত

উৎকণ্ঠা। আবার এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা সাঁকো বা সেতুর ওপর দিয়ে যেতে, নৌকোয় চড়তে, ট্রেনে বা প্লেনে যাতায়াত করতে, অথবা একা-একা কোথাও যেতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এগুলি হচ্ছে স্থানগত উৎকণ্ঠা।

২) আর এক রকমভাবে উৎকণ্ঠা দেখা যায় যেখানে কোন বিশেষ স্থান বা বস্তুর মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ থাকে না।ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, অথবা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে উৎকণ্ঠা হয়। এগুলিকে পরিবর্তনশীল বা বিচরণশীল উৎকণ্ঠা (free floating anxiety) বলা হয়। যেমন, এক ভদ্রমহিলার কথা বলছি যাঁর চিন্তা নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে কোন কঠিন ব্যাধি, যেমন ক্যানসার বা হার্টস্ট্রোক হল বুঝি ; ছেলেমেয়েরা অথবা স্বামী বাড়ির বাইরে গেলেই দুশ্চিন্তা,যদি কিছু অঘটন ঘটে ? যদি ওরা আর বাড়ি না ফেরে ?...বিবাহিতা মেয়ের চিঠি আসতে কদিন দেরি হলেই আতঙ্ক জাগে মনে, নিশ্চয় খারাপ কিছু হয়েছে ; বাড়িতে চুরির ভয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তালা লাগিয়ে রেখেছেন ; সব বিষয় নিয়েই কি হবে, কি হবে ভাব। এটিকে বলা যায় বিচরণশীল উৎকণ্ঠা।

সূচনা (mode of onset) এবং স্থায়িত্ব (duration) এই দু-দিক বিচার করলে উৎকণ্ঠাকে দু-ভাবে ভাগ করা যায় : ১) প্রবল এবং স্বল্পক্ষণস্থায়ী হলে তাকে বলা হয় আতঙ্ক (acute anxiety or panic state)। এগুলি হঠাৎই শুরু হয়ে অতি তীব্র আকার ধারণ করে এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। ২) আর একরকম উৎকণ্ঠা দেখা যায় যাকে বলা হয় দীর্ঘস্থায়ী উৎকণ্ঠা (chronic anxiety)। এগুলি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয় এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়।

আবার এমনও দেখা যায় যে, একজন দীর্ঘস্থায়ী উৎকণ্ঠায় ভুগছেন এবং মাঝে মাঝে আতঙ্কে (panic state) আক্রান্ত হচ্ছেন।

উৎকণ্ঠা প্রায়ই অন্যান্য মানসিক ব্যাধি, যেমন, বিষাদ (depression) অথবা অবসেসন (obession) রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়। কোন কোন সময়ে উৎকণ্ঠাকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ উৎকণ্ঠা হিসেবেই প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এই বিশুদ্ধ উৎকণ্ঠাকেই একটা পূর্ণ রোগের আখ্যা দেওয়া হয়।

উৎকণ্ঠা রোগের (AnxietyNeurosis)লক্ষণ কি

ভয় পেলে কি হয়, সে অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর আছে। এই অভিজ্ঞতা যে অত্যন্ত অশান্তির এবং পীড়াদায়ক, তা আমরা ব্যক্তিগতভাবে সকলেই বুঝি। ভয় এবং উদ্বেগের মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই ; তবে এদের মধ্যে যে তফাৎটা, সেটা হচ্ছে এই : বাইরের জগৎ থেকে বাস্তবিক ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে ভয়ের মধ্যে ; আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণ থাকে আমাদের মনের আবেগের মধ্যে (একটা অজানা আশঙ্কা অথবা মৃত্যুর ভীতি)। ভয় এবং উৎকণ্ঠায় উভয় ক্ষেত্রেই শরীরের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, যার ফলে কিছু শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। শারীরিক পরিবর্তনগুলি প্রধানতঃ আমাদের অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়।

উৎকণ্ঠায় শারীরিক অভিব্যক্তি এবং লক্ষণ

শ্বাস-প্রশ্বাসের এবং নাড়ীর দ্রুতগতি, বুক ধড়ফড়ানি, বুকের ভেতর অস্বস্তিকর বেদনা,

এখনই যেন শ্বাসবন্ধ হয়ে যাবে এমন একটা অনুভূতি, সারা দেহে ঘাম (বিশেষ করে হাতের তালু, পায়ের তলায় এবং বগলে), মাথা ঝিমঝিম করা, যেন এখনি জ্ঞানটা হারিয়ে ফেলব এমনি ভাব, শীত-শীত ভাব, শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া, একটা কাঁপুনির ভাব, গলা শুকিয়ে যাওয়া এবং গলার স্বরের বিকৃতি, মুখ লাল হয়ে যাওয়া, অথবা বিবর্ণভাব, পেটের মধ্যে অস্বস্তি, বুক-পেটের মধ্যে একটা গুর-গুরনি ভাব, একটা অস্বস্তিকর অস্থিরতা, ইত্যাদি, এগুলি হচ্ছে আতঙ্ক (panic state) -এর লক্ষণ ; এই সব লক্ষণের সঙ্গে ভয়ের (fear of real danger) লক্ষণের কোন তফাৎ নেই। এই রকম আতঙ্ক (acute anxiety or panic state) বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঝড়ের বেগে আসে, আবার ঝড়ের বেগেই চলে যায়।

এখন দেখা যাক, দীর্ঘস্থায়ী উৎকণ্ঠার (chronic anxiety) ক্ষেত্রে কি হয়। এ ক্ষেত্রে আতঙ্কের লক্ষণ অল্পমাত্রায় থাকে এবং তাছাড়া আরও কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়, যেমন-অনিদ্রা, অক্ষুধা, অরুচি, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা ঘনঘন পাতলা পায়খানা, শরীরে নানা জায়গায় মাংসপেশীতে যন্ত্রণা (বিশেষ করে ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে), মাথার যন্ত্রণা এবং ভারবোধ, মনোযোগের অভাব, অহেতুক ক্লান্তিবোধ, কাজকর্মে দক্ষতার অভাব, ইত্যাদি।

উৎকণ্ঠার কারণ কি

মনোবিজ্ঞানী (বিশেষতঃ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানীদের) মতে উৎকণ্ঠা মানসিক দ্বন্দ্বের লক্ষণ। কোন কারণে নির্জ্ঞান মনের অবদমিত অবাঞ্ছিত বাসনাগুলি যখন সজ্ঞান মন বা চেতনায় আসার উপক্রম করে, তখনই মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এবং সেই দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ হচ্ছে এই উৎকণ্ঠা। এই অবাঞ্ছিত-অবদমিত বাসনা-কামনাগুলির স্বরূপ কি ? কেনই বা তাদের নিয়ে এই মানসিক দ্বন্দ্ব ?

এই অবদমিত কামনা বা ইচ্ছাগুলির সাধারণ প্রকৃতি হচ্ছে, হয় তারা ধ্বংসাত্মক-হিংসাত্মক (destructive-hostile) বৃত্তিমূলক, অথবা যৌন (sexual) বৃত্তিমূলক। এই দুটি বৃত্তিকে আয়ত্তে রাখাই হচ্ছে সভ্যতার প্রধান অবদান। এই জন্যই এই বৃত্তিগুলিকে সজ্ঞান থেকে নির্জ্ঞান মনে অবদমনের (repression) প্রয়োজন ঘটে। এই ধরনের মানসিক ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছা অনুসারে হয় না, আমাদের অজ্ঞাতেই ঘটে। এই অবদমনের কাজ নানা কারণে সব মানুষের ক্ষেত্রে সব সময়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। তারই ফলস্বরূপ এই মানসিক দ্বন্দ্ব এবং তারই প্রকাশ এই উৎকণ্ঠা। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে চার রকমভাবে এই উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায় :

১) বিবেকের দংশন, পাপবোধ, অন্যায়-অপরাধবোধজনিত উৎকণ্ঠা। যেমন, কোন ব্যক্তির মনে হচ্ছে-'আমার বাবার উপযুক্ত চিকিৎসার আমি অবহেলা করেছি। তাই উনি মারা গেলেন।' বাস্তবিক বিচারে কিন্তু বাবার চিকিৎসাতে কোন অবহেলাই হয়নি।

২) শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি, অঙ্গহানি, এই সব নিয়ে উৎকণ্ঠা। যেমন, রোগীর সর্বদা দুশ্চিন্তা, কোন দুর্ঘটনায় পড়বেন, অঙ্গহানি হয়ে যাবে, ধ্বজভঙ্গ ঘটবে, ইত্যাদি।

৩) প্রিয়জন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ; শিশুকে প্রথম স্কুলে পাঠাতে শিশু এবং মা উভয়ের যে উদ্বেগ ; অথবা, ছেলে কিছুদিনের জন্যে বিদেশে যাবে বলে মা চিন্তায় দীর্ঘদিন

ধরে কাতর হয়ে থাকলেন।

৪) নিজের সংযম হারিয়ে ফেলার যে উৎকণ্ঠা ; যেমন, পাছে যৌনভাব এসে যায়, সেই কারণে মেয়েদের মুখ কিংবা বুকের দিকে না তাকিয়ে একমাত্র পায়ের দিকেই দৃষ্টি রেখে সব সময়ে শঙ্কা নিয়ে চলা।

মনস্তত্ত্বের বিচার ছাড়াও শরীরবিজ্ঞানীদের মতে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ, যেমন লিম্বিক সিসটেম (limbic system), অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্র এবং কিছু কিছু এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির বিকারের ফলে উৎকণ্ঠা হতে পারে। রক্তে ল্যাকটেটের আধিক্যের সঙ্গেও বিজ্ঞানীরা উৎকণ্ঠার সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন।

এ সব তথ্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হলেও এখনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

উৎকণ্ঠার চিকিৎসা কি

শুধুমাত্র ওষুধ প্রয়োগে উৎকণ্ঠার চিকিৎসা হয় না। তবু উৎকণ্ঠা প্রশমনের ওষুধপত্র প্রয়োজন মত সাময়িকভাবে অবশ্যই দেওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে মনোচিকিৎসা (psychotherapy)। এ ছাড়া, উপযুক্ত বিচার করে নানারকম আচরণ পরিবর্তন করার প্রক্রিয়ার (behaviour therapy) দ্বারাও সুফল পাওয়া যায়।

৭

হিস্টিরিয়া

হিস্টিরিয়া একরকম নিউরোসিস্। এই রোগ শারীরিক লক্ষণ বা মানসিক লক্ষণ ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। এর লক্ষণগুলি কোন শরীরভিত্তিক কারণ থেকে উদ্ভূত হয় না।

শারীরিক লক্ষণগুলো এই রকম : যেমন, শরীরের কোন অংশ অসাড় লাগছে। সে জায়গায় কোন অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছে না। অথবা, শরীরের কোন অঙ্গ, যেমন—হাত বা পা নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে হাত বা পায়ের কোন শক্তি নেই।

মানসিক লক্ষণগুলো এইরকম : যেমন, বুদ্ধি, স্মৃতি, স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান লোপ পেয়েছে মনে হচ্ছে।

নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব থেকেই এই সব হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলির উৎপত্তি হয় এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই লক্ষণগুলির মাধ্যমে মানসিক দ্বন্দ্ব বা সমস্যার সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা হচ্ছে যে সমাধান বাস্তবও নয়, আসলও নয়।

যেমন, একটি ১৪ বছরের মেয়ে স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। পড়াশুনায় ভাল এবং ক্লাসে বরাবর প্রথম হয়। এবার পরীক্ষার আগের দিন দেখা গেল, তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা প্যারালাইজ্ড হয়ে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে, অতএব পরীক্ষা দেওয়া হল না। কি ভাবেই বা দেবে? ডান হাতের বুড়ো আঙুলের জোর না থাকলে যে আর লেখা যায় না।

ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করানো হল। দেখা গেল, বিশেষ ওই বুড়ো আঙুলের মাংসপেশীর অথবা নার্ভের কোন দোষ নেই, তবুও প্যারালিসিস্ হওয়ার ফলে আঙুল কাজ করতে সক্ষম নয়।

এরপর মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষায় রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যা বোঝা গেল, তা এই রকম :

এবার নানা কারণে মেয়েটির পরীক্ষা প্রস্তুতি ভাল মত হয়নি। পরীক্ষার আগে কয়েকমাস যাবৎ বাড়িতে বিয়ে এবং আরও কিছু কাজকর্ম নিয়ে বেশ হৈ-চৈ ছিল, পড়াশুনা নিয়মিত করতে পারেনি। পরীক্ষার অল্প কদিন আগে মেয়েটি বুঝলো, এবার সে কিছুতেই প্রথমস্থান রাখতে পারবে না—এখন যত চেষ্টাই সে করুক না কেন। উৎকণ্ঠায় প্রায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল মেয়েটি, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। পরীক্ষায় না বসলে, তার কোন সঙ্গত কারণ দেখানো যায় না। আবার পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না হলে লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি ভাবে? এই দ্বন্দ্ব আর

মানসিক দুরূহ অবস্থার সমাধান ঘটিয়ে দিল তার নির্জ্ঞান মন। মেয়েটির অজ্ঞাতেই তার মানসিক দুরবস্থা রূপান্তরিত হয়ে গেল শারীরিক অক্ষমতায়। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে প্যারালিসিস্ হওয়ায় পরীক্ষায় বসা আর পরীক্ষায় খারাপ ফল হওয়ার মত সঙ্কট থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। সমস্যার আসল সমাধান, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথমস্থান পাওয়া না গেলেও মুখ-রক্ষে হল, কেউই তার জন্যে দোষারোপ করতে পারলো না মেয়েটিকে।

মেয়েটি কিন্তু ইচ্ছে করে কিছুই করেনি। এটা রোগের ভান নয়, আসল রোগই। এরই নাম হিস্টিরিয়া। হিস্টিরিয়া রোগ যখন শারীরিক লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায় তখন সেগুলিকে বলা হয় কনভারসন হিস্টিরিয়া (conversion hysteria)। মানসিক লক্ষণ ভাবে প্রকাশ পেলে তখন তার নাম ডিসোসিয়েটিভ হিস্টিরিয়া (dissociative hysteria)।

একটি ঘটনা বলা যাক। মেয়েটির বয়স উনিশ। বিয়ের ছ মাস পর। একদিন হঠাৎ দেখা গেল, সে তার বিয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। কোনদিন যে তার বিয়ে হয়েছিল, সেটাই তার মনে নেই। এই বিয়ে ছাড়া অন্য ঘটনা তার সবই মনে আছে।

আর একটি রোগীর কথা বলছি। বিবাহিতা মহিলাটির বয়স পঁচিশ, একমাত্র ছেলে রক্তের ক্যানসার রোগে মারা গেল ছ-বছর বয়েসে। তারপর থেকেই ইনি একেবারেই ভুলে গেলেন সন্তানের কথা। সন্তান হওয়ার পর থেকে এ-বিষয়ে কোন কথাই আর মনে করতে পারলেন না।

এই দুটি রোগীর ক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় বোঝা গেল, প্রথম মেয়েটির বিবাহিত জীবন ছিল খুবই দুঃখের। শ্বশুরবাড়িতে সামঞ্জস্য রেখে চলা সম্ভব হচ্ছিল না কিছুতেই। একদিন খুববেশি বকাবকি আর দোষারোপ করা হয়েছিল রোগীকে। ঠিক তখন সে অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখা গেল বিয়ের কথা আর তার কিছুই মনে নেই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ছেলে যখন কঠিন ব্লাড ক্যানসারে ভুগছিল, মা হয়ে ইনি ছেলের দুরারোগ্য ব্যাধিকে কিছুতেই মনের দিক দিয়ে মেনে নিতে পারছিলেন না। ছেলে যখন মারা গেল, সন্তানের অস্তিত্বই ভুলে গেলেন।

দেখা যায়, অত্যন্ত পীড়াদায়ক ঘটনা যা অসহ্য উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে, সেক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে নির্জ্ঞান মনের এমন সব কর্মপদ্ধতি বা প্রক্রিয়া প্রকাশ পায়, যার ফলে এই সব অতিশয় কষ্টদায়ক ঘটনার স্মৃতিকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এই ধরনের হিস্টিরিয়াকে ডিসোসিয়েটিভ হিস্টিরিয়া বলে।

হিস্টিরিয়ার কারণ কি

১৮১৫ সালে ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী সারকো (Charcot) সম্মোহন (hypnosis) পদ্ধতি প্রয়োগে হিস্টিরিয়ার চিকিৎসার সময়ে দেখালেন, সম্মোহিত অবস্থায় রোগীর মনে যদি ধারণার সঞ্চার (suggestion) করা যায় যে, তার অর্থাৎ রোগীর রোগ নিরাময় হয়ে গেছে, তাহলে দেখা যায়, রোগীর হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলি (শারীরিক অথবা মানসিক যাই হোক) সম্পূর্ণ চলে গেছে এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছে। তিনি আরও দেখালেন, রোগীকে সুস্থ করার পর সম্মোহিত অবস্থায় পুনরায় যদি তার মনে ধারণা সৃষ্টি করা যায় যে হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলি ফিরে এসেছে, তাহলে দেখা যাবে ওই রোগীর মধ্যে হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলি সত্যিই ফিরে এসেছে এবং রোগী আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

এই ঘটনা থেকে সারকো সিদ্ধান্ত নিলেন, রোগীর মনে ধারণা সঞ্চার (suggestion)

এর সঙ্গে হিস্টিরিয়ার উৎপত্তির কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব হিস্টিরিয়ার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

কোনো কোনো স্নায়ুবিজ্ঞানী মনে করেন, মস্তিষ্কের কাজের গোলযোগের ফলেই হিস্টিরিয়া হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই মতবাদকে প্রমাণ করা যায়নি।

মনঃসমীক্ষার মতামতই মোটামুটি বেশির ভাগ মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মেনে নেন। মনঃসমীক্ষার তত্ত্ব অনুযায়ী নির্জ্ঞানে অবদমিত মানসিক দ্বন্দ্ব থেকেই হিস্টিরিয়ার লক্ষণ উদ্ভূত হয়। আমাদের সহজাত বৃত্তিগুলির (instinctive drives) প্রকৃতি যৌন (sexual) অথবা ধ্বংসাত্মক (destructive), এগুলির সঙ্গে ব্যবহারিক সমাজ-জীবনের সংঘাত অনিবার্য। কারণ, সহজাত বৃত্তির স্বরূপ বহির্জগতে প্রকাশ হতে গেলেই দারুণ উৎকণ্ঠার আবির্ভাব ঘটে এবং সেই উৎকণ্ঠাকে দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ফলে, আমাদের অজ্ঞাতেই মানসিক ক্রিয়া (mental mechanism) এই বৃত্তিগুলিকে অবদমন করে। এই অবদমনের অর্থ এই নয় যে বৃত্তিগুলি চিরতরে নির্বাসিত হল। মানসিক ক্রিয়াকে সবসময়েই সক্রিয়ভাবে অবদমিত রাখতে হয় বৃত্তিগুলিকে। অবদমনকারী শক্তিগুলি যখনই কোনো কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, অবাঞ্ছিত বৃত্তিগুলি নির্জ্ঞান থেকে তখনই উঠে আসতে চায় আমাদের চেতনায়। এ অবস্থা উপস্থিত হলে অবদমন ছাড়া অন্য মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। নিউরোসিসের লক্ষণ প্রকাশের সুযোগ ঘটে তখনই। এই ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া অনেক রকমের আছে। প্রত্যেকটির কাজের ধরন ভিন্ন। ফলে, মানসিক প্রক্রিয়া (mental mechanism) অনুসারে নিউরোসিস-এর লক্ষণও ভিন্ন হয়।

কনভারসন হিস্টিরিয়াতে কনভারসন নামক প্রক্রিয়া এবং ডিসোসিয়েটিভ হিস্টিরিয়ার ক্ষেত্রে ডিসোসিয়েসন (dissociation) নামক প্রক্রিয়া কাজ করে। যে হিস্টিরিয়াতে শারীরিক লক্ষণ দেখা যায় (যেমন, প্যারালিসিস, অনুভূতির গোলযোগ, ইত্যাদি), তাকে বলা হয় কনভারসন (conversion) হিস্টিরিয়া, আর যে হিস্টিরিয়াতে মানসিক লক্ষণ দেখা যায় (যেমন, ভুলে যাওয়া), তাকে বলা হয় ডিসোসিয়েটিভ(dissociative) হিস্টিরিয়া।

কনভারসন হিস্টিরিয়ার একটা উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। সেই ঘটনায় দেখা গেছে কিভাবে অসাড় বা প্যারালাইজড় হয়ে গেছিল ডান হাতের বুড়ো আঙুল। ডিসোসিয়েটিভ হিস্টিরিয়ার উদাহরণে দেখানো হয়েছে বিয়েব কথা ভুলে যাওয়ার ঘটনা।

কনভারসন হিস্টিরিয়ার উদ্ভব ঘটে কি ভাবে, তার আর একটা উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

সকালে হাসপাতালের বহির্বিভাগে কাজ করছি, এমন সময়ে ১৪/১৫ বছরের সদ্য বিবাহিতা একটি গ্রামের মেয়েকে নিয়ে ৬/৭ জন লোকের একটা দল হাজির হল। মেয়েটির বাপের বাড়ির এবং শ্বশুরবাড়ির উভয় পক্ষের লোকই রয়েছে সেই দলে।

ঘটনাটা এই :

বিয়ের পরের দিন মেয়েটি তার বরের সঙ্গে চলে আসে শ্বশুরবাড়ি। আসার কয়েক ঘণ্টা পরেই কথা বন্ধ হয়ে যায় মেয়েটির। তার পরেও গেছে ২/৩ দিন। মেয়েটির মুখে আর কথা ফুটছে না।

খবর পেয়ে বাপের বাড়ির লোক এসে গেছে। শ্বশুরবাড়ির লোকদের দোষ দিচ্ছে এই বলে যে, মেয়ে তো ভালই ছিল বাড়িতে, শ্বশুড়বাড়িতে ঢুকেই তার এ অবস্থা হল কেন? নিশ্চয় এ বাড়ির লোক কিছু করেছে।

হতবুদ্ধি হয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। কিছুতেই বুঝতে পারছে না কি করে এমনটা হল। তারা তো দেখেছে, কনে-বউ যখন পা দিয়েছে বাড়িতে, তখন তো তার মুখে দিব্যি কথা ফুটছিল। তবে কি কেউ কু-দৃষ্টি [১] দিয়েছে নতুন-বউকে ?

এই ভেবেই ডাকা হল ওঝাকে, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ভৌতিক ক্রিয়াকলাপও কিছু করা হল। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। তখন, প্রায় দু-দিন পর, গ্রাম থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের এই শহরের হাসপাতালে হাজির হয়েছে সদল বলে।

প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করলাম। তারপর আত্মীয়স্বজনদের বাইরে বসিয়ে মেয়েটিকে আলাদা ঘরে এনে তার প্রতি মনোচিকিৎসার বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা প্রয়োগ করা হল। নাটকীয় ভাবে তার মুখে কথা ফুটলো সেই দিনেই। খুবই কম সময়ের মধ্যে সেদিন আমরা যত সহজে সুফল পেয়ে ছিলাম, সাধারণতঃ অত সহজে ফল পাওয়া যায় না।

মেয়ের মুখে ফের কথা ফুটেছে দেখে আশ্বস্ত হল বাপের বাড়ির লোক। হাসি ফুটলো শ্বশুরবাড়ির লোকের মুখে। বন্ধ হল পরস্পরকে দোষারোপ করা। এতক্ষণে মারমুখি হয়ে ছিল উভয় পক্ষই, এখন বিদ্বেষ ভুলে নিবিড় করে তুলল আত্মীয়তার বন্ধন। হাসিমুখে মেয়েকে নিয়ে চলে যাওয়ার আগে অবশ্য আমরা তাদের কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। মেয়েটিকেও রোগী হিসেবে দিয়েছিলাম পরামর্শ।

এই পরামর্শ দেওয়া চলেছিল আরও চার পাঁচ মাস। মেয়েটিকে মনোচিকিৎসা দিয়ে সুস্থ রাখা হয়েছিল, আর বাড়ির লোকজনদের ওপর চলছিল সুপরামর্শ। চিকিৎসা শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতে আবার যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে, তক্ষুনি যেন আমাদের জানানো হয়।

বছর চার পাঁচ পরে অন্য এক রোগীর চিকিৎসার জন্যে মেয়েটির স্বামী এসেছিল আমাদের হাসপাতালে। তার মুখেই শুনলাম, ওরা এখন ঘর করছে, কয়েকমাস আগে তাদের একটি সন্তানও হয়েছে।

চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কিছু বলছি।

বিয়ের পরের দিন মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে পা দিতে না দিতেই আত্মীয় স্বজন আর পাড়াপড়শিরা তার বাপের বাড়ি সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিল। সে সব মন্তব্যের বেশির ভাগই মেয়েটির বাবা আর মা-কে নিয়ে। যেমন, মেয়ের বাবা-মা লোক সুবিধের নয়, নানাভাবে তারা ঠকিয়েছে, গয়নাগাটি-জিনিসপত্র ঠিকমত দেয়নি, ওরা ঠগবাজ, ইত্যাদি।

বিয়ের আগে বিলক্ষণ ডানপিটে ছিল এই মেয়ে। বিয়ের আগে পর্যন্ত কেউ ওর বাবা-মা সম্বন্ধে মন্তব্য করলে সহজে রেহাই পেত না। শুধু মুখে প্রতিবাদ নয়, লাঠিপেটা করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। কিন্তু যেদিন প্রথম সে শ্বশুরবাড়ি আসে, সেদিনই সকালে ওর বাবা বা আত্মীয়রা সকলেই পই-পই করে বলে দিয়েছিল, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে-যাই বলুক, এমন কি বাবা-মা সম্বন্ধেও যদি কেউ কটূক্তি করে প্রতিবাদে একটি কথাও যেন না বলে বসে, সবই সহ্য করতে হবে মুখ বুঁজে। মেয়ের মা তার গা ছুঁইয়ে দিব্যি করে নিয়েছিল এই নিয়ে।

[১] কু-দৃষ্টি— জনসাধারণের মধ্যে এই ধরণের ভ্রান্তধারণা আছে। অশুভ কামনা করে কেউ যদি কারও দিকে তাকায়- যার দিকে তাকানো হবে- তার কিছু একটা অঘটন ঘটবেই। একেই বলে কু-নজর বা কু-দৃষ্টি।

শ্বশুরবাড়িতে ঢুকেই সে শুনলে, বাবা-মা সম্বন্ধে বিশ্রী কটূক্তি। শুনেই তার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল-'আচ্ছা করে গালাগাল দিয়ে শোধ তুলে নিই এখুনি'। কিন্তু তা কি করে হয়! সেদিনই সকালে তার বাবা-মা তাকে নিষেধ করেছে এ ধরনের কোনো কথা যেন মুখ দিয়ে না বেরোয়।

এরপর কি যে হল, মেয়েটির পুরোপুরি মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠেছিল—মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর ঠিক তখন থেকেই লোপ পেল তার কথা বলার শক্তি।

কথা বন্ধ হওয়াটা যে মেয়েটির ইচ্ছাকৃত, তা নয়, মানসিক প্রক্রিয়ার ফলেই তাকে বাক্‌রহিত হতে হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াকেই বলা হয় কনভারসন—এর ফলে দ্বন্দ্বজনিত মানসিক যন্ত্রণা শারীরিক অক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিত অবস্থাটাকেই বলে কনভারসন হিস্টিরিয়া।

কথাবলার শক্তি হারিয়ে ফেলে মেয়েটি অক্ষম হয়েছিল ঠিকই—কিন্তু একটা লাভও হয়েছিল। অসুস্থ হয়েছিল বলেই এই লাভ জুটে গেছিল তার বরাতে। এই ঘটনার পর এমনই ভয় পেয়েছিল শ্বশুরবাড়ি লোকেরা যে, ভবিষ্যতে বাবা-মা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য একেবারেই করেনি, উপরন্তু খুবই সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল বৌমার প্রতি। একে বলে হিস্টিরিয়া রোগের মুনাফা (hysterical gain)। এই মুনাফাই হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলিকে জিইয়ে রাখে।

আশাকরি, মনঃসমীক্ষকদের দেওয়া হিস্টিরিয়া রোগের কারণ বিষয়ের ব্যাখ্যা এখন বোঝা যাচ্ছে।

কিছু কিছু স্নায়ুবিজ্ঞানী (neurologist) মনে করেন, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার গোলযোগের ফলে হিস্টিরিয়া হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

হিস্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা

অনেক যন্ত্রণা দায়ক শারীরিক ব্যাধি আছে যার সঙ্গে হিস্টিরিয়ার লক্ষণও দেখা দিতে পারে। আবার এমন কঠিন মানসিক ব্যাধি আছে যেখানে হিস্টিরিয়ার লক্ষণও অনুপ্রবেশ করতে পারে। এই কারণেই সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করা খুবই দরকার। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষানিরীক্ষার পর যদি দেখা যায়, অন্য অসুখের অস্তিত্ব রয়েছে, তাহলে সেই রোগের চিকিৎসাই যথেষ্ট, হিস্টিরিয়ার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসার আর দরকার হয় না। যেমন বিষণ্ণতা রোগে (depressive illness) প্রায়ই হিস্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা যায়—এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ওষুধ দিয়ে বিষণ্ণতার চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট।

যেখানে শুধুমাত্র হিস্টিরিয়া রোগই বর্তমান, সেখানে মনোচিকিৎসাই শ্রেয়। এর চিকিৎসায় ওষুধ প্রয়োগের তেমন স্থান নেই। আগে সম্মোহন চিকিৎসার প্রচলন ছিল খুবই। অনেক সময় সম্মোহনের সাহায্য নিলে তাড়াতাড়ি সেরে যায় এই রোগ। কিন্তু যত দ্রুতগতিতে সারে, তত দ্রুতগতিতে তার পুনরাবির্ভাবও ঘটে।

৮

আতঙ্ক বা ফোবিয়া (Phobia)

আমার এক আত্মীয় বাড়িতে এসেছিলেন কিছুদিন আগে। বসার ঘরে বসে সবাই গল্প করছি। আত্মীয়র সাতবছরের মেয়েটিও রয়েছে। নাম তার মিনি।

হঠাৎ মিনি জড়িয়ে ধরল তার মা'কে। বলে উঠল কান্নার সুরে—মা, মাগো, পালিয়ে এস এক্ষুনি। আর থেকো না এখানে।

আমরা তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম—'হয়েছে কি ? পালাবে কেন ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে একঘেয়ে কান্নার সুরে একই কথা মিনি বলে চলল বারবার—এখানে নয় ! এখানে নয় ! এখুনি পালাও এখান থেকে। ভীষণ ভয় করছে, মা। এক্ষুনি চলো।

চলো বললেই কি চলে যাওয়া যায় ? চেপে ধরলাম মিনিকে। অনেক পীড়াপীড়ির ফল ফলল, পেছনের দেওয়ালের দিকে আঙুল তুলে অস্ফুট স্বরে বললে মিনি—'টিকটিকি ! ঐ তো.......ঐ দ্যাখো' !

চোখ তুলে দেখলাম, সত্যিই দেওয়ালে লেগে রয়েছে সামান্য একটা টিকটিকি।

মিনির মা তখন বললে—টিকটিকিকে বড় ভয় পায় মেয়েটা।

হৈ-হৈ করে টিকটিকিকে তক্ষুনি তাড়ানো হল ঘর থেকে। মিনি কিন্তু বসেই রইল চোখ বুঁজে। ভয়ে কাঠ।

সবাই মিলে বোঝালাম, মনে সাহস জোগালাম। তখন চোখ খুলল বটে মিনি, কিন্তু ভয়ে ভয়ে বসে রইল মাকে ঘেঁষে। বারে বারে সভয়ে তাকাতে লাগল দেওয়ালের দিকে—টিকটিকি যদি আবার ফিরে আসে ? পরে অনেক আদর-টাদর করে জিজ্ঞেস করেছিলাম মিনিকে অত ভয় কিসের টিকটিকিকে ? কিছুই তো করবে না।

জানি কিছু করবে না, বলেছিল মিনি—তবুও বড্ড ভয় করে।

কিছুদিন আগে ১৮/১৯ বছরের এক কিশোর এসে বলে গেল আমাকে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। কলকাতায় আজকাল উঁচু উঁচু অনেক বাড়ি তৈরি হয়েছে। এইরকম একটা বাড়ির সতেরো তলায় সে উঠেছিল একজনকে একটা চিঠি দেওয়ার জন্যে।

উঠেছে লিফটে। চিঠিটা যে ঘরে গিয়ে হাতে হাতে দেওয়ার কথা, ঢুকেওছে সেই ঘরে। আর ঠিক তখুনি জানলা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে নিচের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আতঙ্ক আছড়ে পড়েছে বেচারার ওপর। নামহীন আতঙ্কের শুরু হয়ে গেছে বুক ধড়ফড়ানি, ঝিমঝিম করছে মাথা। সেইসঙ্গে মনে হচ্ছে, জ্ঞান হারাবে

এখুনি—মৃত্যুরও বুঝি আর দেরি নেই।

টলতে টলতে কি ভাবে যে সেদিন সে লিফটে চড়ে একতলায় নেমে এসেছিল, তা ভাবলেই এখনো সে শিউরে ওঠে। নিচে নেমেও মাথা ঘোরা আর গা বমিবমি ভাবটা যায়নি। চোখে মুখে বেশ কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হয়েছে অনেকক্ষণ। প্রকৃতিস্থ হয় তারপর।

এই যে মেয়েটি যে টিকটিকি দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়, অথবা এই কিশোরটি যে উঁচু বাড়িতে উঠলে উদ্বেগে-আতঙ্কে মরো-মরো হয়, এরা দুজনেই কিন্তু অন্য সব বিষয়ে একেবারে স্বাভাবিক। আর কোনো ব্যাপারেই অযথা উৎকণ্ঠা নেই।

এরা দুজনেই আতঙ্কের (phobia) রোগী।

ফোবিয়া একরকমের নিউরোসিস। এই রোগে দেখা যায়, রোগীরা যখন কোনো বিশেষ অবস্থায় পড়ে, বিশেষ কোনো বস্তুর সামনা-সামনি হয়, তখনি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে—যদিও ওই অবস্থা বা বস্তুর মধ্যে বাস্তবিক ভয়াবহতা কিছুই থাকে না। এই সঙ্গে আরও দেখা যায় যে, এই ধরনের রোগীরা সব সময়েই চেষ্টা করে ওই অবস্থায় না পড়ার, অথবা এই সব বস্তুর মুখোমুখি না হওয়ার। যদি ঐ অবস্থায় পড়ে যায় তাহলে—কি ভাবে সেখান থেকে পালাবে তার পথ খোঁজে।

অহেতুক ভয় অনেক রকমের। যেমন, বদ্ধ জায়গায় থাকতে ভয়, উঁচু জায়গায় উঠতে ভয়, বজ্রপাতের ভয়, অথবা বোমা পটকাতে ভয়, ইত্যাদি। এই ধরনের নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে নির্দিষ্ট বস্তুতে ভয়। যেমন, আরশুলা, মাকড়শা, টিকটিকি, কেঁচো, পোষাকুকুর কিংবা বেড়ালে ভয়, ইত্যাদি।

এই সব রোগীরা যে বস্তুতে অথবা যে জায়গায় আতঙ্কে ভোগে, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে সে সবের কাছাকাছি না হতে হয়।

কালীপুজোর সময়ে কলকাতার বোমা-পটকার উপদ্রব এড়াতে বেশ কিছু লোক ঠিক ওই সময়টা পয়সা খরচ করে পুরী বা উটিতে গিয়ে থাকেন। মাকড়শা বা টিকটিকি প্রায় বাড়িতেই কিছু না কিছু আছেই। যারা এদের ভয় পায়, তারা কিন্তু এই জীবগুলোকে বাড়ি থেকে একেবারে বিদায় না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না কিছুতেই।

একধরনের রোগী—একা কোথাও যাওয়ার নামে আঁৎকে ওঠে। বিশেষ করে সেই সব জায়গা যদি প্রকাশ্য স্থান হয়—যেখান থেকে মনে করলেই সহজে বেরিয়ে আসা যাবে না, যেমন, ভিড়ের জায়গাগুলো—দোকান, হাট-বাজার ও বাস, ট্রেন, ট্রাম। একটা ভয়ই সব সময়ে ঢুকে থাকে রোগীর মনের মধ্যে। সে ভয়টা এই : হঠাৎ যদি কিছু হয়ে গিয়ে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, জ্ঞান হারিয়ে যাবার মত অবস্থা এসে যায়—তখন সাহায্য পাওয়া যাবে কার কাছে থেকে ? কি ভাবে ? মনে করলেই তো এ সব জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। তার চাইতে না যাওয়াই ভাল। এরা রাস্তা পার হতে ভয় পায়, সুড়ঙ্গর মধ্যে দিয়ে বা সেতুর ওপর দিয়ে যেতে ভয় পায়। সঙ্গে যদি কেউ থাকে, কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব—তাহলে আর ভয় নেই। এমন কি একটা বাচ্চা ছেলেও যদি সঙ্গে থাকে, তাহলে এরা থাকে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত।

এমন কিছু পুরুষকেও আমি জানি যাদের স্ত্রীরা তাদের অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসে, আবার অফিস ছুটির পর সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসে ঠিক যে ভাবে মায়েরা শিশুদের স্কুলে নিয়ে যান, স্কুল থেকে নিয়ে আসেন।

এই ধরনের ভীতির মধ্যে প্রধান যা, তা হচ্ছে এই, যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে সাহায্য

পাওয়া যাবে কি ভাবে ? সে জায়গা থেকে ঝটপট বেরিয়ে আসা যাবে তো ?

এরা যদি সিনেমা থিয়েটারেও যায়, সারির মাঝের আসনে কখনই বসে না, পছন্দ করে ধারের আসন, যেখান থেকে দরকার হলেই সহজে এবং তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা যায়। যেহেতু বাস, ট্রেন, ট্রাম দরকার মত থামে না, কিন্তু থামানো যায় প্রাইভেট গাড়িকে, অতএব তুলনামূলক ভাবে প্রাইভেট গাড়িতে চাপা অনেক নিরাপদ। বাস, ট্রেন, ট্রাম বর্জন করে প্রাইভেট গাড়িতে চেপে অফিস যাতায়াত করতে গিয়ে এদের মাস বেতনের অর্ধেকেরও বেশি খরচ হয়ে যায়। কেউ কেউ স্রেফ নিরাপত্তার জন্যে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে অফিস যাতায়াত করে। সময় যায় অনেক, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ে—তাসত্ত্বেও ট্রাম বা বাস-ট্রেনে নৈব নৈব চ।

এমন লোকও আছে যারা জনসমাগমের জায়গায় যেমন, সভাসমিতি, নেমন্তন্নবাড়ি—যেতে ভীষণ ভয় পায়। কেন ? সবাই যে তাকিয়ে থাকবে এদের দিকে। এদের চাল চলন, কথাবার্তা নিয়ে কানাকানি, আলোচনা, সমালোচনাও হতে পারে। অতএব না যাওয়াই ভালো।

আর যদি এ সব জায়গায় বক্তৃতা দিতে হয়, তাহলে তো কথা নেই। কাঁপুনি, গা-বমি, মাথা ঝিমঝিম শুরু হয়ে যায়। যদি যেতে বাধ্য করা হয় এদের এই সব জায়গায় তাহলে আসক্ত হয়ে পড়ে মদ্যপানে। কারণ, মদ্যপানে নার্ভাসনেস সমায়িকভাবে কিছুটা কমে। এভাবে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে যাওয়াটাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। তপ্তকটাহ্ থেকে উন্মুক্ত আগুন অনেক বেশি ভয়াবহ।

ফোবিয়া যে কত বিচিত্র রকমের হতে পারে, তা বলে শেষ করা যাবে না। তবুও আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

অহেতুক রোগের ভয় আছে বেশ কিছু লোকের। যেমন, ক্যানসার, যক্ষ্মারোগ, যৌনব্যাধি, ইত্যাদির ভীতি। এ ছাড়াও আছে দাঁত তোলা নিয়ে প্রচণ্ড আতঙ্ক। অথচ দাঁত তোলা এমন কিছু ব্যাপার নয়। অতি সামান্য অপারেশন, ব্যথা লাগে না বললেই চলে, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারের নামেই সিঁটিয়ে ওঠেন, এমন লোকের অভাব নেই। একাধিক ব্যক্তিকে আমি জানি যাঁরা দাঁত তোলাতে গিয়ে দাঁতের গোড়ায় ইঞ্জেকশন নিয়েই ডেন্টিষ্টের চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চেম্বার থেকে পালিয়ে এসেছেন। দাঁত তোলা তো হয়ইনি—উল্টে কঠিন নার্ভাস ব্রেকডাউন (nervous breakdown) হয়ে যাওয়ায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হয়েছে।

লোকজনের সামনে লিখতে বা খেতে পারেন না, অথবা সর্বসাধারণের শৌচাগারে প্রস্রাব করতে পারেন না, এমন ব্যক্তিদের খবর অনেকেই রাখেন। এমন লোকও আছে যারা রাস্তায় বেরোনোই ছেড়ে দিয়েছে পাছে রাস্তায় বেরোলেই পায়খানা পেয়ে যায়। হুট করে বেগ এলে যদি পায়খানার উপযুক্ত জায়গা না পাওয়া যায় ? যদি কাপড়চোপড়ে হয়ে যায় ? সে তো বিষম বেইজ্জতের ব্যাপার। তার চাইতে না বেরোনোই ভাল। —অথচ এরকম অভিজ্ঞতা কখনই এদের হয়নি।

আতঙ্ক বা ফোবিয়া (Phobia) হয় কেন

হিষ্টিরিয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা আলোচনা করেছি—অবদমিত অবাঞ্ছিত বৃত্তিগুলি যখন, অবদমনের বাধাকে আংশিকভাবে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়, তখনই

তাদের বাধা দিতে এগিয়ে আসে অবদমন ব্যতীত অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াগুলি। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিই নির্ধারিণ করে কি ধরনের নিউরোসিসের উদ্ভব হবে। হিস্টিরিয়াতে দেখানো হয়েছে, কনভারসন (মানসিক যন্ত্রণাকে শারীরিক অক্ষমতায় পরিবর্তন করা) এবং ডিসোসিয়েসন (বেদনাদায়ক স্মৃতিকে চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা) হিস্টিরিয়ারলক্ষণ প্রকাশের মাধ্যমে উৎকণ্ঠার উপশম ঘটায়।

আতঙ্ক বা ফোবিয়ার ক্ষেত্রে একটি ভয়ের পরিবর্তে অন্য কিছু ভয়ের সৃষ্টি করে উৎকণ্ঠার উপশম ঘটানো হয়। এর মধ্যে প্রথমটি অধিক উৎকণ্ঠা উদ্দীপনকারী যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, তার পরিবর্তে দ্বিতীয়টি যা অপেক্ষাকৃত কম উৎকণ্ঠার উদ্দীপনা ঘটায়, সেটিকে তবুও গ্রহণ করা যায়। এই ভাবে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির প্রতিকল্প (substitute) হিসেবে দাঁড় করিয়ে উৎকণ্ঠার আংশিক উপশম ঘটানো যায়। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রতিকল্পন (substitution)।

এখন একটা উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক, যৌনবৃত্তি-পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে গর্ভবতী হয়ে পড়ার ভয়ের প্রতিকল্প হিসেবে কেমন করে খাড়া করা যায়—যেমন হয়েছিল ১১/১২ বছরের মেয়ে সুনন্দার ক্ষেত্রে। সুনন্দা জীববিজ্ঞান পড়ার সময়ে শিখেছিল স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনে স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান আসে। এর পরেই তার মনে ঢুকলো ভয় : পুরুষের ছোঁয়াছুঁয়িতে, এমন কি পুরুষের বিছানা, জামা, কাপড়ের ছোঁয়া লাগলেও যদি পেটে সন্তান এসে যায় ? পেটে বাচ্ছা এসে গেলে কি করবে—দিবানিশি এই ভয়েই সিঁটিয়ে রইল সুনন্দা। বলবে কি পাঁচজনকে ? যে কোনো পুরুষের সংস্রবই তার কাছে ভীষণ আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত।

মনঃসমীক্ষার চিকিৎসায় কিছুদিনের মধ্যে জানা গেল, তার নির্জ্ঞান মনে লুকিয়ে রয়েছে পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসার বাসনা। সেই ইচ্ছা ছিল অবদমিত, চেতনায় প্রবেশ করতে পারেনি। কিশোরীর যৌন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অবদমিত সেই যৌন ইচ্ছার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে—আর ঠিক তখনি এই যৌন ইচ্ছাকে আরও উস্‌কে দিয়েছে জীববিজ্ঞানের শিক্ষা। এতদিন যে যৌন ইচ্ছা অবদমিত ছিল, এখন তা অবদমনের শক্তিকে পরাজিত করে সজ্ঞানে উদিত হবার উপক্রম করেছে। যৌন ইচ্ছার এই উদ্যোগ মেয়েটির মনকে আচ্ছন্ন করেছে এক নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনায়, অসহ্য উৎকণ্ঠা সেই বিপদেরই অশনি-সঙ্কেত। এহেন অবস্থায় মেয়েটির অজ্ঞাতেই একটি মানসিক প্রক্রিয়া তার যৌন ইচ্ছার পরিবর্তে প্রতিকল্পন (substitution) হিসেবে দাঁড় করিয়েছে পুরুষের ভয়—এবং মুখ রক্ষে করেছে মেয়েটির। এর ফলে একভাবে তার উপকারই হয়েছে। সমাজে ঘৃণার পাত্রী না হয়ে এখন হয়েছে অনুকম্পার পাত্রী—এতে অশান্তি যাই থাকুক, সমাজগ্রাহ্য তো বটে।

মনে পড়ে এক যুবকের কাহিনী। তার মনে আতঙ্ক ছিল যৌনব্যাধির।

মনোচিকিৎসার কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল, যৌবনের প্রেরণায়, যখন তার সহজাত যৌন ইচ্ছা অবৈধভাবে প্রকাশিত হবার উপক্রম করেছিল অবদমনের বাধা ভেদ করে, তখন যে কঠিন মানসিক দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটেছিল যুবকটির মনে, সেই বিপদেরই সঙ্কেত অনুভূত হয়েছিল দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে। এই মুশকিলেরও আসান হয়ে গেল যুবকটির অজ্ঞাতেই, প্রতিকল্পন (substitution) নামক মানসিক প্রক্রিয়া তার অসামাজিক যৌন আকাঙ্ক্ষার জায়গায় দাঁড় করালো যৌনব্যাধি-আতঙ্ক। রেহাই পেয়ে গেল যুবকটি—অবৈধ যৌনবৃত্তিকে স্বীকার করলে তো সমাজে আর মুখ দেখান যেতো না।

আর একটি মহিলার কথা বলি। ছুরি অথবা যে কোনো ধারালো জিনিস দেখলেই তার মনে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হোত। মনোচিকিৎসা চলার সময়ে জানা গেল যে, তার নির্জ্জান মনে অবদমিত রয়েছে ধ্বংসাত্মক বৃত্তি। ধ্বংসাত্মক বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্যের ওপর আঘাত হানবার প্রবৃত্তিতে। অবদমিত এই ধ্বংসাত্মক বৃত্তি যখনই অবদমনের বাধাকে অতিক্রম করে সজ্ঞানে আসবার উপক্রম করেছিল, তখনই নির্জ্জান মনের বিপদের সঙ্কেত মহিলাটির অজ্ঞাতেই সৃষ্টি করে নিয়েছিল অসহনীয় উৎকণ্ঠা। দুরূহ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল প্রতিকল্পন নামক মানসিক প্রক্রিয়া যা তার অন্যের ওপর আঘাত হানবার অসামাজিক আচরণকে শাণিত বস্তুর আতঙ্কে পর্যবসিত করে দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। 'অন্যকে ছুরি মারতে চাই'— এই মনোবৃত্তিব চেয়ে 'ছুরি দেখলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাই', এই আতঙ্ক তো গ্রহণযোগ্য।

এখন নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে, আতঙ্ক বা ফোবিয়া কি ভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

অনেক মনোবিজ্ঞানী শারীরবৃত্তের (physiological) সাহায্যে আতঙ্কের ব্যাখ্যা করতে চান। গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে, একটা ইঁদুরকে তার প্রিয় খাদ্য দিয়ে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, সেই খাবার খেতে গেলেই তাকে তীব্র বেদনার বৈদ্যুতিক শক্ খেতেই হবে। এই ভাবে প্রতিদিন কিছুক্ষণ করে শক্ দেওয়া হল দিন কয়েক ধরে। এর ফলে প্রিয় খাদ্যটার ওপরেই তার বিতৃষ্ণা এসে গেল এবং মনে এমন ভয় ঢুকে গেল যে ঐ খাবারের ধারে কাছেও আর যেতে চাইত না।

মানুষের মধ্যেও বিশেষ আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতা থেকে দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ক বা ফোবিয়া জন্মাতে পারে। মনে পড়ে একটি ৫/৬ বছরের গ্রামের মেয়ের কথা। একটা খ্যাপা শেয়াল যাকে পাচ্ছে তাকে কামড়াচ্ছে,এই গুজব রটেছিল গ্রামে। গুজবে নাকি কিছুটা সত্যিও আছে। অনেকেই তার কামড় খেয়েছে। এই সময় একদিন মেয়েটি তার কাকার সঙ্গে যাচ্ছিল মাঠের দিকে—এমন সময়ে লোকজনের হৈ-হট্টগোল—তীব্রবেগে একটা শেয়াল ছুটে এসেই পুকুরপাড়ে বাসন-ধুতে বসা একজনকে কামড়ে দিয়েই উধাও হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। ছোট্ট মেয়েটি তার চোখের সামনেই দেখল এই দৃশ্য এবং এমনই ভয় পেল যে কাকাকে আঁকড়ে ধরে কোলে উঠে চোখ বন্ধ করে কাঁদতে লাগল সমানে। শুধু কান্না নয়—এক্ষুনি ছেড়ে যেতে হবে এই জায়গা—এখানে আর নয়—বাড়ি চল এক্ষুনি।

এরপর দীর্ঘদিন ওই মাঠে আর ওই পুকুরের ধারে মেয়েটিকে কোনমতেই নিয়ে যাওয়া যায়নি। অবশ্য এর ফলে মেয়েটির মনে অন্য কোনোরকম মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়নি।

এই ধরনের ঘটনায় আতঙ্ক হতে পারে ঠিকই, তবে বেশির ভাগ আতঙ্কের ক্ষেত্রে এ জাতীয় আতঙ্কের ইতিহাস পাওয়া যায় না।

আতঙ্ক বা ফোবিয়ার চিকিৎসা কি

অন্যান্য নিউরোসিসের মত এক্ষেত্রে প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে, মনোচিকিৎসা (psychotherapy) আর আচরণ পরিবর্তনকারী (behaviour therapy) চিকিৎসা। অনেক সময় এই নিউরোসিস বিষণ্ণতা (depression) রোগের সঙ্গে একই সঙ্গে হয়। এই রোগে অ্যান্টিডিপ্রেশিভ ওষুধ যথেষ্ট ফলপ্রদ, বিশেষ করে আতঙ্ক যখন বিষণ্ণতার সঙ্গে যুক্ত।

৯

অবসেসিভ-কমপালসিভ নিউরোসিস

এই একরকমের নিউরোসিস যার শরীরভিত্তিক কারণ আজও সঠিক কিছু জানা যায়নি।

সুধীর দাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একদিন হঠাৎ একটা প্রশ্ন এল তার মাথায়—মানুষের জন্যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, না, পৃথিবীর জন্যে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ?

কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য তিনি বুঝতে পারলেন, এ প্রশ্ন তাঁর কাছে একেবারেই নিরর্থক এবং এ চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কাজের জন্য চিন্তায়, যেমন পড়াশুনায় মন দেওয়া দরকার।

চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়ানোর অনেক চেষ্টা করলেন সুধীরবাবু, কিন্তু পারলেন না। চিন্তা আর মন থেকে যায় না। যতক্ষণ জেগে আছেন, তা সে বাড়িতেই হোক কি কলেজের ক্লাসেই হোক, নাছোড়বান্দা চিন্তাটা তাঁকে রেহাই দিচ্ছে না কিছুতেই। ফলে, মন দিতে পারছেন না অন্য কোনো ব্যাপারে।

নিতাই ভট্টাচার্য নামে এক স্কুলের শিক্ষককে চিনতাম। সংস্কৃত পড়াতেন। শিক্ষকতার বেশ সুনাম ছিল। স্বল্পভাষী। বাড়ি স্কুল থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। রোজই তিনি এই পথ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন। মজ্জাগত একটি অভ্যাসের ফলে প্রতিদিনই বাড়ির একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে স্কুলের একটি নির্দিষ্ট জায়গা পর্য্যন্ত পা গুণে গুণে হেঁটে স্কুলে আসতেন। কোনো দিন মাঝ রাস্তায় এসে যদি ভুলে যেতেন কত হাঁটা হয়েছে, তাহলে ফিরে গিয়ে বাড়ির সেই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আবার হাঁটা শুরু করতেন। এ ভুল অবশ্য রোজ হত না, তবে বছরে বেশ কয়েকবার তো হতই। এ ভাবে গুণে গুণে হাঁটার যে কোনো দরকার নেই, নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় কাজ—তা তিনি জানতেন, তবুও এটি না করে তিনি পারতেন না।

সুধীরবাবুর ক্ষেত্রে যা হচ্ছে, তা অবসেসিভ নিউরোসিস এবং নিতাইবাবুর ক্ষেত্রে কমপালসিভ নিউরোসিস।

অবসেসন এক রকম চিন্তা, ধারণা অথবা কল্পনা যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোগীর মনে অনবরত আসে। সে জানে এগুলি অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক। মন থেকে তাড়াতেই চায়। কিন্তু কিছুতেই পারে না। এই নিয়ে তাকে একটা বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক অবস্থায় থাকতে হয়—একান্ত প্রয়োজনীয় কাজেও মন দিতে পারে না।

কমপালসন একটা কাজ যা রোগীকে বারে বারে করে যেতে হয়, অথচ সে এ কাজ করতে চায় না। এই নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট হয় তার নিজের, প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে

পারে না—সে সব কাজে দেরিও করে ফেলে—তবুও নিরর্থক অপ্রয়োজনীয় কাজটা থেকে কিছুতেই বিরত থাকতে পারে না।

অবসেসন এবং কমপালসন একই রোগীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, অথবা একই সঙ্গে একই সময়ে থাকতে পারে । এই জন্যেই এ দুটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে—অবসেসিভ-কমপালসিভ নিউরোসিস। দুটির প্রকৃতি একই, তফাৎ শুধু এক জায়গায় : অবসেসনের প্রকাশ চিন্তায়, আর কমপালসনকে বোঝা যায় রোগীর ব্যবহারে এবং কাজে।

এক রোগীর মনে হল—তাল গাছ লম্বা আর পেয়ারা গাছ বেঁটে কেন ?রোগী বুঝতে পারছে, এটা তার অমূলক চিন্তা, অথচ সে চিন্তাটাকে তাড়িয়ে অন্য কাজে মন দিতে পারছে না। মন অস্থির লাগছে, মনে কষ্ট হচ্ছে, অথচ একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়।

এক্ষেত্রে চিন্তার মধ্যে কোন দোষ নেই। অত্যন্ত সহজ, সরল। শুধু তা মনে গেঁথে গেছে, অসুবিধা সেইখানেই।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমন যে, চিন্তাটা বড়ই পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এক বিধবা মহিলার মনে হল—কেউ যদি তাঁর চরিত্রে দোষ দেয় ? এ চিন্তা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা তিনি ভালভাবেই জানেন—অথচ চিন্তাকে আর মন থেকে তাড়াতে পারছেন না। এ ক্ষেত্রে চিন্তা কি খুবই পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে না ?

আর এক ভদ্রলোকের কথা শুনুন। তাঁর কেবলই মনে হয়, রাস্তার সব লোকই যেন উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ তিনি স্পষ্ট দেখছেন, বাস্তবিকই কেউই উলঙ্গ নয়। শুধু কি রাস্তার লোক, ঠাকুর দেবতার মূর্তি অর্থাৎ প্রতিমাগুলোকেও উলঙ্গ মনে হচ্ছে—অথচ তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, এমন কি বুঝতে পারছেন যে, প্রত্যেকেই সাজপোশাক পরে আছেন। কিন্তু আপদ চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়াতে পারছেন না কিছুতেই। কষ্টদায়ক এ সব চিন্তায় তাঁর মনে উৎকণ্ঠা জাগছে। নিজেকে মনে হচ্ছে মহাপাপী, না হ'লে এ সব পাপচিন্তা মাথায় আসছে কেন ? নিশ্চয় অনেক পাপ করা হয়েছে, তাই পাপের সাজা পেতে হচ্ছে এই ভাবে। ফলে, বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে রোগী।

একজন ২২/২৩ বছরের কলেজের ছাত্রের হঠাৎ মনে হলো, যদি তার বাঁ দিক দিয়ে কোনো গাড়ি চলে যায়, তাহলেই মারা যাবে তাঁর বাবা।

খুবই বিপজ্জনক চিন্তা। ছাত্রটি ভালভাবেই জানে, বাঁ দিক দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সঙ্গে তার বাবার মৃত্যুর কোনো সম্পর্কই নেই। থাকতে পারে না।

কিন্তু বুঝেও তো কিছু হচ্ছে না। উদ্ভট চিন্তা আর যায় না মন থেকে। তাই তাকে এমন ভাবে রাস্তায় চলতে হয় যাতে কোনো গাড়ি যেতে না পারে বাঁ দিক দিয়ে। পথ চলতে গিয়ে সে এক দুঃসহ উদ্বেগ।

ছেলেটি থাকে কলকাতাতে—এক হোষ্টেলে। বাড়ির চিঠি এলেই বিষম উৎকণ্ঠায় পড়তে থাকে প্রতিটি লাইন—বাবা বেচেঁ আছে তো ?

এখানে অবসেসন আর কমপালসন দুটিই একসঙ্গে রয়েছে। বাঁদিক দিয়ে গাড়ি চলে গেলে বাবা মারা যাবে, এই চিন্তাটা অবসেসন। আর তাকে বাঁদিক ঘেঁষে পথ চলতে হচ্ছে, এটা কমপালসন।

অনেক সময়ে এই ধরনের চিন্তা থেকে ফোবিয়া বা আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে।

যেমন, ছুরি বা বঁটি দিয়ে তরকারী কাটার সময়ে এক মায়ের মনে হল, গলা কাটছে নিজের ছেলের।

ছুটে গিয়ে তিনি দেখে এলেন ছেলেকে—ছেলে তো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে বিছানায়।

সব ঠিক আছে তিনি দেখলেন বটে, কিন্তু ভয়ানক চিন্তাটাকে দূর করতে পারলেন না মন থেকে। চিন্তার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ছুরি বঁটি জাতীয় ধারালো জিনিস দিয়ে কাজ করাই ছেড়ে দিলেন। চোখের সামনে থেকে যাবতীয় শাণিত বস্তু সরিয়ে ফেললেন। কিন্তু মন থেকে সরাতে পারলেন না চিন্তাটাকে।

চিন্তা আর যায় না। যেখানে ছুরি কাটারি বঁটি অন্যান্য ধারালো জিনিস থাকতে পারে সে সব জায়গা এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। তবুও রেহাই পেলেন না আতঙ্কজনক চিন্তার খপ্পর থেকে, দুনিয়ার ধারালো জিনিসের ওপরে আতঙ্ক থেকেই গেল মাথার মধ্যে। কারো কারো এমন হয় যে, কোনো একটা কাজ করলেন বটে, কিন্তু করবার পরেই মনে হলে, বোধ হয় ঠিকমত করা হয়নি কাজটা। যদিও তিনি জানেন, ঠিকই করেছেন—কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? বারে বারে দেখেন, ঠিকমত কাজটা করেছেন কি না। দেখতে বাধ্য হন।

যেমন, আলমারীটা বন্ধ করে তালাটা লাগিয়েছেন ঠিকই—তবুও বারে বারে টেনে দেখতে হবে ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা।

যাকে সাধারণতঃ শুচিবায়ু বলা হয়, সেই শুচিবায়ু রোগীরা কোনো একটা জিনিস পরিষ্কার আছে জেনেও বারে বারে ধুয়ে যান, নিজের হাত-পা, ঘর-দোর, টাকার নোট পর্যন্ত সব কিছুই ধুয়ে যেতে হয়।

কুকুর নোংরা—এমনটা মনে হয় অনেক রোগীর। কাজেই কুকুরে যা ছোঁবে—তাও নোংরা হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। কুকুর হয়তো ২০ মিটার তফাতে থেকে রাস্তা দিয়ে চলে গেল—কিন্তু রোগীর মনে হবে—কি সর্বনাশ। ঘরে ঢোকেনি তো কুকুরটা ? রোগী দেখেছে ঠিকই—কোনো ভুলই হয়নি—ঘরেই ঢোকেনি কুকুর—কিন্তু মন যে মানে না। আশপাশের সব্বাইকে জিজ্ঞেস করে জানতে চায়,কুকুর ঘরে ঢুকে পড়েছিল কিনা। প্রত্যেকেই বললে একই কথা—ঘরে ঢোকেনি কুকুর।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। রোগী বসে গেল ঘরের সমস্ত জিনিস ধুয়ে নোংরা মুক্ত করার কাজে।

এখানে আমরা দেখছি, অবসেসন চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে—যেমন, একটা ধারণা (idea) —মানুষ সৃষ্টি হল কেন ?......কাল্পনিক প্রতিমূর্তি (image) —ছবিতে দেবদেবীদের বিবস্ত্র রূপ দেখা। ....কিছু একটা করেই ফেলবে, এমন একটা ভাব (impulse) —দেওয়ালে টাঙানো দেবী মূর্তির দিকে পা চলে যাবে মনে হচ্ছে।......ফোবিয়া (phobia) বা আতঙ্ক—ধারালো জিনিসে ভীতি। ......সন্দেহ (doubt) —তালাটা কি ঠিক লাগিয়েছি ?

যে সব ক্ষেত্রে একটা কাজ বারে বারে করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কমপালসন (compulsion)। যেমন, বারে বারে ধোয়া, ছোঁয়া, গোনা ইত্যাদি, এ সব কাজ করতে না পারলে যেন সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবে—কেউ মারা যাবে, কারও অসুখ হবে, অথবা অন্য কোন বিপদ হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

শৈশবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা অথবা অভ্যাস দেখা যায়—বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে, অথবা বাড়িতে কারও বেশি অসুখ বিসুখ হলে। যেমন, রাস্তায় চলবার সময়ে ফুটপাতের জোড়াতে পা দিয়ে, অথবা পা না দিয়ে চলা, রাস্তার প্রতিটি ল্যাম্পপোষ্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলা। এগুলো করতে না পারলেই কিছু একটা খারাপ হবেই হবে—এই ভয়।

এ সব অভ্যাস বড় হলে আর থাকে না।

অবসেসিভ-কমপালসিভ নিউরোসিসের কারণ

১। শরীরভিত্তিক কারণ:

কোনো কোনো গবেষক লক্ষ্য করেছেন, এই সব রোগীদের জন্মের সময়ে মাথায় আঘাতের ইতিহাস প্রায়ই পাওয়া যায়। এ ছাড়া, মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে মৃগী (epilepsy) রোগ হয়, সে সব ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়ে অবসেশন-কমপালসনের লক্ষণ-দেখা যায়। এই সব থেকেই অনুমান করা হয় যে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে এই রোগের সম্পর্ক আছে। এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

২। বংশগত কারণ:

কোনো কোনো সময়ে দেখা যায় যে, একই পরিবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে এই রোগে ভুগছেন। কিন্তু তা থেকে সঠিক ভাবে প্রমাণ করা যায়নি যে এরোগ নিছক বংশগত কারণেই হয়, অথবা একসঙ্গে বসবাস করার ফলে একের অভ্যাস অন্যকে প্রভাবিত করে।

৩। মানসিক কারণ:

মনঃসমীক্ষার তত্ত্ব অনুযায়ী নিউরোসিস-এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, অবদমিত (repressed) অসামাজিক বৃত্তিগুলি যখন অবদমনের বাধাকে অতিক্রম করে সজ্ঞানে বেরিয়ে আসার উপক্রম করে, তখনই কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া (mental mechanisms) তাদের বাধা দেয়—যাতে ওই বৃত্তিগুলি স্বরূপে প্রকাশিত হতে না পারে। এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কাজের রীতির ওপরেই নির্ভর করে কোন্ নিউরোসিসের আবির্ভাব ঘটবে।

অবসেভি-কমপালসিভ নিউরোসিসের চারটি মানসিক প্রক্রিয়া

১। স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation):

'শ্যামের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটা রাস্তায় পড়ে আছে',রাম নিশ্চিত জানে যে, শ্যাম মারা যায়নি এবং এই কল্পনা মনে আসছে বলে রামের মনে দুঃখ বা সুখ কোনো অনুভূতি নেই। রাম তার মন থেকে ধারণাটা তাড়াতে চাইছে অন্য কিছুতে মন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে।

মনঃসমীক্ষায় দেখা গেল, রামের নির্জ্ঞান মনে রয়েছে শ্যামের মৃত্যু কামনা এবং এই কামনা অবদমিত থাকার ফলে রাম সে বিষয়ে সচেতন নয়। এখন, এই মৃত্যু কামনাটা যদি কোনো কারণে অবদমনের বাধা অতিক্রম করে সজ্ঞানে বেরিয়ে আসতে পারে, তখন একটি মানসিক প্রক্রিয়া ওই মৃত্যু কামনার সঙ্গে যুক্ত আবেগকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে রামকে নিরুদ্বিগ্ন করে রাখবে। যে মানসিক প্রক্রিয়া এই বিচ্ছিন্ন করার কাজটি সম্পন্ন করছে, তাকেই বলা হয় স্বতন্ত্রীকরণ (isolation)। এতে লাভ হল এই যে, রামের চেতনায়

শ্যামের মৃত্যু কামনাটা থাকলে যে উদ্বেগজনক প্রতিক্রিয়া রামকে কষ্ট দিতে পারত—তা থেকে রাম রেহাই পেল।

২। বাতিল করা (undoing):

এক রোগী দরজাটা একবার খুলছে, আবার বন্ধ করছে। কিছুতেই সে ঘরে ঢুকতে পারছে না। দরজা খোলা হলেই তার মনে হচ্ছে—বাবা মারা গেল, তক্ষুনি সে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে মৃত্যু অস্বীকার করবার মানসে।

এসব ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষায় দেখা যায়, নির্জ্ঞানের বাবার মৃত্যু চিন্তাকে তো আর সজ্ঞানে স্বীকার করা সম্ভব নয়, অথচ সেই চিন্তাকে যখন অবদমন করে রাখাও সম্ভব হচ্ছে না, তখন দরজা খোলা এবং বন্ধ করার মত কমপালসিভ ক্রিয়া সৃষ্টি করে রোগীর অজ্ঞাতেই ওই পীড়াদায়ক চিন্তার মোকাবিলা করা হচ্ছে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকেই বলা হয় বাতিল করা (undoing)।

৩। একের স্থানে অন্যকে স্থাপন করা (Displacement):

এক রোগীর অনবরত মনে হচ্ছে—টুঁটি টিপে আছড়ে মেরে ফেলি বাড়ির পোষা বেড়ালটাকে। অথচ সে বেড়ালের টুঁটি খামচাতে যাচ্ছে না, আছাড়ও মারছে না। উল্টে প্রাণপণে মন থেকে এই চিন্তাটাকে তাড়াতে চাইছে।

মনঃসমীক্ষায় দেখা গেল—রোগীর নির্জ্ঞানে অবদমিত ছিল কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে আঘাত হানবার বৃত্তি—অবদমিত ছিল বলেই রোগী সচেতন ছিল না সে বিষয়ে। এ ধরনের বৃত্তিকে তো আর সজ্ঞানে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তাই বৃত্তিটা যখনি অবদমনের বাধাকে ঠেলে বাইরে আসতে চেয়েছে, তখনই একটা মানসিক প্রক্রিয়া রোগীর অজ্ঞাতেই আত্মীয়ের জায়গায় বেড়ালকে খাড়া করেছে এবং রোগীকে দারুণ উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু বাঁচতে যাওয়ার মূল্য হিসেবে মেনে নিতে হয়েছে অবসেসিভ চিন্তাটাকে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকেই বলা হয়, একের স্থানে অন্যকে স্থাপন করা (displacement)।

৪। বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা (Reaction formation):

মায়ের প্রতি মেয়ের ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তার নির্জ্ঞানে অবদমিত অবস্থায়। এই ঘৃণা যাতে সজ্ঞানে এসে মনে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি না করতে পারে, সেজন্যে মেয়ের মনে তার মায়ের প্রতি একটা অতিশয় ভক্তিপূর্ণ আচরণ তৈরি হয়ে গেল : এ আচরণকে সৃষ্টি করল কিন্তু একটা মানসিক প্রক্রিয়া। মেয়েটির অজ্ঞাতেই ঘটল এই প্রক্রিয়া।

এর ফলে কি লাভ হল মেয়েটির। মায়ের প্রতি মেয়ের ঘৃণাভাব মনে এসে মেয়েকে আর বিচলিত করে দিতে পারল না। বরং মায়ের প্রতি মেয়ের এই ভক্তিপূর্ণ আচরণের জন্যে উভয়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হল। এই মানসিক প্রক্রিয়াকেই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা (reaction formation) বলা হয়।

এই প্রক্রিয়ার প্রভাব অবসেসিভ-কমপালসিভ ব্যক্তিত্ব বিকারে খুবই দেখা যায়। কিন্তু অবসেসিভ-কমপালসিভ নিউরোসিসে এর প্রভাব ততটা দেখা যায় না।

এসব রোগীদের মধ্যে আচরণগত বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এদের রোগের লক্ষণ এবং এইসব আচরণগত বিশেষত্ব লক্ষ্য করলে দেখা যায় :

ক) এদের আচরণ এবং প্রকৃতি অত্যন্ত শিশুসুলভ।

খ) এরা ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী একই সঙ্গে মনে পোষণ করে, যেমন, ভালবাসা আর ঘৃণা।

গ) এদের আচরণে এবং কথায় হিংসাত্মক এবং আক্রমণাত্মক ভাব প্রবলভাবে দেখা যায়।

ঘ) এরা বিশ্বাস করে, কথা বা চিন্তার মধ্যে যেন জাদু আছে।৹ এরা মনে করে, যদি কেউ কোনো কথা মুখে বলে ফেলে বা মনে মনে তাই নিয়ে ভাবে—তবে তা অক্ষরে অক্ষরে ঘটে যাবে। যেমন, রাগ করে মা বললেন ছেলেকে—'মর তুই'। পর মুহূর্তেই চিন্তা ঢুকলো মায়ের মনে—কথাটা যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন তো ছেলে আমার মরবেই। ঠিক যেন ম্যাজিক—যেমনটা দেখা যায় পুরাণ বা মহাকাব্যে—অভিশাপ দিলে বা বর দিলে আটকায় কার সাধ্যি। অমঙ্গল কামনা করে কেউ যদি কারও দিকে তাকায়, তাহলে সে অমঙ্গল নির্ঘাৎ ঘটবে, এই ধরনের বিশ্বাসও থাকে এদের মধ্যে!

এই জাতীয় বিশ্বাস ছোট শিশুদের মধ্যে স্বাভাবিকভবেই দেখা যায়। আদিবাসীদের মধ্যেও থাকে। মানুষ যখন খুব বিপদে পড়ে পরিত্রাণের পথ পায় না—তখন তারা কথার জাদুতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অবসেসিভ-কমপালসিভ রোগীদের মধ্যেও এই ধরনের চিন্তাভাবনা দেখা যায়।

এই রোগের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা শৈশবে মনোবিকাশের একটি বিশেষ স্তরে গোলযোগের নির্দেশ করেছেন। ধাপে ধাপে শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের যে স্তরে শিশুর মলমূত্রের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে প্রবল আকর্ষণ থাকে, যে-সময়ে প্রথম ইচ্ছামত কাজ করতে পারার উপলব্ধি জন্মায়, যে-সময়ে শিশুর বিবেক (conscience) অত্যন্ত রূঢ় এবং কঠোর থাকে, যে-সময়ে আত্ম-নির্ভরতার প্রথম উন্মেষ হয়, যে-সময়ে সে ইচ্ছাকৃত মলমূত্র ত্যাগ অথবা বন্ধ করার শক্তি প্রথম অর্জন করে—ক্রমবিকাশের সেই স্তরের গোলযোগের প্রভাব এই রোগে খুবই দেখা যায়।

শিশুর ঠিক কোন্ বয়েসে বিকাশের এই ঘটনাগুলি ঘটবে, সেটা নির্দিষ্ট ভাবে বলা কঠিন, তবে এক থেকে তিন বছরের মধ্যে সচরাচর এটা ঘটে।

শিক্ষা বিষয়ক মূলনীতির (Learning Theory) সাহায্যে অবসেসিভ-কমপালসিভের লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা

একটি নিরপেক্ষ সঙ্কেত (neutral stimulus) যখন একটি উৎকণ্ঠা উদ্দীপক সঙ্কেত (anxiety provoking stimulus)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন নিরপেক্ষ সঙ্কেতটি উৎকণ্ঠা উদ্দীপন করার ক্ষমতা অর্জন করে। এই ভাবে অবসেসন লক্ষণ উদ্ভূত হতে পারে।

উৎকণ্ঠা উদ্দীপক অবসেসিভ চিন্তার প্রশমন ঘটাতে পারে এমন কোনো কাজ যখন রোগী আবিষ্কার করে, তখন ওই কাজটি বারবার ঘটিয়ে ঐ উৎকণ্ঠাকে প্রশমিত রাখবার চেষ্টা চলে। এর ফলে ঐ কাজটি অভ্যাসে পরিণত হয়। এইভাবে কমপালসিভ লক্ষণের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা বিষয়ক এই মূলনীতির সাহায্য নিয়ে এই রোগের কয়েকটা ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গেলেও সবক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা

করা হয়েছে—শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্ব এবং আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসার পরিচ্ছেদে।
চিকিৎসা :—অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ওষুধ প্রয়োগে এরোগে সুফল পাওয়া যায়, বিশেষ করে, যদি বিশেষ এই রোগের সঙ্গে বিষন্নতা রোগ যুক্ত থাকে।

মনোচিকিৎসা সময় সাপেক্ষ বটে, কিন্তু উপকার দেয় যথেষ্ট। আচরণপরিবর্তনকারী চিকিৎসা (behaviour therapy) প্রয়োগেও যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। মনোচিকিৎসার মতই একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এই চিকিৎসা প্রয়োগ করার পক্ষে যোগ্যতম ব্যক্তি।

নিউরোসিস সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু তথ্য

এ পর্যন্ত চার প্রকার নিউরোসিস—উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক, হিস্টিরিয়া এবং অবসেসিভ-কমপালসিভ নিউরোসিস এর আলোচনা করা হয়েছে। নিউরোটিক বিষণ্ণতা (neurotic depression)-র আলাদা ভাবে আলোচনা এখানে করা হয়নি কারণ আবেগের বিকার (affective disorder)-এর আলোচনার সময় সামগ্রিক ভাবে বিষণ্ণতা রোগের আলোচনা করা হয়েছে।

এক রকম নিউরোসিস দেখা যায় যেখানে রোগীর মনে হয় তার কঠিন শারীরিক ব্যাধি হয়েছে, যদিও ডাক্তারী পরীক্ষায় সেই সব ব্যাধির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। একে রোগ বাতিক বা হাইপোকন্ড্রিয়েসিস্ (hypochondriasis) বলা হয়। এর আলোচনা আতঙ্ক বা ফোবিয়ার সঙ্গে করা হয়েছে।

স্নায়বিক দুর্বলতা বা নিউরাস্থেনিক (neurosthenia) নামে একটি নিউরোসিস-এর কথা কখন কখন বলা হয়। এতে রোগীর শারীরিক দুর্বলতা, কাজে কর্মে অক্ষমতা, যৌন দুর্বলতা, দেহ ভার মনে হওয়া ইত্যাদি হয়। সাধারণ লোকে মনে করে অধিক কাজের চাপ, ভিটামিন অথবা পুষ্টির অভাবের ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হয়। উপযুক্ত ভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় এই সব ক্ষমতাগুলি বিষণ্ণতা রোগের লক্ষণ মাত্র, এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছু নাই।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়ে কোন ক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছে এমন অবস্থা ঘটার সময়ের উৎকণ্ঠা উদ্দীপক ঘটনাগুলি প্রায়ই কল্পনায় আসতে থাকে, এমন কি ঘুমের মধ্যে ঐ ঘটনাগুলি দুঃস্বপ্ন সৃষ্টি করে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। এ অবস্থায় কোন কোন সময় মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতেও দেখা যায়।

নিউরোসিসগুলির আলোচনার সময় প্রত্যেকটি নিউরোসিসকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হলেও বাস্তবিক পক্ষে রোগীদের দেখা যায় একজন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক নিউরোসিস, যেমন উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক এবং অবসেসিভ-কমপালসিভ নিউরোসিস-এ একই সঙ্গে ভুগছেন। আবার দীর্ঘদিন যাবৎ লক্ষ্য করলে এমনও দেখা যায় যে আজ যিনি হিস্টিরিয়াঅথবা উৎকণ্ঠায় ভুগছেন কিছুদিন পরে দেখা যাবে তাঁর উৎকণ্ঠা বা হিস্টিরিয়া আর নাই, তার জায়গায় বিষণ্ণতার আবির্ভাব ঘটেছে। নিউরোসিসগুলির মধ্যে এই ধরনের যোগসূত্রের কারণ আজও সঠিক ভাবে জানা যায়নি।

১০

আবেগের বিকার (Affective Disorder)

আবেগ মনের একটি বিশেষ কাজ। এই আবেগ বা অনুভূতিই আমাদের মনের ভাব নির্ধারণ করে যার ফলে আমাদের মনের সুখ-দুঃখ বুঝতে পারি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিপাকে পড়লে, দুর্ভাগ্যের শিকার হলে, মনে দুঃখ পাই ; আবার বরাত যখন ভাল হয়, প্রাপ্তিযোগ ঘটে, অনুকূল অবস্থায় যখন পড়ি—তখন আমাদের সুখের অনুভূতি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই রকমই ঘটে— দুঃখ বা সুখের অনুভূতির একটা কারণ থাকে। কিন্তু আবেগের বিকারে আক্রান্ত হলে বাস্তবে কোন কারণ ছাড়াই দুঃখ বা সুখের অনুভূতি হয়, এ এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা। আবেগের বিকারের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অকারণ সুখ বা দুঃখের অনুভূতি ; আর এই সুখ বা দুঃখকে কেন্দ্র করেই শরীর-মনের অন্যান্য লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

ঊর্মিলা দাশ, ৫০ বছর বয়স, গত ৪ মাস ঘুম নেই ; প্রথম রাতে ঘণ্টা দুই ঘুম হয়, তারপর ভেঙে যায়, আর ঘুম আসে না ; খিদে নেই, কিছুই ভাল লাগে না, মনে আনন্দ-ফুর্তি একেবারে নেই, সহজেই কান্না আসে, সিনেমা-টিভি-লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব করা কিছুই ভাল লাগে না, সব সময়েই একটা ক্লান্তির ভাব। সব কিছুতে বিরক্ত, শব্দ একেবারেই সহ্য হয় না। সকালের দিকটাই বেশি খারাপ লাগে। সব বিষয়েই দুশ্চিন্তা। সংসারের কাজকর্মে কোন আগ্রহ নেই। মাথাটা ভারি বোধ হয়—মনে করেন মাথার ভেতরটা যেন জট বেঁধে রয়েছে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন কেন এমন হল ? কোন অন্যায় বা পাপের শাস্তি কিনা দেখার চেষ্টা করেন, কিন্তু তেমন কিছুই খুঁজে পান না। শারীরিক কষ্ট, হতাশা, হতোদ্যম, মনের বিষণ্ণতা, সব মিলিয়ে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে—মনে হয় এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। এর চেয়ে মরতে পারলেই ভাল হয়। অশান্তি সহ্য করতে না পেরে মনে করেন যেখানে হোক চলে যাই ; একদিন ভোর তিনটের সময়ে বিছানা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারে—গঙ্গায় ঝাঁপ দেবেন কিনা এই ভাবনা নিয়ে যখন দোটানায় পড়েছেন—ঠিক সেই সময়ে বাড়ির লোকজন সেখানে পৌঁছে গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বাড়িতে।

ভদ্রমহিলার কোথাও কোন রকম অশান্তির কারণ নেই। এক ছেলে আর এক মেয়ে, দুজনেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিয়ে হয়ে গেছে তাদের। নাতি-নাতনির দিদিমা হয়েছেন ভদ্রমহিলা। ভাল ব্যবসা রয়েছে স্বামীর—শরীর স্বাস্থ্যও তাঁর ভাল। আর্থিক সামর্থ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—অভাব নেই কিছুরই, কিন্তু সব থেকেও মনে নেই শান্তি।

শ্রীমতী দাশের যা হয়েছে, তা হচ্ছে বিষণ্ণতা রোগ। এ রোগের ভাল চিকিৎসাও আছে— যা প্রয়োগ করলে সহজে ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায়।

প্রবীর সেনের বয়স ২২, পড়ছে এম এস-সি ; খুব মেধাবী ছাত্র। বরাবর অত্যন্ত ভাল ফল করেছে পরীক্ষায়। কিন্তু গত ২/৩ সপ্তাহ ধরে কথা বলছে বড্ড বেশি, ভাল ঘুমও হচ্ছে না রাত্রে। বড় বড় কথা বলছে, হাবভাবে বেশ পরিবর্তন এসেছে, মুখ দিয়ে অশ্লীল কথাবার্তাও বেরোচ্ছে, সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছে শ্রদ্ধেয় প্রফেসরদের সামনেই। লম্বা-চওড়া বুকনিগুলো এই রকম : তার নাকি আর পড়াশুনোর দরকার নেই, পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি এস সি ডিগ্রী দিয়ে দিয়েছে— খুব শিগ্‌গিরই তাকে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হবে ; গবেষণায় এমন জিনিস দেখিয়ে দেবে যা খণ্ডন করে ছাড়বে আগের সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদকে ! সারাদিন সে ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রতিদিন ট্যাক্সি ভাড়াই দিচ্ছে তিন-চারশো টাকা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এঁদের কাছে চিঠি লিখছে—সব চিঠির বয়ানেই ঘুরে ফিরে আসছে একটাই কথা : সমস্ত রকম সমস্যার সমাধানের পথ তার জানা আছে। ঘুম খুবই কমে গেছে। সে বলছে, ঘুমের তার তেমন দরকার নেই, ২/১ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট তার পক্ষে।

এ ছেলেটির যা হয়েছে, তা হচ্ছে ম্যানিয়া (mania)। এ রোগ চিকিৎসায় সেরে যায়, কিন্তু বারে বারে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের রোগীদের বিষণ্ণতা রোগ হবার সম্ভাবনাও থাকে।

অকারণ দুঃখের ভাবকে কেন্দ্র করে যে মনোবিকারের উদ্ভব হয়, তাকেই বলা হয় বিষণ্ণতা (depression or melancholia) :, আর অহেতুক খুশির ভাবকে কেন্দ্র করে যে মনোরোগ হয়, তাকে বলা হয় ম্যানিয়া (mania)।

এই বিষণ্ণতা অথবা ম্যানিয়া রোগে যারা ভোগে তারা চিকিৎসাতে সুস্থ তো হয়ই, এমন কি বিনা চিকিৎসাতেও কিছুদিন ভোগার পর আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়। তবে এ রোগ বারে বারে হবার প্রবণতা থাকে। কখনো কখনো দেখা যায়, কিছুদিন ম্যানিয়া আবার কিছুদিন বিষণ্ণতায় ভুগছে কোন কোন রোগী—এ রকম হলে সেই রোগকে বলা হয় আবর্তনশীল আবেগ বিকার (bipolar affective disorder)।

বিষণ্ণতা রোগের লক্ষণ

(১) বিমর্ষভাব—কিছুই ভাল লাগে না, মনে আনন্দ-ফুর্তির অভাব, সব সময়েই অকারণ দুঃখের ভাব, হীনমন্যতা, হতাশা, নৈরাশ্যবাদীতা, ভগ্নোৎসাহ, আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব, ইত্যাদি ভাবে এই রোগ প্রকাশ পায়। কোন কিছুতে আগ্রহ নেই—আহার, প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপ-গল্পগুজব করা, সিনেমা, টি ভি খেলাধুলো কিছুতেই সুখ নেই। রোগীর কথাবার্তায়, চলাফেরায়, সাজপোশাকে, মুখের ভাবভঙ্গীতে মনে অসুখী ভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়।

(২) শরীরে জড়তা, আলস্য, ক্লান্তির ভাব ; আর কাজকর্মে ধরা পড়ে মানুষটা ভেতরে ভেতরে ঠিক নেই ; একেই অনেক সময়ে বলা হয় স্নায়বিক দুর্বলতা। এ রকম অবস্থায় রোগীরা মনে করে— অধিক পরিশ্রম, রক্তাল্পতা অথবা ভিটামিনের অভাবের জন্যেই এমনটা হচ্ছে। কোনো কোনো সময়ে শারীরিক জড়তা এমন পর্যায়ে যায় যে রোগী একেবারে স্থির নির্বাক হয়ে গিয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয় যার ফলে একটা দুরূহ

অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

(৩) আহারে অনাগ্রহ এবং তার ফলে শরীর ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

(৪) ঘুমের অসুবিধে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কখনো ঘুম আসতে দেরি, কখনো প্রথম রাত্রে ২/৩ ঘণ্টা ঘুম হবার পর ভেঙে গিয়ে আর ঘুম না আসা, সারা রাতই ছাড়া ছাড়া ঘুম, বারে বারে দুঃস্বপ্নে আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়া, অথবা খুব ভোরে ঘুম ভেঙে অসম্ভব ক্লান্তি এবং ভারাক্রান্ত মনে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

কদাচিৎ কখনো অধিক ঘুমের ভাবও দেখা যায়।

(৫) নানা রকম শারীরিক ব্যথা-যন্ত্রণা এবং অস্বস্তি ; যেমন— ঘাড়ে-মাথায় যন্ত্রণা, মাথায় ভার বোধ, কোমরে ব্যথা, বুক জ্বালা-গলাজ্বালা-অম্বল ভাব, পেটে বায়ু, মুখে বিস্বাদ, গলায় কি যেন আটকে আছে এই রকম অনুভূতি, ক্ষীণদৃষ্টি, প্রস্রাবের অসুবিধে, সারা দেহে জ্বালা এবং গরম ভাব, ইত্যাদি প্রায়ই দেখা যায়। এরকম অবস্থায় রোগীর এবং ডাক্তারের নজর শরীরের দিকে এত বেশি চলে যায় এবং ব্যয়বহুল পরীক্ষানিরীক্ষা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, যার ফলে শুধু যে নিরর্থক সময় নষ্টই হয় তা নয়—সঠিক রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসারও দেরি হয়ে যায়।

কখনো কখনো অত্যন্ত অস্থির-চঞ্চল ভাব দেখা যায়। কিছুক্ষণের জন্যেও রোগী স্থির থাকতে পারে না, সেই সঙ্গে দেখা যায়, অস্থিরভাবে রোগী পায়চারি করছে এবং ঘন ঘন ধূমপান করছে।

(৬) যৌন বিষয়ে অনাগ্রহ এবং যৌন অক্ষমতা পুরুষদের ক্ষেত্রে হীনমন্যতা ভাবকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

(৭) অনুশোচনা এবং অন্যায় অপরাধ বোধ আর এক রকম লক্ষণ যা খুবই পীড়াদায়ক। বিষাদগ্রস্ত রোগী তার জীবনের ঘটনা থেকে বের করতে চেষ্টা করে—কোথায় কবে সে কি অন্যায় বা পাপ কাজ করেছে ; যেমন, শিক্ষক বের করতে চেষ্টা করে কোন ছাত্রদের কম নম্বর দেওয়ার জন্যে সেই ছাত্ররা কষ্ট পেয়েছে যার জন্যে সে নিজে দায়ী, পুলিশ চোরদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তাতে চোর এবং চোরদের পরিবারের কত কষ্ট হয়েছে যার জন্যে সে নিজে দায়ী, প্রশাসন কর্মী তার অধস্তন কর্মচারীর যথার্থ অপরাধে শাস্তি দেওয়ার জন্যে দীর্ঘদিন পর এখন তার বিমর্ষ অবস্থায় সে অনুতপ্ত হচ্ছে ; বিবাহিতা স্ত্রীলোক তার বিগত জীবনের ঘটনা থেকে বের করবার চেষ্টা করছে তার স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে কবে কোথায় মুহূর্তের জন্যেও ভাল লেগেছিল (যদিও কোনো অবৈধ অশোভন ঘটনাই ঘটেনি)— তাতেই তার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে এবং পাপ হয়েছে যার জন্যে এখন হচ্ছে অনুতাপ ; কেউ বের করছে কবে সে ঠাকুরের কাছে মানত করেছিল কিন্তু মানত অনুযায়ী পুজো দেয়নি যার ফলে পাপ হয়েছে ঠাকুরের কাছে, ইত্যাদি।

এই সব অন্যায় বোধ থেকে নিজের ওপর ঘৃণা তো হয়ই, কখনো কখনো এই রোগীদের এমনও হয় যে অন্য লোকেরাও ঘৃণা করছে তাদের—পাঁচজনের স্বাভাবিক চালচলনকেও মনে হয় যেন রোগীদের ওপর সেই ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ; যেমন, কেউ থুথু ফেললেও রোগী মনে করে এটা তার প্রতি ঘৃণার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৮) আত্মহত্যার কথা মনে হওয়া এবং সেদিকে ঝোঁক এইসব রোগীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। নিজেকে অতিশয় অকর্মণ্য অপদার্থ ব্যক্তি মনে হয়। সেই সঙ্গে হীনমন্যতা হতাশা, অসহায় নৈরাশ্য ভাব এমন ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে যে রোগী তার

জীবনের বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং মনে করে মৃত্যুই হচ্ছে তার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। প্রায়ই দেখা যায় রোগী তার অবস্থার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। আবার এমনও দেখা যায় যে গুরুতর বিমর্ষ অবস্থায় রোগী অনুভব করে যেন তার চোখের জলও শুকিয়ে গেছে, কাঁদতে পারছে না, এ যেন "অল্প দুঃখে কাতর—বেশী দুঃখে পাথর" অবস্থা।

(৯) বিষণ্ণ অবস্থায় রোগী কোন কিছুতে মনঃসংযোগ করতে পারে না—কিছু পড়া, কিছু শোনা বা দেখা কিছুতেই মন দিতে পারে না এবং সেই সঙ্গে অনেক সময় রোগীর মনে হয় সব যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিছুই মনে রাখতে পারছে না। বয়স্ক রোগীদের মধ্যে স্মরণশক্তি কমে যাওয়াটা বেশী দেখা যায়।

(১০) উৎকণ্ঠা, ভয়-ভীতি, নানা রকমের বিপদের আশঙ্কার কথা মনে হয় রোগীর। বাইরের জগৎ থেকে বিপদের সম্ভাবনার কথা ছাড়াও রোগীর মনে হয় কোন দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন— ক্যানসার, টিবি তাকে আক্রমণ করেছে।

এই সব নানা প্রকার মানসিক কষ্ট ছাড়া বিষণ্ণতা রোগে প্রবল উৎকণ্ঠা থাকে এবং সেই উৎকণ্ঠা জনিত শারীরিক লক্ষণ যেমন— বুক ধড়ফড়ানি, অধিক ঘাম, গলা শুকিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি তার কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

বিষণ্ণতা রোগের লক্ষণগুলি খুবই কষ্টদায়ক এবং ভয়াবহ এটা ঠিক, কিন্তু এটাও ঠিক যে এই রোগ নিরাময়ের উত্তম চিকিৎসাও আছে যা প্রয়োগ করলে এই রোগে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া সম্ভব।

ম্যানিয়ার লক্ষণ (Symptoms of Mania)

অকারণ খুশী, উৎফুল্ল এবং হামবড়া ভাব, অনাবশ্যক কর্মতৎপরতা, অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ঘর বোঝাই করা, অপরের ব্যাপারে নাক গলানর চেষ্টা, বাস্তব বুদ্ধিহীনতা, রাগ এবং সর্বদা একটা রণং দেহি ভাব, অনিদ্রা এবং ঘুমের প্রয়োজন বোধের অভাব—এইগুলি ম্যানিয়ার লক্ষণ হিসাবে প্রায়ই দেখা যায়।

এই রোগের প্রথম দিকে রোগী অনুভব করে যেন তার মধ্যে একটা অসাধারণ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে; সে হয়ে ওঠে অত্যন্ত আশাবাদী, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, মনে উৎফুল্ল ভাবের সঙ্গে আসে চিন্তার দ্রুতগতি। কথাবার্তা বেশী বলতে শুরু করে, এমনকি অপরিচিত লোককেও ডেকে কথা বলতে থাকে। নিজেকে মনে করে অসীম ক্ষমতার অধিকারী, তার পক্ষে অসম্ভব যেন কিছুই নাই— বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, দৈহিক শক্তিতে, সৌন্দর্যে সেই সর্ব প্রধান। কোন কোন রোগী এই অবস্থায় মনে করে তার যেন পুনর্জন্ম হয়েছে এবং এতদিনে তার নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা এসেছে। সব রকমের অনুভূতি এবং বোধশক্তি সে এমন তীব্রভাবে অনুভব করে যে তার মনে হয় সব জিনিসের অনেক গভীর পর্যন্ত সে উপলব্ধি করতে পারছে। একদিকে মনের উল্লাস, সেই সঙ্গে গভীর অনুভূতির ফলে রোগীর মনে হয় সারা বিশ্বের সঙ্গে তার চেতনা যেন একাত্ম হয়ে গেছে।

রোগীর মনের ফুর্তি-আনন্দের ভাব অন্য লোকদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে তার কথায়, তার হাসিতে অন্যদেরও হাসির উদ্রেক হয়।

কথাবার্তা বেশী জোরে এবং দ্রুতগতিতে বলতে থাকে সেজন্য একটা বিষয় কিছুটা

বলে শেষ করার আগেই সেটা ছেড়ে অন্য একটা বিষয় বলতে শুরু করে।

কথা বলা যেমন বাড়ে তেমনই কাজকর্মের তৎপরতা বেশ দেখা যায়, ঘোরা ফেরার মাত্রা বেড়ে যায় ; হঠাৎ হঠাৎ মাথায় আসে এখনই এখানে ওখানে যেতে হবে, তৎক্ষণাৎ সেটা করার জন্য ব্যগ্রতা হয়। কাজের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রয়োজন বোধের বিচার ততটা থাকে না।

ঘুমের মাত্রা কমে যায় এবং ঘুমের প্রয়োজন বোধও ততটা থাকে না। সামান্য ২/১ ঘণ্টা ঘুমের পরেই পূর্ণ উদ্যামে কাজের ইচ্ছা জাগে। এক ব্যবসায়ীকে চিনতাম যিনি ম্যানিয়া (mania) অবস্থায় রাত ১২টায় শুয়ে ৩টেয় উঠে পড়ে টেলিফোনে তার স্টোনোগ্রাফারকে ডেকে তুলতেন এবং নিজের গাড়ী পাঠিয়ে তাকে বাড়ীতে আনিয়ে রাত ১টায় কাজ শুরু করে দিতেন, কারো নিষেধ মানতেন না। প্রায়ই এমন দেখা যায় যে এই ধরনের রোগীরা রাত ৩টেয় উঠে চা তৈরী করে বাড়ীর সকলকে ঘুম থেকে উঠিয়ে চা খাওয়াতে চেষ্টা করছেন— এতে যে অন্যরা বিরক্ত হচ্ছেন তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই।

ক্ষিদে প্রায়ই বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় খাওয়ার আনন্দ, তবে অকারণ ব্যস্ততার জন্যে অনেক সময়ে খাওয়ার সময় এদের থাকে না।

জিনিসপত্র কেনা এবং খরচা করার ঝোঁক এক এক সময় এত বাড়ে যে সামর্থ্য এবং প্রয়োজনের বিচার না করেই জিনিস কেনা হয়। সাজ পোশাকের জৌলুস বাড়ে— স্থান, কাল, পাত্রের বিচার না করেই রঙ-বেরঙের পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়।

এ রোগে যৌন আগ্রহ বৃদ্ধি পায়— এমন দেখা যায় যে নিজের বিবাহিত জীবনের স্বার্থকে উপেক্ষা করে অবাস্তব প্রেমের দিকে অথবা যৌন আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করার দিকে এগিয়ে যায়— যার সামাজিক পরিণতি অতি বিষময় হতে পারে।

নিজেকে জাহির করার জন্যে দান খয়রাৎ, টাকা ধার দেওয়া (যেখান থেকে ফেরৎ পাওয়ার কোনো আশাই নেই), অথবা কোনো ব্যবসায়ে মোটা টাকার বিনিয়োগ যাতে লোকসান ছাড়া কিছুই হবে না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাজের পরিণাম বিচারের ক্ষমতা থাকে না। এর পরিণাম সহজেই অনুমান করা যায়। দীর্ঘদিন অবশ্য এই অবস্থা চলে না— এর পরেই আসে বিষণ্নতা ভাব যা ক্রমে দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন শুরু হয়ে যায় আত্মসমালোচনা, নিজের প্রতি ঘৃণা অপরাধ বোধ, অপদার্থতার ভাব, হতাশা, অসহায়ত্ব যা আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে।

এই রোগের উৎপত্তি খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বংশানুক্রম এই উভয়েরই প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। জীববিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব ওষুধ এই রোগ নিরাময় করে সেগুলি আমাদের শরীরের কতকগুলি নিউরো-কেমিক্যাল (Neuro-chemical) এবং হরমোন (hormone)-এর ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই কাজ করে।

মানব জীবনে আবেগ (affect)-এর অসীম প্রভাব। এই আবেগই হচ্ছে আমাদের সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূল উৎস। স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রেরণায় বাস্তব বিবেচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মানুষের সৃজনী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সাহায্য করে। কিন্তু এই শক্তি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে জীবনে নানা অশান্তির আবির্ভাব হয় ; ফলে সে কখনো অতিশয় আশাবাদী হয়ে ওঠে এবং নিজেকে অসীম শক্তির অধিকারী সর্বশক্তিমান

মনে করে, আবার কখনো অতিশয় নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নিজেকে অকর্মণ্য অসহায় মনে করে। এই আবেগই আমাদের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতাকে নির্ধারণ করে। রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখলে যেমন, পৃথিবী রঙীন মনে হয়, তেমনই আবেগের প্রকৃতিই (সুখ অথবা দুঃখ) আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে।

ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তির জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের অনেকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় এই আবেগ-বিকারের শিকার হয়েছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও দেখা গেছে, অধিক সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে আবেগের বিকারের প্রাদুর্ভাব সাধারণ জনগণের তুলনায় অনেক বেশি। এর থেকে এমন মনে করা যেতে পারে, সৃজনী প্রতিভা এবং কর্মের প্রেরণা যেন কোনভাবে আবেগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

নদীর প্রবল জলপ্রবাহকে যেমন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে প্লাবনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা হয়, সেই জলরাশি দিয়ে অনুর্বর ভূমিকে শস্য শ্যামল করার কাজে লাগানো হয়, অথবা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে প্রয়োগ করা হয়— ঠিক তেমনই আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন এই আবেগের গতি-প্রকৃতিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত রেখে মানুষের সৃজনী প্রতিভাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে, এবং আবেগের বিকার থেকে জীবনকে মুক্ত রাখা যাবে।

১১

সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)

লক্ষণগত কিছু কিছু মিল আছে এমন কয়েক রকমের গুরুতর কঠিন মানসিক ব্যাধিকে সমষ্টিগত ভাবে সিজোফ্রেনিয়া (schizophrenia) বলা হয়। এই অসুখে কতকগুলি বিশেষ বৈলক্ষণ্য রোগীর চিন্তা, (thought,) আবেগ (affect), প্রত্যক্ষ (perception), ইচ্ছা শক্তি (will) এবং আচার-আচরণ (behaviour)-এ প্রকাশ পায় এবং এতে রোগীর মানসিক ক্রিয়াগুলি ঐক্যহীন অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

বিমানের বয়স ২৩ বছর, কৃতিত্বের সঙ্গে বি ই পাশ করে এম ই-তে ভর্তি হয়েছে। প্রায় মাস ৬ হল সে আর কলেজ যাচ্ছে না, বাড়ী থেকে বেরুতে চায় না এবং তার ঘরের বাইরের দিকে জানালাগুলো সব সময় বন্ধ করে রাখে। চুল, দাড়ি, নখ কাটতে চায় না, স্নান করতে চায় না, অনেকবার বলতে বলতে তবে খায়। বাড়ীতে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। সব সময় একটা বই নিয়ে বসে থাকে, তার পাতাও ওলটায় না। কখন কখন আপন মনে হাসে এবং বিড় বিড় করে কি বকে ঠিক বোঝা যায় না—ঘরে কেউ ঢুকলে চুপ হয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করলে বলে—ও কিছু নয়। অনেক পীড়াপীড়িতে সে তার মার কাছে বলেছে যে চারদিকে লোকেরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, সে যা মনে ভাবছে, বাড়ীর ভেতর সে যা করছে, ঐ সব লোকেরা বুঝে নিয়ে তাকে নানা কথা বলছে এবং সে ঐ সব কথা শুনতে পাচ্ছে। তার ঐ সব ধারণা যে ঠিক নয় তা বোঝান হয়েছে, কিন্তু তাতে তার ঐ সব ধারণা কিছুমাত্র বদলায়নি।

সে বরাবর মোটামুটি মেধাবী ছাত্র ছিল, তবে শেষের দিকে পরীক্ষার ফল অত ভাল হচ্ছিল না। সে কোন দিনই খেলাধূলা করা অথবা সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা করা, এসব কিছুই করত না। কিছুদিন যাবৎ কথা কম বলছিল, এখন ত প্রায় কথাই বলে না।

বিমানের অবস্থা ভাল, ওর বাবা ইঞ্জিনিয়ার, ভাল কাজ করেন, মাও শিক্ষিতা। ওর এক দিদি আছে, ওর চেয়ে ৪ বছরের বড়, সে শিক্ষিতা, আর বিয়ে হয়ে গেছে এবং ভালই আছে।

বিমানের তেমন ভারী শারীরিক অসুখ বিশেষ কিছু কোনদিন হয়নি এবং তার সাধারণ স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই ছিল।

বিমানকে কিছুতেই বোঝান গেল না যে এটা তার অসুখ, এর চিকিৎসা দরকার। শেষে অনেক চেষ্টা করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল—পরীক্ষা করে দেখা গেলে সে সিজোফ্রেনিয়া রোগে ভুগছে।

এই রোগের সূচনা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিক্ষণে (adolescence) অথবা যৌবনের প্রারম্ভে। সাধারণত এই রোগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন লক্ষ্য করেন যে, রোগীর লেখাপড়ায় বা কাজকর্মে অবনতি ঘটছে, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দিচ্ছে, নিজের শরীর-স্বাস্থ্য এমনকি স্নান, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাকের দিকেও কোনো নজর নেই। এলোমেলো ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে। মানুষজন, এমন কি, অত্যন্ত আপন জনের প্রতিও দরদ, স্নেহ, মায়ামমতার বোধ কমে যাচ্ছে। মনে নানা ভ্রান্ত ধারণার উদয় হতে দেখা যাচ্ছে। যেখানে কাছাকাছি কোনো লোকই নেই—সেখানেও রোগীর মনে হচ্ছে, কেউ বা কারা যেন তার বিষয়ে কথা বলছে।

ক্রমে মনের মধ্যে এবং আচার-ব্যবহারে রোগের লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

চিন্তার বিষয়বস্তু (content of thinking)-গুলির দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, নানা রকম উদ্ভট ভ্রান্ত চিন্তায় তার মন ভরে গেছে। রোগীর মনে হয়, লোকে যেন তার বিরুদ্ধে শত্রুতা আর ষড়যন্ত্র করছে। লোকজনের স্বাভাবিক আচরণগুলোকেও মনে হয় তার নিজের বিরুদ্ধে ঘোর অভিসন্ধিমূলক। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, খবরের কাগজের মধ্যেও খুঁজে পায় নিজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। এতে রোগী বেশ বিচলিত বোধ করে। অনেক সময়ে রোগী মনে করে, সে যা কিছু চিন্তা করছে, তা মুখে না বললেও অন্য লোকে বেশ বুঝতে পারছে। কখনও আবার মনে হয়, চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার মাথার মধ্যে, অথবা চিন্তাকে বের করে নেওয়া হচ্ছে মাথা থেকে। কোন কোন সময়ে রোগীর মনে হয়, তার চিন্তা অনুভূতি এবং কাজকর্ম যেন বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে— তার নিজের ইচ্ছায় নয়।

যখন আমরা কথা বলি, মনের বক্তব্য কথাবার্তার মাধ্যমে প্রকাশ করি, অর্থাৎ, অন্যদের যা বোঝাতে চাই, কথায় সেটা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সিজোফ্রেনিক রোগীদের কথা শুনলে তাদের কথার ধরন (form) থেকে কি যে বলতে চায়, সেটাই বোঝা যায় না। যেন একটা অস্পষ্ট, অর্থহীন সংযোগ-সামঞ্জস্যহীন, দুর্বোধ্য কতকগুলি বাক্যের সমষ্টিমাত্র। চিন্তার দৈন্যের ফলে কথাবার্তাগুলোই ভাব প্রকাশের পক্ষে একেবারেই অযোগ্য বলে মনে হয়।

জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ (perceive) করি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা এবং ত্বক-এর সাহায্যে। ফলে, জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব এবং তার গুণাগুণ বুঝতে পারি।

সিজোফ্রেনিয়া রোগের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই প্রত্যক্ষের বিকৃতি। যে কোন ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেই এটা হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় শোনার ক্ষেত্রে ; যেমন, কোনো লোকই যেখানে নেই, সেখানে রোগী এক বা একাধিক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পায়— যেন তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, অথবা তাকেই কিছু বলছে। কোন কোন সময়ে রোগী যা ভাবছে কানেও তা শুনছে অথচ মুখে কিছুই বলছে না। কখনও বা যা ভাবছে বা যা শুনছে, তার সমালোচনাসহ ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছে— যেমনটি শোনা যায় রেডিও কিংবা টেলিভিশনে।

যদিও সিজোফ্রেনিয়া ব্যাধি প্রধানত চিন্তার রোগ (disorder of thinking) তাহলেও এই রোগে আবেগের বৈলক্ষণ্যও (disorder of affect) দেখা যায়। স্বাভাবিক সুখ দুঃখের প্রকাশ খুবই কমে যায়। সব বিষয়েই একটা উদাসীন অবিচল ভাব। সামঞ্জস্যহীন অসঙ্গত (incongruous) আবেগও দেখা যায়— যে অবস্থায় দুঃখের ভাব সঙ্গত, সেই

অবস্থায় হয়ত দেখা গেল সুখের ভাবের প্রকাশ ঘটছে— যেমন, ছেলের মৃত্যুসংবাদে হাসিতে ফেটে পড়ছে রোগী।

প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের ব্যক্তি সত্তার উপলব্ধি থাকে ; যেমন, সে কি করে ? সে কি ? তার সঙ্গে অন্যবস্তু বা ব্যক্তির যে পার্থক্য আছে— তা সে বুঝতে পারে। এই যে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতি (sense of self-identity), এই রোগে তা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়।

কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজের ইচ্ছা (volition) অনুসারে কাজ করার যে সাধারণ রীতি, সেটা এদের নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, আগ্রহ নিয়ে কোন কাজে লেগে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই রোগের একটা বিশেষ প্রকৃতি হচ্ছে যে, রোগী একটু একটু করে জাগতিক বস্তু এবং ব্যক্তি— এ সব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং নিজে একটা অলীক কাল্পনিক জগৎ বানিয়ে নিয়ে তার মধ্যে নিবিষ্ট থাকতে চায়।

আমূল পরিবর্তন হতে থাকে রোগীর আচার-আচরণে। অর্থহীন অঙ্গভঙ্গি, চলাফেরা, আপন মনে বিড় বিড় করে বকে যাওয়া এগুলো চোখে পড়ে প্রায়ই। দেখা যায়, জাগতিক পরিবর্তন এদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে না। কখনো কখনো দেখা যায়, শরীর তার নিশ্চল হয়ে গেছে, নির্বাক হয়ে রয়েছে (catatonic stupor) ; সেই একই ব্যক্তি আবার উদ্দেশ্যহীন উগ্র উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে— যার কারণ একেবারেই বোধগম্য নয়। স্নান, আহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, শরীরের সাধারণ যত্ন নেওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি রাখা, লজ্জা-সরমের জ্ঞান— একেবারেই উদাসীন হয়ে যায় এ সবের দিকে।

প্রায়ই দেখা যায়, কোনো দুরূহ অবস্থার মধ্যে পড়লে রোগ তীব্র আকার ধারণ করে। তখন রাগ-উত্তেজনা বাড়ে, ভ্রান্ত ধারণা (delusion) এবং অলীক কাল্পনিক কণ্ঠস্বর (auditory hallucination) শোনা বেড়ে যায়। রোগী অস্থির চঞ্চল হয়ে পড়ে।

এ রোগ হয় কেন

আজ পর্যন্ত এ রোগের কোনো নির্দিষ্ট কারণ আবিষ্কৃত হয়নি। অনুমান করে নেওয়া হয়, বংশগত প্রভাব কিছু আছে। শৈশবে পরিবারের এবং পারিপার্শ্বিক অস্বাভাবিক অবস্থার অভিজ্ঞতা এ রোগ হতে সাহায্য করে।

চিকিৎসা কি হবে

এত যে কঠিন ব্যাধি, সময়ে চিকিৎসা করালে তাও সারে। রোগীকে সুস্থ করে তুলে তার সমাজজীবনে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়। ওষুধ প্রয়োগ এবং সাইকো-সোস্যাল চিকিৎসাই প্রধান। সুফল পেতে হলে রোগের প্রাথমিক অবস্থাতেই এর চিকিৎসা শুরু করা দরকার। একবার দীর্ঘস্থায়ী (chronic) হয়ে গেলে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হওয়া কঠিন। এই রোগের চিকিৎসায় ফেনোথায়াজিন এবং বিউটিরোফেনোন শ্রেণীর ওষুধই বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

১২

ভ্রমবিকার

[Delusional (Paranoid) Disorder]

প্রশান্ত আর সবিতা নিজেরাই প্রেম করে বিয়ে করেছিল প্রায় বিশ বছর আগে। এখন ওদের বয়স চল্লিশের কোঠায়।

দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং দুজনেই চাকরি করে। ছেলেমেয়ে দুটি— তাদের স্বাস্থ্য ভাল এবং তারা লেখাপড়াতেও ভাল।

কিছুদিন আগে ওরা একটা ফ্ল্যাট কিনেছে, এখন সেখানেই থাকে। আর্থিক স্বচ্ছলতাও আছে।

সংসার সুখেই চলছিল— এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সবিতার মনে হল, প্রশান্ত তার আপিসের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে।

মনে হওয়াটাকে প্রথমে অতটা গুরুত্ব দেয়নি সবিতা নিজেই, কাউকে কিছু বলেওনি। কিন্তু একটু একটু করে ধারণাটা দৃঢ় হতে লাগল মনের মধ্যে, তারপর মনে হল, প্রশান্ত যেন আজকাল বড় দেরী করে বাড়ি ফিরছে, এমনও মনে হল, সে যেন তাকে আগের মত আর ভালবাসে না।

অছিলা করে একদিন গেল প্রশান্তর আপিসে। উদ্দেশ্য কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা। কিন্তু পাওয়া গেল না সেরকম কোন প্রমাণ। জানাশুনো দু-একজনকে জিজ্ঞেস করেও মিলল না কোন হদিশ।

একপর একদিন প্রশান্তকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল এইভাবে, "আজকাল আমাকে আর তোমার আগের মত ভাল লাগে না, তাই না ? অন্য কাউকে ভালবাসছ নাকি ? তোমাদের আপিসে কমলা বলে যে মেয়েটা আছে, তার সঙ্গে কিছু ঘটিয়ে বসে আছো মনে হচ্ছে !"

প্রশান্ত তো অবাক— "এ সব কি বলছ, সবিতা ? একি কখনও সম্ভব ? মন থেকে তাড়াও আজেবাজে সন্দেহ !"

খুবই লজ্জা পেল সবিতা নোংরা সন্দেহের কথা বলে স্বামীর মনে ব্যথা দেওয়ার জন্যে। ক্ষমাও চাইল।

কিন্তু তারপরই আবার সন্দেহটা ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মনের মধ্যে। যতই দিন যায়, ততই বাড়তে থাকে কুচিন্তা।

তারপর একটা স্থির নিশ্চয় ধারণা মৌরুসী পাট্টা গেড়ে বসে গেল সবিতার মনের

মধ্যে।

ধারণাটা এই : প্রশান্ত আর কমলার মধ্যে অবশ্যই একটা অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এই নিয়েই কথাকাটাকাটি শুরু হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। রোজই ঝগড়া হচ্ছে : কোন কোন দিন হাতাহাতিও হয়ে যাচ্ছে। একে অন্যের গায় হাত তুলছে ঝগড়া তুঙ্গে পৌঁছোলেই।

শেষকালে এমন হল, ছেলেমেয়েরাও জেনে গেল কদর্য বিষয়টা। মা-কে অনেক বোঝালো ভাইবোনে— "ভুল ধারণা, মা এক্কেবারে অবান্তর ধারণাকে মাথায় ঠাঁই দিয়েছো।"

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা ! বোঝালেও তো বোঝে না সবিতা। তার বাপের বাড়ির লোকেরাও শুনেছে এই জঘন্য সন্দেহের বৃত্তান্ত। বুঝিয়েছে সবিতাকে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। তিলমাত্র পাল্টায়নি বদ্ধ ধারণাটা।

অফিসেও হুঁশিয়ার হয়েছে প্রশান্ত। মিথ্যে সন্দেহ যাতে আর অযথা ইন্ধন না পায়, তাই নিজের কাজের জায়গাটা কমলার কাজের জায়গা থেকে একটু তফাতে করে নিয়েছে, এমন জায়গায় সে এখন বসছে যেখান থেকে কমলার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা খুবই কম।

কিন্তু এত করেও সবিতার ভুল ধারণা ভাঙা গেল না। স্বামীকে আর সে আগের মত বিশ্বাস করতে পারে না। তাইবলে যে তার অন্যান্য ব্যবহারে আর কাজকর্মে পরিবর্তন এসেছে, তাও নয়। কোথাও বিশেষ কোনো ত্রুটি নেই। অফিসের কাজ, বাড়ির কাজ— সবই ঠিকঠাক করে চলেছে। ছেলেমেয়েদের ওপর স্নেহ ভালবাসাতেও নেই কোনো ঘাটতি— অভাব দেখা দিয়েছে কেবল দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তিতে। সবিতা নিজেও হারিয়েছে তার মনের শান্তি।

উদ্ভট এই ভাবনা সম্বন্ধে সবিতার নিজের ধারণা কি? মনের রোগ বলে মনে করে কি?

মোটেই না। একেবারেই তা স্বীকার করে না সবিতা। উল্টে সে মনে করে, এটা তার স্বামীর যৌন-বিকার। মেয়েদের পেছনে ছোটার রোগ।

বাস্তবিক মনস্তাত্ত্বিক বিচারে অবশ্য দেখা যাচ্ছে সবিতার মনোবিকারের ফলেই এই রকমটা হচ্ছে এবং একেই বলা হয় ভ্রমবিকার (Delusional disorder)।

এ রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, রোগীর মনে কিছু ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় ; যেগুলি এমনই বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে সহজে তাদের মন থেকে সরানো যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর ধারণা হয় যে, কেউ তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ অন্য জনের চরিত্রে সন্দেহ করছে।

এ ধরনের ভুল ধারণা অবশ্য থাকতে পারে অনেক রকম মানসিক ব্যাধিতে। যেমন দেখা যায় সিজোফ্রেনিয়া (schizophrenia), আবেগ বিকার (affective disorder) অথবা শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধিতে। কিন্তু ভ্রমবিকারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে ভ্রান্ত ধারণাটাই প্রধান। অন্য কোনো লক্ষণ বেশি কিছু থাকে না।

ভ্রম বিকারের রোগীরা তাদের ভ্রান্ত ধারণার বশে অনেক সময়ে মারাত্মক কাজ করে বসে ; যেমন, একজন রোগীর ধারণা ছিল তার বড়ভাই তাকে মারবার ষড়যন্ত্র করছে। এই ধারণা-তাড়িত হয়ে একদিন সে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে বসল দাদার মাথায়—পেছন

দিক থেকে। এক ঘায়েই তৎক্ষণাৎ মারা গেল দাদা। আর একজনের ভ্রান্ত ধারণা ছিল অমুক ব্যক্তি নিশ্চয় তার স্ত্রীর উপপতি। তক্কে তক্কে থেকে একদিন সে ধারালো দা দিয়ে পেছন দিক থেকে প্রচণ্ড কোপ মারল বিশেষ সেই ব্যক্তির মাথায়। ভাগ্যিস তার আর্তনাদ শুনে লোকজন এসে ধরে ফেলেছিল দা-হাতে ভ্রান্ত ধারণার রোগীটিকে— নইলে মারাত্মকভাবে জখম মানুষটা মরেই যেত। হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করে বেঁচে গেল সে যাত্রা। এই ধরনের রোগীরা তাদের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে নির্দোষ লোকের বিরুদ্ধে আদালতে বা অন্য কোনো সংস্থায় নালিশ ঠুকে দিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে।

এই সব রোগীদের ভ্রান্ত ধারণার রকম অনুসারে তাদের আচার-আচরণও ভিন্ন হয়। প্রেমমূলক ভ্রান্ত ধারণা হলে রোগী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রেম আছে। এক মাঝ বয়েসী বিবাহিতা মহিলাকে জানতাম যাঁর ধারণা ছিল— এক দেশের রাজার সঙ্গে তাঁর গভীর ভালোবাসা আছে। বিষয়টা নিয়ে কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিশদ আলোচনা করতে গেলেই তিনি বলতেন— ওটা আমাদের একান্ত গোপনীয় ব্যাপার— বাইরে জানাতে চাই না।

আড়ম্বরমূলক ভ্রমবিকার (megalomania)-এর রোগীদের মধ্যে হামবড়া ভাব দেখা যায়। নিজেদের হোমরা চোমরা অথবা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। কেউ মনে করে— 'আমি সর্বশক্তিমান। সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে জন্মেছি'। বিখ্যাত শিল্পী, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, কবি, দার্শনিক ইত্যাদি নিয়েও ভুল ধারণা হতে পারে।

সন্দিগ্ধবাই (delusion of jealousy)-এর কথা প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে। এটা যে দাম্পত্য জীবনকে কিভাবে বিষিয়ে তুলতে পারে, সেটাও আমরা দেখেছি।

নিগ্রহমূলক ভ্রান্ত ধারণা (delusion of persecution) ভ্রমবিকারেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এই ধারণা জন্মালে রোগীদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এসে যায় যে তারা নানারকম শত্রুতা ষড়যন্ত্রের শিকার। লোকের সহজ সাধারণ আচরণের মধ্যে তারা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পায় এবং এই অলীক ধারণার বশে লোকের সঙ্গে নিরর্থক ঝগড়াঝাঁটিও হয়। এদের মধ্যে রাগ আর আক্রমণাত্মক ভাব প্রায়ই দেখা যায়। যেমন মনে করুন, কোথাও দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা চলছে। রোগী তা লক্ষ্য করে মনে করে, তাকে কেন্দ্র করেই শলাপরামর্শ চলছে দুজনের মধ্যে।

বয়স্ক লোকদের মধ্যে কিছু লোককে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বদ্ধমূল ধারণায় একটানা ভুগে চলেছেন। যেমন, মাধব সেন নামে এক ভদ্রলোককে জানতাম যাঁর মনে শেষ বয়েসে ভুল ধারণা জন্মেছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ঘিরে, তারা নাকি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আত্মীয়রা অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে তাঁকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষী রেখে লিখেও দিয়েছে যে তাঁর কোনো সম্পত্তিই খোয়া যাবে না। কিন্তু কিছুতেই বদলানো যায়নি তাঁর বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাসকে।

একরকম ভ্রমবিকার আছে যেখানে রোগীর দেহরোগমূলক ভ্রান্ত ধারণা (somatic delusion) জন্মায়। এসব ক্ষেত্রে রোগীদের মনে অবাস্তব ভুল ধারণা শেকড় গেড়ে বসে যায় যে, শরীরে নিশ্চয় কঠিন দুরারোগ্য রোগ বাসা বেঁধেছে।

যেমন, সমীরবাবু। লিভারে ক্যানসার হয়েছে, এই ধারণা মনের মধ্যে পুষে আসছেন দশ বছর ধরে। ডাক্তারী শাস্ত্রে যত রকম পরীক্ষা জানা আছে, সবগুলোই করা হয়েছে তাঁর ক্ষেত্রে। ক্যানসার রোগের কোনো প্রমাণই পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাতেও তাঁর

বিশ্বাস পাল্টায়নি। তবে তাঁর কাজকর্ম আর রোজকার জীবনযাত্রায় নেই কোনো ত্রুটি— ছন্দপতন ঘটেনি কোথাও— সবই চালিয়ে যাচ্ছেন সঠিকভাবে, লিভারে ক্যানসার হয়েছে— অলীক এই বিশ্বাসটাই কেবল যায়নি মাথা থেকে !

যত রকমের ভ্রম বিকারের কথা বলা হল এখানে, এসব ছাড়াও আছে আরও কিছু রকমের ভ্রমবিকার। এর মধ্যে শুধু এক রকমের কথা বলেই শেষ করব।

সঙ্গদোষ জনিত ভ্রমবিকার (Shared Delusional Disorder)

এতে দেখা যায় ভ্রান্ত ধারণা আছে এমন রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একজন সুস্থ ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে, তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন দেখা যাবে যে, ওই সুস্থ ব্যক্তিও এই ভুল ধারণাকে বাস্তব সত্য বলে মনে করে নিয়েছে। এমনটা ঘটলে কোন্ জন যে প্রাথমিক রোগী তা বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। রোগের সূচনার ইতিহাস সঠিকভাবে জানা গেলে তা বোঝা অবশ্য সহজ হয়— কিন্তু সব সময়ে তা পাওয়া যায় না। এদের দুজনকে যদি আলাদা করে রাখা যায় তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে, সঙ্গদোষের ফলে ভুল ধারণাটা জন্মেছিল যে ব্যক্তির মধ্যে তার মধ্যে এ ভুল ধারণা আর থাকবে না। কিন্তু ধারণাটা দৃঢ়ভাবে থেকেই যাবে আসল যে রোগী তার মনের মধ্যে।

অমূল্য দাস কাজ করতেন একটা বড় কোম্পানীতে। কোম্পানীর লোকেরা তাঁকে প্রাণে মারবার চেষ্টা করছে এ রকম একটা ভুল ধারণা ঢুকে বসল তাঁর মাথায়। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসে রইলেন বাড়িতে। এই সময়ে স্ত্রী-কে রোজ বলতেন তাঁর বিরুদ্ধে অফিসের লোকজনের ষড়যন্ত্রের কথা এবং বোঝাতেন। আশপাশের লোকজনের গতিবিধি দেখিয়ে দেখিয়ে বলতেন, কিভাবে ওই ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও লেগে রয়েছে তাঁর পেছনে ?

প্রায় এক বছর এইভাবে বাড়িতে বসে থাকার পর অবস্থা বুঝে ওঁর আত্মীয় স্বজনরা ওঁকে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্যে। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেল ভদ্রলোকের ভুল ধারণাটা যেমন বদ্ধমূল, ওঁর স্ত্রী-ও একই ভুল ধারণায় প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাসী। অবশ্য স্বামীকেই স্বতন্ত্র জায়গায় রাখা হল চিকিৎসার জন্যে। তিন চার সপ্তাহ আলাদা থাকবার পর ভুল ধারণাটা চলে গেল স্ত্রীর মন থেকে। স্বামীর ধারণাটা চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নির্মূল হতে লেগেছিল প্রায় তিন মাস।

স্বামী-স্ত্রী, ভাই-ভাই, ভাই-বোন, মা-ছেলে, ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে ভুল ধারণা একের থেকে অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে।

ভ্রম-বিকারের কারণ কি

নির্দিষ্ট কারণ সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি।

এই রোগের চিকিৎসা কি

ধৈর্য নিয়ে চিকিৎসা করলে ওষুধ প্রয়োগ এবং মনোচিকিৎসায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

১৩

শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধি
(Organic Mental Disorder)

শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধিগুলোকে মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) সামগ্রিক মানসিক ক্রিয়ার গোলযোগ (Generalized psychological impairment)

এখানে আমরা দেখতে পাই প্রায় সমস্ত মানসিক ক্রিয়াগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ধরনের মানসিক বিকারগুলিকে আবার তাদের স্থায়ীত্ব অনুসারে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

ক)তীব্র, স্বল্পদিন স্থায়ী শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধি (acute organic psychiatric disorder)। এরই নাম প্রলাপ (delirium)।

খ) দীর্ঘস্থায়ী শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধি (chronic organic psychiatric disorder)। এগুলিকে বলা হয় চিত্তভ্রংশ (dementia)।

(২) সীমিতভাবে বিশেষ কোন মানসিক ক্রিয়ার গোলযোগ

(Specific psychological impairment): যে মানসিক ক্রিয়া বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, সেই অনুসারে এগুলিকে পুনরায় পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়—

ক) স্মৃতির গোলযোগ (memory impairment), যাকে শরীরভিত্তিক স্মৃতিভ্রংশ (amnestic syndrome) বলা হয়।

খ) চিন্তার বা জ্ঞানের গোলযোগ ((cognitive impairment)-কে শরীরভিত্তিক ভ্রম বিকার (organic delusional syndrome) বলা হয়।

গ) প্রত্যক্ষের গোলযোগ (perceptual impairment)—যাকে শরীরভিত্তিক অমূল প্রত্যক্ষণ (organic hallucinosis) বলা হয়।

ঘ) আবেগের গোলযোগ (affective impairment)— যাকে শরীরভিত্তিক আবেগ বিকার (organic affective syndrome) বলা হয়।

ঙ) ব্যক্তিত্বের গোলযোগ (personality impairment), যাকে শরীরভিত্তিক ব্যক্তিত্বের বিকার (organic personality syndrome) বলা হয়।

এবার শরীরভিত্তিক মানসিক ব্যাধিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক।

১. ক) প্রলাপ (Delirium)

প্রলাপের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি হচ্ছে :

(১) চেতনা বা জ্ঞান (consciousness) পুরো নষ্ট হয় না ; কিন্তু ক্ষীণ হয়ে যায়—

যার ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পুরো উপলব্ধি করতে পারে না— রোগী একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে থাকে এবং এই অবস্থাটা রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

(২) মনঃসংযোগের অভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপলব্ধি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, চিন্তাশক্তি এবং স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার ফলে, এই অবস্থায় রোগী যা শোনে বা যা দেখে, সুস্থ হয়ে গেলে সে সবের কিছুই মনে থাকে না।

(৩) এ অবস্থায় রোগী কখনো শান্ত হয়ে থাকে, আবার কখনো অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। নানা রকম ভ্রমাত্মক অভিজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, রাগ প্রায়ই দেখা যায়। যে সব ঘটনার কোন অস্তিত্ব নেই, তাকে বাস্তব মনে করতে পারে। ভ্রমাত্মক চিন্তা (delusion) এবং দৃষ্টির ভ্রম (visual hallucination) খুবই দেখা যায়।

(৪) স্থান, কাল, পাত্রের জ্ঞান লোপ পায়।

(৫) অনিদ্রা, উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা এবং বিহ্বল ভাব প্রায়ই থাকে এবং জটিলতা বৃদ্ধি করে।

(৬) এই রোগ অবস্থার কোন ঘটনাই রোগী পরে আর মনে করতে পারে না।

(৭) বিচারবুদ্ধি এই সময়ে কোন কাজ করে না।

প্রলাপের কারণ কি

(১) ওষুধের বিষক্রিয়া।

(২) সুরাপানে অথবা ড্রাগে আসক্ত ব্যক্তির সুরাপান অথবা ড্রাগ নেওয়া হঠাৎ বন্ধ করে দিলে এমন হতে পারে।

(৩) শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের বিকারের ফলে (যেমন কিডনি, লিভার, ফুসফুসের ক্রিয়া বিকল হলে) শরীরে নানা বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

(৪) সংক্রামক ব্যাধি যেমন টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদির ফলে হতে পারে।

(৫) মস্তিষ্কের বিকার যেমন এনকেফালাইটিস, মস্তিষ্কে আঘাত, এপিলেপ্‌সির স্ট্যাটাস, এপিলেপসিরফিটের অব্যবহিত পরে, কখনো কখনো তীব্র অপুষ্টির ফলে এই অবস্থা দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

যে সব শারীরিক রোগের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেগুলির যথাযথা চিকিৎসা করা এবং উত্তেজনা থাকলে তাকে শান্ত করার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

এই রোগের শুশ্রূষা করার জন্যে বিশেষ পরিবেশ দরকার।

এ রোগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না— হয় দ্রুত আরোগ্য হবে, অথবা মৃত্যু ঘটবে, অথবা শরীরভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ব্যাধির দিকে এগিয়ে যাবে।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, খুবই মদ্যপায়ী ছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। কোন কারণে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তার মদ্যপান। ফলে, ৪/৫ দিন পরে দেখা গেল দিনরাতে একটুও ঘুম নেই, অত্যন্ত চঞ্চল, ভীতত্রস্ত ভাব, আহারে অরুচি, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না,

অহেতুক সকলকে শত্রু মনে করছে। নানা ভ্রমাত্মক অভিজ্ঞতা হচ্ছে— যেখানে কিছু নেই— সেখানে সে দেখছে হিংস্র জীবজন্তু আর মানুষ— যেন তাকেই হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। শরীর কাঁপছে, গলার স্বর কাঁপছে, সারাদেহে ঘাম জব জব করছে— নিজেকে আক্রান্ত মনে করে বাঁচার জন্যে পাল্টা আক্রমণ হানবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছে, এ রোগী প্রলাপের রোগী।

১·খ) চিত্তভ্রংশ (Dementia)

এ রোগের প্রধান লক্ষণগুলি এই :

(১) ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন— অসামাজিক, অশ্লীল আচার-আচরণ যা রোগীর আগেকার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

(২) চিন্তার গতি ধীর হয় এবং ভাব (idea) এর দৈন্য দেখা যায়। বিচারবুদ্ধি কমে যায় এবং মনে নানা রকম ভুল ধারণা বাসা বাঁধে। কথাবার্তায় অসংলগ্নতা এবং উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়।

(৩) প্রথমদিকে উৎকণ্ঠা, বিরক্তি, বিষণ্ণতা দেখা গেলেও ক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি ঔদাসীন্য আসে।

(৪) স্মৃতিশক্তি প্রথম থেকেই কমতে থাকে এবং নতুন করে কিছু শেখা সম্ভব হয় না। প্রথমত ইদানীংকালের অভিজ্ঞতার কথাই বেশি ভুল হয়, ক্রমে অনেকদিন আগের জানা জিনিসও ভুল হয়ে যেতে থাকে, পরিচিত লোককেও চিনতে ভুল হয়।

(৫) বিচার বিবেচনার শক্তি কমে যেতে থাকে এবং রোগীর নিজের অসুস্থতা সম্বন্ধে কোন বোধই থাকে না।

(৬) শেষে এমন হয় যে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে রোগীর কোন জ্ঞানই থাকে না। প্রস্রাব-পায়খানার স্থানের বিচার বোধ থাকে না এবং বাক্‌শক্তি একেবারেই লোপ পায়— দেহে জীবনের স্পন্দন থাকলেও মনুষ্যত্বের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

চিত্তভ্রংশের কারণ

কারণগুলি এখানে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের গঠনের বিকৃতি অথবা ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটায়। মস্তিষ্কের ওপর আঘাত, মাথার ভেতর টিউমার, প্রদাহ, রক্তবহা শিরায় দোষ, মস্তিষ্কের অবক্ষয় (degeneration), ওষুধ অথবা অন্য কোন বিষাক্ত বস্তুর বিষক্রিয়ার ফলে চিত্তভ্রংশ দেখা দিতে পারে। রক্তাল্পতা, দীর্ঘদিনব্যাপী অক্সিজেনের অভাব, কিডনি, যকৃত (liver), ফুসফুসের অথবা কোন এন্ডোক্রিন গ্রন্থির ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিয়ে চিত্তভ্রংশ ঘটাতে পারে। দীর্ঘদিন যাবৎ ভিটামিন বি$_{১২}$ (B$_{12}$),ফলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন বি$_{৬}$ (B$_6$)-এর অভাবও এর কারণ হতে পারে। একই কারণ যা সহসা ঘটার জন্যে প্রলাপ দেখা দেয়, সেই কারণ কম মাত্রায় দীর্ঘদিন চলতে থাকলে চিত্তভ্রংশ ঘটতে পারে।

চিত্তভ্রংশের চিকিৎসা

মস্তিষ্কের স্থায়ী পরিবর্তন হয়ে গেলে তাকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। তবে এমন কিছু কারণ পাওয়া যায় যেগুলিকে প্রথমেই নির্ণয় করতে পারলে

চিত্তভ্রংশ থেকে রোগীকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। যেমন, ভিটামিন অথবা হরমোনের অভাব, মাথার ভেতরের টিউমার যা সহজেই শল্য চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় করে দেওয়া যায়, অথবা কোন সংক্রামক ব্যাধি— যেমন নিউরোসিফিলিস যা অনায়াসে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োগে সারিয়ে দেওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে দ্রুত রোগ নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। বিষণ্নতা (depression) রোগে কোন কোন সময় স্মৃতির দোষ এমন প্রকটভাবে দেখা যায় যে এর সঙ্গে চিত্তভ্রংশের তফাৎ করা মুস্কিল হয়। কিন্তু বিষণ্নতা এমনই একটা অসুখ যা ওষুধ প্রয়োগে সম্পূর্ণভাবে সারিয়ে দেওয়া যায়— সেই কারণে এক্ষেত্রেও দ্রুত রোগ নির্ণয় করা এবং অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

শরৎচন্দ্র রায়ের বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। কিছুদিন ধরে তাঁর খুবই ভুলভাল হচ্ছে। এখুনি যা ঘটছে, একটু পরেই তা ভুলে যাচ্ছেন। কিন্তু পুরোনো কথা সবই ঠিকঠাক মনে আছে। ইনি ব্যবসায়ী, আজকাল এমন ভুলও করছেন যে, যার কাছে টাকা পাওনা নেই তার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাচ্ছেন : আবার যে পাওনাদারের টাকা শোধ করে দেওয়া হয়েছে তাকে ফের টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। লোকজনকে ঠিকমত চিনতে পারছেন না, খেয়ে উঠেই আবার খেতে চাইছেন— একটু আগেই যে খেয়েছেন তা ভুলে গেছেন। একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে আর বাড়ি চিনে ফিরতে পারছিলেন না। অন্যান্য পরিবর্তনও হয়েছে। যেমন, সামান্য যোগ বিয়োগ করতে পারছেন না, মনের আবেগের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, হাসলেন এখুনি, কেঁদে ফেলছেন পরক্ষণেই, লজ্জা সরমের জ্ঞান কমে গেছে।

সহজেই অনুমান করা যায় যে ইনি **চিত্তভ্রংশ** রোগে ভুগছেন।

২.ক) স্মৃতিভ্রংশ (Amnestic Syndrome)

উপস্থিত ঘটনাকে কিছুতেই মনে ধরে রাখতে না পারাই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। অনেকদিন আগে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা রোগীদের মোটামুটি ঠিকই মনে থাকে। স্থান, কাল, পাত্রের জ্ঞান প্রায়ই কমে যায়— বিশেষ করে সময়ের জ্ঞানই বেশি নষ্ট হয়। কিছুক্ষণ আগের ঘটনা বেমালুম ভুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জিনিস ঘটে : যা ভুলে গেছে এবং একটু আগেই যা ঘটেছে— সেই কথা জিজ্ঞেস করলে বানিয়ে বানিয়ে অন্য কথা বলে দেয় এমনভাবে যেন বানিয়ে বলার ঘটনাটাই আসলে ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, রোগীকে সকাল ১০টায় জিজ্ঞেস করা হল— কি খেয়েছেন বলুন তো একটু আগেই সকাল ৮টায় ? কি খেয়েছেন সকাল ৮টায়, রোগীর তা একেবারেই মনে নেই—কিন্তু অবলীলাক্রমে জবাব দিয়ে গেলেন একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে— সে ফিরিস্তিতে এমন সব খাবার আছে, যার কোনটাই তিনি সেদিন খাননি। এঁরা প্রায়ই কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের ঘটনার তফাৎ করতে পারেন না। সহজেই একটা আজগুবি বিবরণকেও বাস্তবিক ঘটনা বলে মেনে নেয়।

একজন রোগীকে দেওয়া হল একটা সাদা কাগজ। কিছুই লেখা নেই সে কাগজে। মুখে কিন্তু বলা হল— "এই তোমার ছেলের চিঠি"। সঙ্গে সঙ্গে গড়গড় করে সাদা কাগজখানাই চোখের সামনে তুলে ধরে এমন একখানা মনগড়া চিঠির বয়ান পড়ে গেল রোগী, যার বিন্দুবিসর্গ লেখা নেই কাগজে। শুনে মনে হল যেন সত্যিই তার ছেলের চিঠি পড়ছে।

এ রোগের কারণ প্রলাপ (delirium) আর চিত্তভ্রংশের মতই। রোগের প্রকোপে

মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেমের মধ্যে কতকগুলি জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের গঠনের বিকৃতি ঘটাতে পারে এমন মস্তিষ্কের রোগ, অথবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গের অসুখ যা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে—এইগুলিই চিত্তভ্রংশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে, ক্ষতিকারক কারণগুলি প্রলাপের ক্ষেত্রের চেয়েও ধীর গতিতে ঘটে এবং চিত্তভ্রংশের ক্ষেত্রের চেয়েও দ্রুতগতিতে ঘটে।

স্মৃতিভ্রংশের চিকিৎসা : যে কারণে এমনটা হচ্ছে, দ্রুত তা নির্ণয় করে নিয়ে সম্ভব ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হয়।

২-খ) শরীরভিত্তিক অমূল প্রত্যক্ষ[১] (Organic Hallucinosis)

এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এই রকম :

(১) অনবরত অথবা পুনঃ পুনঃ অমূল প্রত্যক্ষণ (hallucination)-ই হচ্ছে প্রধানতম লক্ষণ।

(২) পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা এর নির্দিষ্ট শরীরভিত্তিক কারণ বের করা সম্ভব।

(৩) অন্য কোন মানসিক রোগ থাকবে না।

২-গ) শরীরভিত্তিক ভ্রমবিকার (Organic Delusional Syndrome)

এ রোগের লক্ষণ এই :

(১) সুস্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণাই এর প্রধানতম লক্ষণ।

(২) পরীক্ষানিরীক্ষায় এর শরীরভিত্তিক কারণ বোঝা যায়।

(৩) এতে প্রলাপের মত চেতনার আচ্ছন্নভাব থাকে না ; চিত্তভ্রংশের মত বুদ্ধিনাশ এতে হয় না ; শরীরভিত্তিক আবেগবিকারের মত আবেগের বিকৃতি দেখা যায় না। তেমন উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষের বিকার কিছুই দেখা যায় না।

২-ঘ) শরীরভিত্তিক আবেগবিকার (Organic Affective Syndrome)

এর প্রধান লক্ষণগুলো এই রকম :

ম্যানিয়া অথবা বিষণ্ণতার লক্ষণ দেখা যাবে এবং সেইসঙ্গে এটা যে শরীরভিত্তিক কারণে হচ্ছে—তাও পরীক্ষায় বোঝা যাবে।

২-ঙ) শরীরভিত্তিক ব্যক্তিত্বের বিকার (Organic Personality Syndrome)

এর লক্ষণ হচ্ছে :

(১) আবেগের অস্থিরতা (instability of mood)। কখনো বিমর্ষ, কখনো বিরক্ত, কখনো উৎকণ্ঠিত, আবার কখনো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

(২) পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ভাব।

(৩) সন্দেহ প্রবণতা।

(৪) পরীক্ষা নিরীক্ষায় জানা যায় যে এ রোগ শরীরভিত্তিক কারণেই হচ্ছে।

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে, রোগ শারীরিক বা মানসিক যে লক্ষণের মাধ্যমেই প্রকাশ পাক না কেন— যিনি রোগ নির্ণয় করবেন, তাঁর সজাগ দৃষ্টি যেন রোগীর শরীর এবং মন উভয় দিকেই থাকে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেহ আর মনকে অবিচ্ছেদ্য ভাবেই দেখা দরকার।

[১] বহির্জগতের কোন সংকেত ছাড়াই যখন প্রত্যক্ষণ (perception) বা উপলব্ধি ঘটে তাকেই বলা হয় অমূল প্রত্যক্ষণ (hallucination) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (sense organ)-এর যে কোনটির ভুল প্রত্যক্ষ হতে পারে।

১৪

এপিলেপ্‌সি (Epilepsy) বা মৃগীরোগ

ফিট বা মৃগীমূর্চ্ছা সাধারণত দুটি কারণে হয় :

(১) হিস্টিরিয়া, এবং (২) এপিলেপ্‌সি।

আগে আমরা হিস্টিরিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন প্রধানতঃ এপিলেপ্‌সি (epilepsy) সম্বন্ধেই বলা হবে।

এপিলেপ্‌সি (epilepsy) একরকমের স্নায়ুবিকার (neurological disorder) যা মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়।

এপিলেপ্‌সি অনেক রকম হয়, যেমন :

(১) ব্যাপক,

(২) আংশিক, এবং

(৩) আংশিকভাবে শুরু হয়ে ব্যাপক।

প্রত্যেকটি বিভাগকে আবার আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এখানে আমরা এসবের বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে ফিট বা মৃগীমূর্চ্ছার অসুখ এবং ব্যাপক এপিলেপসির আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকব।

সাধারণ মানুষ যাকে এপিলেপ্‌সি বলে, সেটি হচ্ছে এক ধরনের ব্যাপক এপিলেপ্‌সি যাকে বলা হয় গুরুতর বা প্রধান এপিলেপ্‌সি (grand mal or major epilepsy)। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা এমনিতে ভাল থাকে তবে কিছুদিন পর পর তাদের মধ্যে এই রোগের আবির্ভাব ঘটে। এই রোগ-অবস্থা খুব কম সময়ের জন্যে থাকে এবং তারপরেই আবার স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে ; এই রোগ অবস্থাকেই এপিলেপ্‌সির ফিট (epileptic fit) বা আক্ষেপ (convulsion) বলা হয়। একে খিঁচুনি বা তড়কাও বলা হয়।এই ফিট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং সারা দেহের (চোখ, মুখ, বুক, পিঠ, পেট, হাত এবং পা) মাংসপেশীর প্রবল প্রক্ষেপ বা খিঁচুনি আরম্ভ হয়ে যায়। ফিটের সময়ে দাঁতে দাঁত লেগে যায় এবং জিভে কামড় পড়তে পারে। দাঁড়ানো অবস্থায় ফিট হলে রোগী পড়ে গিয়ে শরীরে আঘাত পেতে পারে। অসমান জায়গায় পড়ার ফলে এবং খিঁচুনি হওয়ার জন্যে শরীরে কেটে ছিঁড়ে যেতে পারে অথবা আরও অন্য রকম গুরুতর আঘাতও লাগতে পারে। জলে পড়লে ডুবে মারা যেতে পারে, আগুনে পড়লে পুড়ে যেতে পারে, অথবা যন্ত্রপাতির ওপর পড়লে বিপজ্জনক আঘাত পেতে পারে, ফিটের সময়ে মুখ দিয়ে ফেনা (গ্যাঁজলা) বেরোয়, কোন কোন সময়ে অসাড়ে প্রস্রাবও হয়ে

যায়। খিঁচুনি অবস্থা সাধারণত ১ থেকে ২ মিনিট থাকে এবং অজ্ঞান অবস্থাটা ১০ থেকে ১৫ মিনিট থাকে। খিঁচুনির ঠিক পরেই সারা দেহের মাংসপেশীগুলো একেবারেই শিথিল হয়ে পড়ে এবং অনেক সময়ে রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। কদাচিৎ কখনো খিঁচুনি হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে যায় ; এই সময়ে স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান থাকে না— চেঁচামেচি করতে পারে এবং দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটোছুটি করতে পারে ; জিনিসপত্র ভাঙাভাঙি করতে পারে, অন্য মানুষজনকে আঘাত করতে পারে, এবং পড়ে গিয়ে বা অন্যভাবে নিজেও বিপজ্জনক আঘাত পেতে পারে। এই অবস্থা কখনো ২-৫ মিনিট, আবার কখনো ২-৫ ঘণ্টাও থাকতে পারে। এই ধরনের ঘটনা খুব কম ঘটলেও ব্যাপারটা অত্যন্ত ভয়াবহ। সেই জন্যেই এ অবস্থা ঘটার সম্ভাবনা দেখা গেলেই খুব দ্রুত রোগীকে সংযত করা দরকার, এবং ২-৫ মিনিটের বেশি চলতে থাকলে শান্ত করার উপযুক্ত ওষুধ (sedative drug)-এর ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগীকে তাড়াতাড়ি শান্ত সংযত করা প্রয়োজন। সংক্ষেপে, জরুরী ব্যবস্থার কথা মাথায় রাখতে হবে রোগের সূচনা দেখা দিলেই।

কোন কোন সময়ে রোগী ফিটের আগেই বুঝতে পারে যে তার এখুনি ফিট শুরু হবে। বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাড়াতাড়ি কোন নিরাপদ জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়তে পারে— তাতে শরীরে আঘাতের সম্ভাবনা কম হয়।

ফিট আবার কতক্ষণ পরে হবে, তার কোন নিয়ম নেই। যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়ে, জাগা অথবা ঘুমন্ত যে কোন অবস্থায় এই ফিট হতে পারে।

এপিলেপ্সির ফিট এবং হিস্টিরিয়ার মধ্যে কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকার জন্যে সাধারণ লোকের পক্ষে তো বটেই, এমনকি অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই দুই ধরনের ফিটের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করা খুবই দরকার, কেন না, এ দুটি হয় ভিন্ন কারণে এবং এদের চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যেও তফাৎ অনেক।

হিস্টিরিয়া এবং এপিলেপসি ফিটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উপায় নিচে দেওয়া হচ্ছে :

এপিলেপসির গ্র্যাণ্ডমল ফিট	হিস্টিরিয়ার ফিট
১। সাধারণত : ১ থেকে ২ মিনিট থাকে।	১। সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়।
২। ফিটের প্রথমে হাত-পা এবং সারা দেহ শক্ত হয়ে যায়, তারপর সারা শরীরে ঝাঁকুনি হতে থাকে, সব শেষে শরীর একেবারে শিথিল হয়ে যায়।	২। কোন নির্দিষ্ট নিয়মে হয় না। প্রায় সময়ে এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে।
৩। ফিটের সময়ে পুরোপুরি অজ্ঞান থাকে।	৩। পুরো অজ্ঞান থাকে না। অনেক সময়ে রোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে পারে।

৪। প্রায় সময়ে ফিটের ঘটনাগুলি পর-পর ঘটে।	৪। কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ফিটের ঘটনাগুলি ঘটে না।
৫। প্রায়ই ফিটের সময়ে শরীরে আঘাত লাগে— যেমন জিভ কেটে যাওয়া, অথবা শরীরের অন্যত্র নানারকম আঘাত লাগা।	৫। এ সব প্রায়ই ঘটে না।
৬। ঘুমের মধ্যে অথবা জেগে থাকা যে কোন অবস্থাতেই ফিট হতে পারে।	৬। ঘুমের মধ্যে সাধারণতঃফিট হয় না।
৭। একা থাকলেও ফিট্ হতে পারে।	৭। একা থাকলে সচরাচর ফিট হয় না। লোকজনের সামনেই ফিট হয়।
৮। মানসিক চাঞ্চল্যকর কোন ঘটনা ছাড়াই ফিট হতে পারে।	৮। সাধারণতঃ মনে চাঞ্চল্য আনে এমন ঘটনার পরেই ফিট হয়।
৯। ফিটের মধ্যে অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যেতে পারে।	৯। এমন সাধারণতঃ হয় না।
১০। বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেও ফিট হয় যেমন, জল, আগুন অথবা বিপজ্জনক চলন্ত যন্ত্রের সামনেও হতে পারে।	১০। এ রকম অবস্থায় সাধারণতঃ ফিট হয় না।
১১। সাধারণতঃ মস্তিষ্কের শরীরভিত্তিক গোলযোগের ফলেই ফিট হয়।	১১। সাধারণতঃ মস্তিষ্কে কোন শরীর ভিত্তিক গোলযোগ দেখা যায় না।
১২। অ্যান্টি-এপিলেপটিক ওষুধে সুফল পাওয়া যায়।	১২। তেমন কিছু সুফল পাওয়া যায় না।
১৩। কেবলমাত্র মনোচিকিৎসাতে এই রোগে তেমন কিছু ভাল ফল পাওয়া যায় না।	১৩। শুধুমাত্র মনোচিকিৎসা (Psychotherapy)তেই এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।
১৪। স্ত্রী-পুরুষ অথবা কোন বয়সের বিচার নেই।	১৪। কিশোরী এবং যুবতীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

এপিলেপ্‌সির চিকিৎসা

শুধুমাত্র ওষুধ প্রয়োগেই এপিলেপ্‌সির ফিট বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিরাময় হতে পারে। সাধারণত দুটি ওষুধ বেশি ব্যবহার করা হয়— ১) ফেনোবারবিটোন এবং ২) ফেনিটয়েন। এই ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে, এমন কি ফিট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও ৩-৫ বছর চালিয়ে যেতে হয়। নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগ এ রোগে খুবই প্রয়োজন। হঠাৎ বন্ধ করলে পরিণতি ভালো হয় না কখনোই। ওষুধের দৌলতে যে ফিট বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন, তা আবার দেখা দিতে পারে। এ ছাড়াও, একটা ভয়াবহ জরুরী অবস্থারও কদাচিৎ উদ্ভব ঘটতে পারে, যাকে বলা হয় স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস (status epilepticus)-যার ফলে রোগীর

মৃত্যুও ঘটতে পারে। একটা ঘটনার কথা বলি—

মেয়েটির নাম নির্মলা। বয়স বারো কি তেরো। সাত আট বছর বয়স থেকেই হত এপিলেপ্‌সির ফিট। গত এক বছর ধরে চিকিৎসা চলছিল ফেনোবারবিটোন দিয়ে। ফিট বন্ধ ছিল চিকিৎসা শুরুর পর থেকেই। ডাক্তার বলেই দিয়েছিলেন, ওষুধ যেন হঠাৎ বন্ধ করা না হয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক দু দিন বন্ধ ছিল ওষুধ।

বিকেলের দিক থেকে শুরু হয়ে গেল ঘন ঘন ফিট হওয়া। একবার ফিট হচ্ছে, ১/২ মিনিট পরে বন্ধ হচ্ছে : কিন্তু জ্ঞান ফেরবার আগেই ৩/৪ মিনিটের মধ্যে আবার ফিট শুরু হচ্ছে। এইভাবে পর পর ফিট হতে হতে চলেছে।

অবস্থা গুরুতর দেখে কান্নার রোল উঠল নির্মলার বাড়িতে। ভিড় করে এল পাড়ার লোক। পাড়ারই একটি ছেলে বুদ্ধি করে দৌড়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল একজন ডাক্তারকে।

তখনও আধঘণ্টা হয়নি। ডাক্তারবাবু তাড়তাড়ি একটা ইঞ্জেকশন দিলেন নির্মলার শিরায়। ডায়জেপাম intravenous injection; ফিট বন্ধ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

ডাক্তারের পরামর্শে নির্মলাকে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে দেওয়া হল কাছাকাছি একটা হাসপাতালে। স্ট্যাটাসের চিকিৎসা তো হলই— তারপরেই ভালমত জ্ঞান ফিরলে মুখে দেওয়া শুরু হল ফেনোবারবিটোন। দিন কয়েকের মধ্যেই বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল নির্মলাকে— সেইসঙ্গে সাবধান করে দেওয়া হল বাড়ির লোককে— উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওই ওষুধ যেন কখনো বন্ধ না করা হয়।

সেদিন পাড়ার ওই ছেলেটি এবং ডাক্তারের উপস্থিত বুদ্ধির জন্যেই প্রাণে বেঁচে গেল নির্মলা।

আর, এই হচ্ছে স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস।

এপিলেপসি রোগে আরও কতকগুলি জিনিস বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। যেমন : (১) কম বয়সের শিশুদের জ্বর হলে কখনো কখনো এপিলেপসির ফিট হয়। এ কে জ্বর তড়কা (febrile convulsion) বলা হয়। জ্বরের চিকিৎসা ছাড়াও এদের ফেনোবারবিটোন ধরনের কিছু অ্যান্টি-এপিলেপটিক ওষুধ দেওয়া দরকার। সাধারণতঃ ৬-৭ বছর বয়স হলে আর জ্বর তড়কা হয় না।

(২) ফিটের সময় দাঁতের মাঝখানে চামচে অথবা অন্য কিছু দিয়ে মুখ খোলবার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাতে দাঁত ভাঙতে পারে, জিভ এবং মাড়ি ক্ষতবিক্ষত হতে পারে, ফিটের মধ্যে রোগীর মুখে জল বা কোন কিছু পানীয় দেবার চেষ্টা করা উচিত নয়— তাতে রোগীর শ্বাসরোধ হতে পারে।

(৩) ফিটের সময়ে রোগীর চারদিকে কঠিন অথবা ধারালো জিনিস থাকলে সেগুলো তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলা উচিত যাতে ফিট হওয়া অবস্থায় রোগীর গায়ে আঘাত না লাগে। খিঁচুনি (convulsion)-র সময়ে রোগীকে জোরে চেপে ধরা উচিত নয়। কারণ, এর ফলে হাড় ভাঙতে পারে এবং গাঁট (joint) বিচ্ছিন্ন (dislocation) হতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, ফিট ২/৩ মিনিট পরে এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। ফিটের পরেই কোন কোন সময়ে রোগী খুব উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে। এ রকমটি ঘটলে, রোগীর গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে অল্প কিছুক্ষণ সাবধানে ধরে রাখলেই দেখা যাবে উত্তেজনা কমে গেছে, ঘোর ভাবটা কেটে গেছে এবং রোগীর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এসেছে।

(৪) এপিলেপসি রোগীর মদ্যপান নিষেধ।

(৫) ফিটের অসুখ যাদের আছে, টেলিভিশন দেখার সময়ে তাদের ফিট হতে পারে। ফিট হবার সম্ভাবনা কমে যাবে যদি ফিটের রোগী টেলিভিশন দেখার সময়ে পর্দা থেকে ৮-১০ ফুট দূরে বসে থাকেন।

(৬) গর্ভাবস্থাতেও অ্যান্টি-এপিলেপটিক ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বন্ধ করা উচিত নয়।

(৭) কোন কোন সময়ে মেয়েদের মাসিক হবার আগে কয়েকদিনের মধ্যেই শুধু ফিট হয়। এদের চিকিৎসা কেবল মাত্র এইটুকু সময়ের জন্যে করলেই চলে যায়। অথবা, ওষুধ চলছে এমন হলে, ওই সময়ে ওষুধের মাত্রা কিছু বাড়িয়ে দিতে হয়।

(৮) চিকিৎসা ঠিকমত চালিয়ে গেলে এই রোগীরা তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে। যেমন, স্কুল-কলেজ যাওয়া, অফিস করা, ক্ষেত-খামারের কাজ ইত্যাদি। শুধু যা জল, আগুন, বিপজ্জনক যন্ত্রপতির কাছে থাকা, এবং গাড়ি চালানোর কাজ না করাই ভাল। গাছে ওঠা এবং যেখান থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে— সেরকম উঁচু জায়গায় উঠে কাজ করা ঠিক নয়।

(৯) এপিলেপসি রোগীর একদিন কি একবেলাও যেন ওষুধ বাদ না যায়—ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যেন ওষুধ সংগ্রহ করে রাখা হয়।

(১০) এপিলেপ্সির জন্যে যে ওষুধ দেওয়া হবে, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জেনে রাখা এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

(১১) মনে রাখবেন, এপিলেপ্সি একটি শারীরিক ব্যাধি। অন্যান্য রোগের মত এই রোগও স্বাভাবিক কারণে হয়—ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক কারণে হয় না মোটেই।

১৫

জড়বুদ্ধি (Mental Retardation)

রতনের বয়স হবে ১১/১২ বছর। বেশ শান্তশিষ্ট ছেলে। কিন্তু লেখাপড়া ঠিকমত হচ্ছে না। তৃতীয় শ্রেণীতে তিন বছর আছে, চতুর্থ শ্রেণীতে উঠতে পারছে না। স্কুল থেকে বলে দিয়েছে, তার নাম কাটা যাবে।

তাই খুব চিন্তায় পড়েছেন ওর বাবা আর মা। রতন যে তাঁদের একমাত্র সন্তান। আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল। মা একটি স্কুলের শিক্ষিকা। বাবা ভাল কাজ করেন ব্যাঙ্কে।

রতন কিন্তু তার সমবয়সীদের সঙ্গে একেবারেই মেলামেশা করে না। হাঁটাচলা শিখেছে একটু দেরিতে, কথা বলতে শুরু করেছে তিন বছরের পর। কাজ ও তার কথাবার্তা খুব একটা পরিষ্কার নয়—একটু জড়ানো।

বড় বেশি সহজ সরল ছেলেটা— সহপাঠীরা ওকে বোকা-বোকা বলে খেপায়। সমবয়সীদের তুলনায় ওর শেখার ক্ষমতাটাও কম।

পড়াশুনোর ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, অনেকবার বলার পর হয়ত শিখল একটা জিনিস— কিন্তু মনে রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। বিশেষ করে অঙ্কে সে খুবই কাঁচা। শারীরিক অসুখ-বিসুখ তেমন কিছু নেই। শরীর ঠিকই আছে। ছেলেটির জড়বুদ্ধি।

জড়বুদ্ধি কাকে বলে

যে-সব ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি বয়স অনুপাতে বাড়েনি (যার ফলে এরা সমবয়সীদের মত শিখতে পারে না বা সমাজে স্বাভাবিকভাবে মিলেমিশে চলতে পারে না) এই ধরনের শিশুদের জড়বুদ্ধি বলা হয়।

শরীরের ক্ষেত্রে যেমন কেউ হয় বেশি লম্বা, কেউ মাঝারি উচ্চতার, কেউ খুব বেঁটে। ঠিক তেমনি মানসিক ক্ষেত্রে আমরা যাকে বুদ্ধি বলি, তারও এই রকম তারতম্য দেখা যায়— কারও বুদ্ধি বেশি, কারও মাঝারি, কারও খুব কম। জড়বুদ্ধিরা এই কম বুদ্ধির দলের।

বুদ্ধি আমরা কি দিয়ে বুঝি

এটা আমরা বুঝি আমাদের চিন্তা করবার শক্তি, শেখবার, বিচার-বিবেচনার, সমস্যা

সমাধানের ক্ষমতা— এই সব থেকে।

জড়বুদ্ধি কিভাবে বোঝা যায়

এর তিনটি প্রধান লক্ষণ :

১। এরা সমবয়সীদের তুলনায় মানসিক বুদ্ধিতে পিছিয়ে থাকে।

২। সমবয়সীদের তুলনায় এদের শেখবার ক্ষমতা কম।

৩। অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে, মানিয়ে চলবার ক্ষমতা এদের কম।

বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence quotient—I.Q.), মানসিক বয়স (Mental Age—M.A.) এবং বাস্তবিক বয়স (Chronological age—C.A.)

(১) বাস্তবিক বয়স— যে বয়স জন্মের তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত দিন গুণে ঠিক করা হয়।

(২) মানসিক বয়স— কত বয়সের সাধারণ বুদ্ধির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এদের বুদ্ধি সমান।

(৩) বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.): $\frac{\text{মানসিক বয়স (mental age)}}{\text{বাস্তবিক বয়স (chronological age)}} \times ১০০$

যেমন ধরা যাক, একজনের বাস্তবিক বয়স দশ বছর এবং তার মানসিক বয়স পাঁচ বছর। তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে : $\frac{৫}{১০} \times ১০০ = ৫০$

জড়বুদ্ধিদের শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা যায়

বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে এদের তিনভাগে ভাগ করা যায় :

(১) অল্প জড়বুদ্ধি (mild mental retardation)

(২) মাঝারি জড়বুদ্ধি (moderate mental retardation)

(৩) গুরুতর জড়বুদ্ধি (severe mental retardation)

অল্প জড়বুদ্ধি কিভাবে চেনা যায়

স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের পার্থক্য এত কম যে প্রথমের দিকে এটা ধরাই যায় না। তারপর যখন ধরা পড়ে, তখন দেখা যায় যে, ওরা ওদের সমবয়সীদের তুলনায় মানসিক বুদ্ধিতে দুই থেকে চার বছর পিছিয়ে আছে।

অর্থাৎ, একটি দশ বছরের জড়বুদ্ধি শিশুর হাবভাব বুদ্ধি পাঁচ থেকে সাত বছরের স্বাভাবিক শিশুর মত। সমবয়সী স্বাভাবিক শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ককে শতকরা একশ ভাগ ধরলে অল্প জড়বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে এটা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ হবে।

একই জিনিস যদি ধৈর্য্য ধরে শেখানো যায়, তাহলে এরা সহজ সাধারণ কাজ বেশ শিখতে পারে। গ্রামের চাষী পরিবারে এদের সাধারণতঃ চাষের কাজে লাগানো যায়।

শহরে শিল্পাঞ্চলে এদের কারিগরি কাজে সহকারীর পদে নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া, মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণ গৃহস্থালির কাজ এদের দিয়ে করানো যায়;একটু চেষ্টা করলে সহজেই এদের স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। সাধারণ স্কুলে সাধারণতঃ এরা পঞ্চম শ্রেণীর বেশি এগোতে পারে না।

মাঝারি জড়বুদ্ধি কিভাবে চেনা যায়

এরা মোটামুটি নিজেদের যত্নটা নিজেরাই নিতে পারে— যেমন খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড় পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, ইত্যাদি। সাধারণ বিপজ্জনক অবস্থা, যেমন আগুন, জল এবং রাস্তাঘাটের আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৩০ থেকে ৫০-এর মধ্যে হয়।

খুব ধৈর্য্য ধরে শেখাতে পারলে সাধারণতঃ সহকারীর কাজ (চাষে অথবা কলকারখানায়) ধোয়াধুয়ি, ঝাড়ামোছার কাজ এরা শিখে নিয়ে কিছুটা স্বাবলম্বী হতে পারে। সাধারণ স্কুলের লেখাপড়া এদের বেশিদূর সম্ভব হয় না—বড় জোর প্রাথমিক স্তরের এক-দুই শ্রেণী পর্যন্ত এরা যেতে পারে।

গুরুতর জড়বুদ্ধি কিভাবে চেনা যায়

এদের পক্ষে নিজেদের যত্ন নেওয়া, অথবা সাধারণ বিপদ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলাও সম্ভব হয় না। খুব বেশি জড়বুদ্ধিদের সারাজীবনই শয্যাশায়ী পরনির্ভরশীল হয়ে কাটাতে হয়। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৩০-এর কম হয়।

সাধারণ স্বাভাবিক শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধির গতি কি রকম হয়

স্বাভাবিক শিশুরা ৬ মাসে বসতে পারে, ৯ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১ বছরে দাঁড়াতে পারে এবং দেড় বছরে বেশ কিছু কথা বলতে পারে।

জড়বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ সবই দেরি করে হয়। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশায়, অথবা তাদের সঙ্গে খেলাধুলোয় এরা অংশ নিতে চায় না। এদের চেহারারও বিকৃতি অনেক সময়ে লক্ষ্য করা যায়।

জড়বুদ্ধি কেন হয়

নানাকারণে জড়বুদ্ধি হয় ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এর কারণ ঠিকমত নির্ণয় করা যায় না।

জড়বুদ্ধিই হোক আর স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই হোক, বুদ্ধির তারতম্য নির্ধারণে বংশগত প্রভাব অনেকখানি হলেও সামাজিক এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কিছু কম নয়।

জড়বুদ্ধির উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

(১) যেসব কারণ গর্ভধারণের (conception) পূর্বেই থাকে :
বংশগত (genetic)
ক) ফিনাইল-কিটোনইউরিয়া (phenyl-ketoneuria) যা শরীরের এক প্রকার রাসায়নিক বিকৃতির ফলে হয়।
খ) ডাউন সিনড্রোম (down syndrome) যা ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার জন্যে হয়।
গ) টিউবারাস সক্লেরোসিস (tuberous sclerosis), যা মস্তিষ্কের গঠনের ব্যতিক্রম থেকে হয়।

ক, খ ও গ প্রত্যেকটিই বংশগত (genetic) কারণে হয় এটা ঠিকই, কিন্তু এই অবস্থাগুলি কিভাবে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের অন্তরায়, তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না।

(২) গর্ভাবস্থায় যেসব কারণ জড়বুদ্ধি ঘটায় :
ক) গর্ভবতীর সংক্রামক ব্যাধি, যেমন রুবেলা (rubella) সিফিলিস (syphilis), ইত্যাদি।
খ) অপুষ্টি।
গ) হরমোনজনিত দোষ।
ঘ) গর্ভের ফুল (placenta)-এর দোষ।
ঙ) জরায়ুর ওপর আঘাত, রঞ্জন রশ্মির (radiation) প্রয়োগ, ইত্যাদি।
চ) কোন কারণে অক্সিজেনের অভাব।
ছ) বিষাক্ত দ্রব্য : যেমন— বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্য, পানীয় এবং ভ্রূণের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে এমন ওষুধ প্রয়োগ, ইত্যাদি।

(৩) প্রসবের সময়ে যে সব কারণ থাকে :
ক) জন্মের সময়ে শিশুর মাথায় আঘাত।
খ) প্রসব হতে দীর্ঘ সময় লাগার ফলে অক্সিজেনের অভাব।
গ) শ্বাসরোধ।
ঘ) প্রিম্যাচুরিটি (নির্দিষ্ট মাসের আগে প্রসব হয়ে যাওয়া)।

(৪) জন্মের পর কিছুদিনের মধ্যে :
ক) সংক্রামক ব্যাধি। যেমন, এনকেফালাইটিস (encephalitis)।
খ) মাথায় আঘাত— আকস্মিক আঘাত অথবা মাথায় প্রহারের ফলে।
গ) মৃগীরোগ (epilepsy)।
ঘ) অপুষ্টি— চার বছর পর্যন্ত, এর মধ্যে প্রথম ২ বছর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক।
ঙ) বিষাক্ত দ্রব্য— বিষাক্ত খাদ্য, ওষুধ অথবা অন্য কোনভাবে প্রয়োগের ফলে।
চ) ইন্দ্রিয় বঞ্চিত— যেমন অন্ধ, বধির। সময়মত বুঝে এগুলির ব্যবস্থা নিলে অসুবিধা হয় না।
ছ) মাতাপিতা অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত থাকলে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পক্ষে তা অন্তরায় হয়।
জ) উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। যেমন— দারিদ্র্য, বাসস্থানের অভাব, এবং যেখানে শিশুর প্রতি অবহেলা, স্নেহভালবাসাহীনতা, নির্মম-নির্দয় ব্যবহার, ইত্যাদি অশুভ পারিবারিক পরিবেশ। সমাজবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বের গবেষণায় এটা পরিষ্কার ভাবে জানা গেছে, যেসব শিশুদের ওইসব অশুভ এবং

দূষিত পরিবেশে থাকায় বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধি এবং বিকাশ হচ্ছে না— তাদের ওই সব জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে, যেখানে স্নেহভালবাসাপূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা দেওয়ার মত সুস্থ পরিবেশ, সেখানে রাখলে কিছুদিনের মধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

(৫) কারণ যেখানে অজানা :

এখানে একটা বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে জড়বুদ্ধির কারণ নির্ণয় করা যায় না।

সমাজে জড়বুদ্ধি কি পরিমাণ আছে

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১—৩ জনের জড়বুদ্ধি এবং এদের মধ্যে ৪ ভাগের ৩ ভাগ হচ্ছে অল্প (mild) জড়বুদ্ধি ; বাদবাকি হয় মাঝারি (moderate) অথবা গুরুতর (severe) শ্রেণীর।

ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব পরিবারেই জড়বুদ্ধি থাকতে পারে। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে গুরুতর এবং মাঝারি জড়বুদ্ধি অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ওই সব পরিবারেও ওই ধরনের জড়বুদ্ধি শিশু সমান অথবা অধিক সংখ্যাতেই জন্মায়। কিন্তু অশিক্ষা এবং আর্থিক অভাবের জন্যে এদের বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

কিভাবে জড়বুদ্ধির সংখ্যা কমান যায়
(Prevention of Mental Retardation)

এই সমস্যাটিকে শুধুমাত্র একটি ডাক্তারী সমস্যা মনে করা ঠিক হবে না। বাস্তবিক পক্ষে সমস্যাটি একটি সামাজিক সমস্যা।

সমাজে জড়বুদ্ধির সংখ্যা কম করবার প্রচেষ্টা প্রধানতঃ নির্ভর করে জনসাধারণের ওপর ; এ বিষয়ে তাঁদের ধ্যানধারণা কতটা আছে, এবং এই সমস্যার প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম তার ওপর। জড়বুদ্ধির মত একটি কঠিন সমস্যা— ডাক্তারীমতে যার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, সেক্ষেত্রে এর প্রতিষেধক ব্যবস্থার ওপরই বেশি জোর দেওয়া দরকার।

একটু আগে জড়বুদ্ধির যে সব কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি একটু পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি প্রতিরোধযোগ্য।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদের যথাযথ যত্ন (prenatal care), তাদের যে সব অসুখ এবং ওষুধ গর্ভে শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক, সেগুলির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। গর্ভবতীর পুষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখে তার জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করলে এই সময়ে অপুষ্টির জন্যে যে জড়বুদ্ধির জন্ম হতে পারে, তা প্রতিরোধ করা যায়। সন্তান প্রসবের সময়ে যেসব অব্যবস্থার ফলে শিশুর মস্তিষ্ক পীড়িত হতে পারে, সেগুলি বন্ধ করা কঠিন নয়—যদি প্রসব করানোর জন্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাত্রীর ব্যবস্থা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, যে সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চেষ্টায় এই ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং তাদের সাহায্য সহজেই পাওয়া যায়। জন্মের পর অতি শৈশবে অপুষ্টি, সংক্রামক ব্যাধি, আঘাত ইত্যাদি যেগুলি শিশুর

মস্তিষ্কের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায়, সেগুলিরও অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। অন্ধ, বধির শিশুদের যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারলে ক্ষেত্র বিশেষে জড়বুদ্ধি কমানো যায়। পারিবারিক অসুবিধার ফলে স্নেহ ভালবাসা থেকে শিশুরা যেখানে বঞ্চিত এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের উপযুক্ত উৎসাহ উদ্দীপনা জোগাতে পারে, এমন সামাজিক পরিবেশের যেখানে একান্ত অভাব—তার জন্যে সুষ্ঠু পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশের বন্দোবস্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে আমাদের অর্থের অভাবের চেয়ে অজ্ঞতা এবং উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্যেই আমরা এইসব সমাজ কল্যাণ কাজে দ্রুত এগোতে পারছি না।

বংশগত জড়বুদ্ধির সংখ্যা কমাতে হলে চাই উপযুক্ত জনশিক্ষা, বিবাহ এবং সন্তান হওয়ার বিষয়ে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শের ব্যবস্থা।

জড়বুদ্ধি নিয়ে যারা জন্মাচ্ছে, অথবা শৈশবেই যাদের জড়বুদ্ধি হচ্ছে—বিশেষ করে যারা অল্প এবং মাঝারি জড়বুদ্ধির, তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এইসব হতভাগ্যদের জীবন যে শুধু অনেক সুন্দর হবে তাই নয়, পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজও অনেকখানি দায় ও ভারমুক্ত হবে।

কি কি কারণে জড়বুদ্ধিদের চিনতে অসুবিধে হয়

সাধারণতঃ এদের চিনতে ভুল হয় না, তবে এমন কিছু অবস্থা আছে যেগুলি জড়বুদ্ধি চিনতে অসুবিধে ঘটায়।

সেই অবস্থাগুলি হচ্ছে :

(১) অন্ধ, বধির, মূক—এগুলির সঙ্গে জড়বুদ্ধি নাও থাকতে পারে। এদের বুদ্ধি স্বাভাবিক থাকলে লেখা পড়া ঠিকভাবে হতে পারে, তবে এদের দোষ (defect) অনুসারে শেখানোর পদ্ধতি ভিন্ন হবে। এদের ক্ষেত্রে এইসব ত্রুটির সঙ্গে জড়বুদ্ধি থাকলে শেখানো অবশ্যই খুব কঠিন।

(২) এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে সামগ্রিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তি কম নয়। কিন্তু কিছু বিশেষ (specific) দোষ আছে, যেমন, শুধু লিখতে পারে না বা শুধু পড়তে পারে না—এইসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সেইমত শেখানো দরকার।

(৩) দীর্ঘস্থায়ী কঠিন শারীরিক ব্যধি—যেমন, পোলিও, যক্ষ্মারোগ (T.B.), অপুষ্টি ইত্যাদিতে ভুগলে তাদের ঠিকমত শেখানোর অসুবিধের জন্য আপাত দৃষ্টিতে জড়বুদ্ধি বলে ভুল হয়। এদের শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় চটপট শিখে নিয়ে সমবয়সীদের ধরে ফেলেছে।

(৪) দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ব্যাধি, যেমন সিজোফ্রেনিয়া (schizophrenia) থাকলে অনেক সময়ে জড়বুদ্ধির সঙ্গে তফাৎ করা মুশকিল হয়। এখানে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ একান্ত দরকার।

(৫) যখন কোন শিশু স্নেহ ভালবাসায় বঞ্চিত, প্রেরণাহীন, অশিক্ষা, অজ্ঞতার সামাজিক পরিবেশে বাস করে, তখন তাকে দেখে মনে হতে পারে জড়বুদ্ধি ; কিন্তু এদের পরিবেশের সুষ্ঠু পরিবর্তনের সঙ্গে বুদ্ধির স্বাভাবিক উন্মেষ দেখা যায়।

ডাক্তারি মতে জড়বুদ্ধির কি কোন চিকিৎসা আছে; এর জন্য ডাক্তারের প্রয়োজনই বা কি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওষুধ প্রয়োগে জড়বুদ্ধির কোন চিকিৎসা হয় না। তবে এর কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন, অপুষ্টি এবং থাইরয়েড হরমোনের অভাব (cretinism) জনিত জড়বুদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় তৎপর চিকিৎসা করালে সুফল পাওয়া যায়। দেহের বংশগত রাসায়নিক বিকৃতির ফলে যেসব জড়বুদ্ধি হয়, তার মধ্যে দু-একটি ক্ষেত্রে ডাক্তারি চিকিৎসায় ফল হতে পারে। তবে ওষুধ দিয়ে এদের চিকিৎসা করার মত সংখ্যা অতি নগণ্য। জড়বুদ্ধির ক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে :

১। স্থির-নিশ্চিতভাবে জড়বুদ্ধির শ্রেণী, কারণ ইত্যাদি নির্ণয় করা।
২। আনুষঙ্গিক রোগ, যেমন মৃগী (epilepsy), থাকলে তার চিকিৎসা করা।
৩। জড়বুদ্ধির নানা রকম মানসিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে—সেগুলির উপযুক্ত চিকিৎসা করা।
৪। এদের মধ্যে শারীরিক গঠনের নানা রকমের অস্বাভাবিকত্ব থাকতে পারে, যেমন, হার্ট, চোখ, নাক, কান, গলা ইত্যাদির জন্যে ডাক্তারের দরকার।

জড়বুদ্ধির থেকে কি কি সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সেইসব সমস্যার প্রতিকারই বা কিভাবে করা যায়

এইসব জড়বুদ্ধিদের নিয়ে অভিভাবকরা বেশ বিব্রত হন। এরা যে শুধু পরিবারেরই বোঝা হয় তাই নয়, বৃহত্তর সমাজও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমস্যার মাত্রাটা অনেকখানি বেড়ে যায় যখন জড়বুদ্ধির সঙ্গে মৃগী অথবা অপরাধ প্রবণতা যুক্ত হয়।

সচ্ছল দেশে (affluent country) এদের জন্যে বহু অর্থব্যয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ; এরা এইসব শিশুদের দায়িত্ব নেয়, নানা রকমের শিক্ষা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশে এদের জন্যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই প্রায় নেই এবং আগামী কয়েক দশকের মধ্যেও সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। অতএব পরিবারকেই এদের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। অভিভাবক ছাড়াও জড়বুদ্ধির সুস্থ ভাই বোনেদেরও নানাভাবে দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে।

এর প্রতিকার হিসেবে কি করতে পারি আমরা ?

ভবিষ্যতে এই সমস্যা যাতে কম হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারি।

(১) চাইল্ড গাইডেন্স (child guidance centre) প্রতিষ্ঠা করে এদের সম্বন্ধে যোগ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
(২) এদের জন্যে বিশেষভাবে শিক্ষা দেবার স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।
(৩) এছাড়া, স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের স্কুলের কিছু শিক্ষক শিক্ষিকাদের জড়বুদ্ধি শিশুদের শিক্ষা দেবার পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে, ওই সব স্কুলে বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে, অল্প জড়বুদ্ধিদের অনেক কম খরচে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যায়।

এই ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টাই সমাজের এই দুর্গতি লাঘব করতে অনেকখানি সাহায্য

করবে।

জড়বুদ্ধি বিষয়ে জনসাধারণকে কি কি জানানো দরকার

(১) এই সমস্যা কতটা আছে, এর কারণ এবং এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা কি হতে পারে।
(২) এদের কিভাবে চেনা যায় এবং শেখানো যায়।
(৩) এদের সীমিত ক্ষমতা বুঝে তার উপযোগী কাজ দেওয়া এবং জনগণের মধ্যেই এদের কর্মসংস্থান করার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো দরকার।
(৪) কি কি ক্ষেত্রে এদের জন্যে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দরকার, তার নির্দেশ দেওয়া।
(৫) যতদূর সম্ভব জড়বুদ্ধিদের তাদের পরিবারের মধ্যেই রাখার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।
(৬) এদের পক্ষে কি করা সম্ভব এবং কি করা সম্ভব নয়, সেগুলি বোঝানো দরকার।
(৭) এদের অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে, ভাল মনে এদের গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, এবং "তুই বোকা, তোর দ্বারা কিছু হবে না, তুই অকর্মণ্য" ইত্যাদি ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগ করার কুফল সম্বন্ধে অবহিত করানো।

অভিভাবকরা এদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবেন এবং কিভাবে এদের শেখাতে পারেন

(১) এদের নিয়ে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন না করেন।
(২) এদের প্রতি অবহেলার ভাব যেন পোষণ না করেন।
(৩) অন্য সক্ষম স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে এদের যেন হেয় না করেন।
(৪) এদের অক্ষমতার স্বীকৃতি এবং স্নেহভালবাসাই হবে শেখানোর প্রধান মাধ্যম।
(৫) বারে বারে বলে, দেখিয়ে উৎসাহ দিয়ে এবং সঠিক কাজ করলে তার জন্যে পুরস্কৃত করে শেখাতে হবে।
(৬) কখন খেলার মাধ্যমে, কখনও বা শিশুর সঙ্গে সঙ্গেই কাজ করে শেখানোর চেষ্টা করতে হবে।
(৭) ধৈর্য নিয়ে, ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এদের শেখানো দরকার।
(৮) নিজেদের ব্যবহারের সঙ্গতি রেখে এদের সঙ্গে চলতে হবে।
(৯) যা সম্ভব, যা এদের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী, সেটা বুঝে এবং বাস্তবের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে এদের শেখাতে হবে।
(১০) আগে যা শিখেছে, তার সঙ্গে পরবর্তী বিষয়কে যুক্ত করে এদের শিক্ষা দিতে হবে।
(১১) সর্বোপরি, এদের প্রতি একাত্মতা (empathy) বোধ করে নিজেদের ক্ষোভ, হতাশা এবং ওদের প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করে শিক্ষা দিতে পারলে তবেই কাজ হবে। এদের ক্ষমতায় আস্থা রেখে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

জড়বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে বিবাহ এবং সন্তান হওয়া কি বাঞ্ছনীয়

এটা ঠিক করার কোন সহজ সরল নিয়ম নেই। আইনগত, নীতিগত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে এর বিচার করা হয়। কোন নির্দিষ্ট নিয়মের চেয়ে ব্যক্তিগতভাবেই এর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। গুরুতর জড়বুদ্ধিদের মধ্যে প্রায়ই সন্তান উৎপাদন শক্তি থাকে না এবং এদের মানসিক ও দৈহিক অক্ষমতার জন্যে প্রায়ই বিবাহ হয় না।

অল্প এবং মাঝারি জড়বুদ্ধিদের যৌন সমস্যার চেয়ে অধিক সমস্যা হচ্ছে অপরাধপ্রবণতা, ভবঘুরেমি এবং পরনির্ভরতা। এরা খুব দীর্ঘায়ু না হওয়ার জন্যে এদের সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা কম থাকে। অল্প জড়বুদ্ধিদের আর্থিক এবং দৈহিক অক্ষমতা না থাকলে এরা সুখেই বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারে। বাবা-মা'র মধ্যে কেউ জড়বুদ্ধি থাকলে সন্তান লালনপালনে সে অক্ষম হতে পারে ; তার ফলে সন্তানদের অবহেলিত হওয়ার এবং তাদের দৈহিক পীড়নের সম্ভাবনা থাকে। এইরকম সম্ভাবনা থাকলে সেখানে স্টেরিলাইজেশন(sterilization)-এর পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

বংশানুক্রমিকভাবে জড়বুদ্ধির প্রসার হতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে এই কথা বলা যায় যে, জড়বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে বিবাহ এবং সন্তান হওয়ার আগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১৬

শিশু মনোবিকার (Psychiatric Disorder of Childhood)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে সর্বত্র শিশুকে বড়দের (প্রাপ্তবয়স্কদের) ক্ষুদে সংস্করণ মাত্র বলে মনে করা হত। শিশুদের দৈহিক গঠন এবং ধ্যান-ধারণার বৈশিষ্ট্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ সীমায় আমরা দেখতে পাই ডাক্তারীর ক্ষেত্রে শিশু বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব। এর প্রায় ৩০ বছর পর শিশু মনোবিকারের দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এসেছে। ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত শিশু মনোরোগীদের জন্য আলাদা কোন ক্লিনিক ছিল না। ইদানীংকালে অবশ্য শিশু মনোবিকারের প্রতি মনোবিজ্ঞানীদের যথেষ্ট দৃষ্টি পড়েছে। আজকাল আমাদের দেশেও বহু জায়গাতেই শৈশবের আচরণ এবং অস্বাভাবিক মানসিকতাগুলিকে কিভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীগুলিকে কিভাবে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় এবং কিভাবে এইসব অস্বাভাবিকতা অথবা রোগগুলিকে নির্ধারণ, নিরাময় এবং নিবারণ করা যায়—সেই নিয়ে গবেষণা চলছে, এবং এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসার দিক থেকে বিচার করলে প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু মনোবিকারের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, শিশু তার মনের ভাব ভাষায় ঠিকমত প্রকাশ করতে পারে না, তাই শিশুর হাব-ভাব তার বাবা-মা, শিক্ষক এবং অন্যরা যেমন দেখে এবং তার বিবরণ দেয়—তার ওপরেই অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। এই বিবরণ আবার তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহ্যশক্তির দ্বারা অনেকটা নির্ধারিত হয়। শিশুর আবেগ অনুভূতি এবং উপলব্ধি ইত্যাদি প্রকাশের ধরন নির্ভর করে তার মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশের স্তর (state of mental maturation)-এর ওপর। দ্বিতীয়ত, শিশুদের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ চিকিৎসার চেয়ে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবর্তনের দিকে বেশি নজর দেওয়ার দরকার হয়। যেমন, বাবা-মা, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শেখানোর পদ্ধতির পরিবর্তন করার দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার হয়। শিশু-মনোবিকার বুঝতে হলে এবং তার চিকিৎসা করতে হলে শিশু মনের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা—যেভাবে একটি অসহায় পরনির্ভরশীল শিশু একজন স্বনির্ভর নাগরিক সত্তায় রূপান্তরিত হয়, সেটা ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

শিশু মনের বিকাশের ধারা বুঝতে চেষ্টা করলেই দেখা যায় যে এটি অত্যন্ত জটিল, বোধগম্য করা বেশ কঠিন। মনের এই বৃদ্ধি এবং উন্মেষ একটানা অবিরাম গতিতে এবং ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে ১৫/১৬ বছর বয়স পর্যন্ত—এমন কি তারপরেও চলে। এই দীর্ঘ

সময় শিশু তার মাতা পিতার অধীনেই শুধু যে থাকে, তাই নয়—জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে তার যে পরিচয়, তাও এদের (বিশেষ করে পিতামাতার) মাধ্যমেই ঘটে ; অর্থাৎ সে তার মাতা পিতার চোখ দিয়েই দেখতে শেখে মানুষের সমাজ এবং বিশ্বপ্রকৃতিকে।

শিশুর সামাজিক জীবনের বিকাশ

এক বছরের শিশু : তিন সপ্তাহের শিশু মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। ছ-মাস হলে শিশু পরিচিত-অপরিচিতর তফাৎ বুঝতে পারে এবং শুধু পরিচিত ব্যক্তির দিকে তাকিয়েই হাসে। সাত থেকে বারো মাসে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে ভয় পায় এবং মা'র কাছে নিরাপত্তা বোধ করে। মা-র কাছ থেকে সরিয়ে নিলে উৎকণ্ঠা হয়। এই সময়ে জামাকাপড় পরাতে সহযোগিতা করতে পারে। মা-মা, দা-দা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে।

শিশু যখন দু বছরের : অন্যের কাজের কিছু-কিছু অনুকরণ করতে পারে। নিজের আচার-আচরণকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই সময়ে মা-বাবা কি চায়, কোনটাকে সমর্থন করে বা কি করলে বিরক্ত হয়, এসব বুঝতে পারে এবং সেই অনুসারে তাদের খুশি করতে চায়।

তিন থেকে পাঁচ বছর : এই সময়ে শিশু হাত-মুখ ধোয়া, জামা-কাপড় ঠিকভাবে পরা এবং নিজে নিজে খাওয়া-দাওয়া করতে শিখে যায়। অন্য শিশুদের সঙ্গে সহযোগিতা করে একসাথে খেলাধুলো করতে পারে। এ-সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির দ্রুত উন্মেষ হতে থাকে এবং কথাবার্তা বেশ গুছিয়ে বলতে শেখে। মা-বাবা'র আচার-আচরণের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলতে শেখে এবং তাদের রীতি-নীতি, আদর্শ এবং বিবেক-বুদ্ধি নিজের মধ্যে নিতে থাকে। এই সময়ে নানা জিনিসে কৌতূহল এবং জানবার আগ্রহ নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে।

এই বয়সে শিশুদের মধ্যে বেশ কল্পনাপ্রবণতা দেখা যায়। কখন আপন মনে, কখন খেলনা নিয়ে নানা কল্পনা করতে পারে এবং বাস্তব জগতের জায়গায় কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করে নিজের খুশিমত নিজের ইচ্ছাপূরণ করতে পারে।

প্রখ্যাত রহস্যকাহিনী লেখিকা অগাথা ক্রিস্টি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এই বয়সে তিনি নিজেকে বেড়াল ছানা কল্পনা করে বেশ কটি খেলনা বেড়াল ছানার সঙ্গে আপন মনে ঘুরে ঘুরে কথা বলে যেতেন। অনেক কিছু কল্পনা করতেন। লেখিকা হয়ে এই কল্পনা প্রবণতা তাঁকে সাহায্য করেছে। পথে যেতে যেতে গল্পের প্লট ভাবতেন এবং পাত্রপাত্রীদের সংলাপ বিড় বিড় করে বলতেন।

এই সময়ে শিশুর কে ছেলে আর কে মেয়ে, এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা হয় এবং স্ত্রী-পুরুষ কি তফাৎ, তাও বোঝে। ছেলে এবং মেয়েদের দৈহিক আকৃতি, মানসিক প্রকৃতি এবং পোশাক-পরিচ্ছদের প্রভেদ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। যৌন অঙ্গ নিয়ে খেলা এবং মৈথুন ক্রিয়া এই বয়স থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কার সঙ্গে কি সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে অন্যদের কি সম্পর্ক এইসব জ্ঞান এই বয়েসের মধ্যেই হয়ে যায়।

ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত : এই সময়ে লিখতে, পড়তে, গুণতে শেখে এবং স্কুলের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলবার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। এই বয়েসে শিক্ষকদের প্রভাব শিশু মনের ওপর খুব বেশি মাত্রায়

দেখা যায়। শিশু ভবিষ্যতে কি হতে চায় এবং কি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব—এইসব জ্ঞান ধীরে ধীরে এই সময় থেকেই হতে থাকে।

বয়ঃসন্ধিক্ষণ (Adolescence): শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্কে পৌঁছাতে মাঝখানে ৪-৫ বছর বয়ঃসন্ধিক্ষণ। ঠিক কোন বয়েসে এটা ঘটবে, তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৩ বছরে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়েসেই এটা ঘটে। এই সময়ে শরীরের পরিবর্তন এত দ্রুত হয় যে সেটা সহজেই সবার চোখে পড়ে। সেক্স-হরমোন ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যেই তৈরি হতে শুরু হয়, যৌন অঙ্গের দ্রুত বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। শরীরের ভেতরের যৌনাঙ্গের পূর্ণতার ফলে মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয় এবং ছেলেদের বীর্য স্খলন হতে শুরু হয়। দেহের বহিরাঙ্গেরও পরিবর্তন হয় ; যেমন মেয়েদের স্তনের বৃদ্ধি হয়, তেমনি ছেলেদের দাড়ি গোঁফ বেরোয়, এবং ছেলেমেয়ে উভয়ক্ষেত্রেই নিম্নাঙ্গের চুল (pubic hair) বের হয়। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার আগ্রহ এই সময়ে দেখা যায়। যৌনভাবের প্রকাশের রীতি অবশ্য সাধারণত সমাজ এবং প্রচলিত পারিবারিক প্রথা অনুসারেই হয়।

এই সময়ে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে সকলেই কিছু মাথা ঘামায়—সে কে ? সমাজে তার স্থান কি ? প্রাপ্তবয়সে আগামী দিনে সে কি হবে ? এইসব চিন্তা তার মনকে বেশ ভালভাবে অধিকার করে রাখে।

এই বয়েসে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা এবং ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্ব বেশি করে বেড়ে ওঠে। এই সময়ে সমবয়সী ছাড়াও একটু বেশি বয়সের 'দাদা'দের প্রভাবও খুব দেখা যায় এবং এদের প্রভাব বাড়ির প্রভাবকে অনেক সময় ছাড়িয়ে যায়। এই বয়সেই দলগড়া অথবা দলভুক্তির সময় এবং দলগতভাবে কাজ করার ঝোঁকও প্রবল হয়।

শৈশবের মানসিক বিকার

৫-৬ বছর বয়সে অর্থাৎ স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত শিশু বেশ কিছু পারিবারিক রীতিনীতি আয়ত্ত করা ছাড়াও মলমূত্র ত্যাগের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও অর্জন করে। দৈনন্দিন জীবনের আরও কিছু কাজ, যেমন আহারের আচরণবিধি, সময়মত শুতে যাওয়া এবং নিজের রাগকে অনেকটা সংযত করতে শেখা—এই সময়ে আয়ত্ত করে।

এ বয়সে অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলি হচ্ছে : ভীতু স্বভাব, অবাধ্যতা, বদরাগী, শয্যামূত্র, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখার মত আচরণ (attention seeking behaviour), অতিশয় চঞ্চল স্বভাব, দাঁত দিয়ে নখ কাটা, আঙুল চোষা, ইত্যাদি।

এই ধরনের আচার-আচরণগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় হলে আর থাকে না। তবে কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য পরেও থেকে যায়।

শৈশবে এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণে যেসব মানসিক বিকার এবং অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটির আলোচনা এখানে করা হবে। এগুলির কারণ হিসাবে অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে বংশগত কারণ দেখা গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দৈহিক কারণ (বিশেষ করে মস্তিষ্কে আঘাত), পারিপার্শ্বিক এবং দূষিত পরিবেশ, সামাজিক এবং সমাজের অব্যবস্থাই দায়ী।

বদমেজাজী শিশু (Temper Tantrums)

২-৩ বছরের শিশুদের মধ্যে বদমেজাজ প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু অতিমাত্রায় অথবা ৫-৬ বছরের পরেও থেকেগেলে তাকে অস্বাভাবিক বলতে হবে।

সমীরের বয়স হবে ৫ বছর ; গত ১ বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে ওর অত্যন্ত রাগ এবং খামখেয়ালী ভাব। ও যখন যা চাইবে তখনই তাই দিতে হবে, না দিলে মাকে মারবে, জিনিসপত্র হাতের সামনে যা পাবে তাই ভাঙবে ছিঁড়বে, তাকে থামান মুশকিল। ওকে নিয়ে বাবা-মার চিন্তার অন্ত নাই। সমীরই ওদের একমাত্র সন্তান। বাবা সরকারী আপিসে কাজ করেন, মা স্কুলের শিক্ষিকা। সমীরের বুদ্ধি ভাল কিন্তু ওর স্বভাবের জন্য ওকে ঠিকমত কিছু শেখান যাচ্ছে না। ওর বাবা-মা খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন।

প্রথমত : সমীরের বাবা-মার সম্বন্ধে এবং ওদের বাড়ীর পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হল। তারপর সমীরকে শারীরিক এবং মানসিক পরীক্ষা করে চিকিৎসা নির্ধারিত হল। এরপর কিছুদিন ওকে মনোচিকিৎসায় রাখা হল। ইতিমধ্যে ওর বাবা ও মাকে তাদের উভয়ের পারস্পরিক আচরণ কেমন হবে এবং শিশুর প্রতি তাদের ব্যবহার কেমন হবে সেইসব বিষয়ে আলোচনা করা এবং পরামর্শ দেওয়া হল। প্রায় এক বৎসর ধরে এই ব্যবস্থা চলতে থাকল। স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হলে লেখাপড়া শেখানরও উপদেশ দেওয়া হল। ৬ বছরে যখন সমীরকে স্কুলে ভর্তি করা হয় তখন ওর স্বভাব প্রায় স্বাভাবিক।

এর কারণ এবং প্রতিকার

এইসব শিশুদের বাবা-মার মধ্যে প্রায়ই সদ্ভাবের অভাব থাকে এবং তাদের নিজেদের অনেক সময় মানসিক সমস্যা থাকে। নিজেদের মধ্যে বৈষম্য থাকার ফলে সন্তানের প্রতি আচরণে পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন—শিশুর কোন আচরণকে একজন যখন উৎসাহ দিচ্ছেন অন্যজন তখন সেই একই আচরণের জন্য শিশুকে শাস্তি দিচ্ছেন নিরুৎসাহ করছেন। অভিভাবকদের এই ধরনের অসঙ্গত আচরণ শিশুর সামাজিক আচরণ বিধি যথাযথ ভাবে বিকাশকে বিঘ্নিত করতে পারে।

এই শিশুদের চিকিৎসা করতে হলে তাদের অভিভাবকদের নিজেদের মানসিকতা এবং তাদের শিশুর প্রতি ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। শুধুমাত্র শিশুর চিকিৎসাই যথেষ্ট নয়।

ঘুমের সমস্যা

ঘুম আসতে দেরি হওয়া, ভয়ের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাওয়া (night mares) এবং নিশিআতঙ্ক (night terror)-গ্রস্ত অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গের পরে কোনো স্বপ্নের কথা বলতে না পারা—এগুলি প্রায়ই দেখা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব বিশেষ আর দেখা যায় না। তবে ভয়ের স্বপ্ন দেখা এবং ভয়ের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাওয়া যে কোন বয়সেই হতে পারে।

আহারের সমস্যা

আহারে বিতৃষ্ণা, খাবার-দাবার ছোঁড়াছুঁড়ি অথবা এটা খাব না ওটা খাব না—এই ধরনের বাতিক শিশুদের মধ্যে প্রায় দেখা গেলেও সেগুলি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। যেসব

জিনিস খাদ্য নয়, এমন সব জিনিস, যেমন—মাটি, কাগজ ইত্যাদি খাওয়ার দিকে ঝোঁক কখনো কখনো দেখা যায়। তবে এগুলিও বেশিদিন থাকে না।

শৈশবের নিউরোসিস (Childhood Neurosis)

বড়দের মধ্যে যেমন নানা রকম নিউরোসিস (উৎকণ্ঠা, হিস্টিরিয়া, অবসেসিভ-কমপালসিভ নিউরোসিস ইত্যাদি) দেখা যায়, তেমনি শিশুদের মধ্যেও এগুলি দেখা দিতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই এগুলি সেরে যায়।

স্কুল ভীতি (School Refusal)

স্কুলে যেতে আপত্তি নানা কারণেই হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের নিউরোসিস দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন—যেসব ক্ষেত্রে সবে স্কুল যাওয়া শুরু করেছে, সেখানে দেখা যায়—মা-র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে, এটাতেই আপত্তি। অপেক্ষাকৃত বড় শিশুদের মধ্যে—পড়াশুনো ঠিকমত পারছে না, ফেল করার আশঙ্কা, অথবা কোনোভাবে হেয় প্রমাণিত হবার ভীতি অথবা শিক্ষক কিংবা সহপাঠীদের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কা স্কুলে যাওয়ার বাধা হতে পারে। স্কুল ভীতি বিষণ্নতা রোগের কারণেও হতে পারে। স্কুলের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে শিশু যেমন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে, তেমনই বাড়িতে কোনো অসুখবিসুখ হলে, বা অন্য কারণে, যেমন অভিভাবকেরা শিশুর স্কুলে যাওয়া কদিন বন্ধ করলে পরে দেখা যায় তারপর থেকে শিশু আর স্কুল যেতে চাইছে না। এছাড়া, বাড়ি থেকে পালানোর ঝোঁক যেসব শিশুদের থাকে, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা একটু ভিন্ন। সেখানে এটা ভয়-ভীতি নয়, বরং অভিভাবকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচায়ক।

শোধরানোর উপায় কি

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবক এবং শিক্ষকরা মিলিতভাবে এর কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিকারের চেষ্টা করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তবে সব সময়ে চেষ্টা করতে হবে, শিশু যেন কোনোভাবে অপমানিত বা নিরাপত্তার অভাব বোধ না করে। এভাবে সমস্যার সমাধান না হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার। এসব ক্ষেত্রে মনোচিকিৎসায় (psychotherapy) সুফল পাওয়া যায়।

বাড়ি থেকে যারা পালায়

যেসব ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, তাদের সংখ্যা নিশ্চয় খুব কম হবে না। রেডিও, টেলিভিশন এবং খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের খবর আমাদের নজরে আসছে প্রায় রোজই। এরা নানা বয়সের। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের বয়স ৯ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। পালিয়ে যাওয়ার কারণ অবশ্য সব ক্ষেত্রে এক নয় এবং পালানোর ধরনও নানা রকমের হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরাও অবশ্য বাড়ি ছেড়ে পালায়—তবে এখানে আমরা শুধু অল্প বয়সীদের নিয়েই আলোচনা করব। অনিচ্ছাকৃতভাবেও কিছু ছেলেমেয়ে হারিয়ে

যায়—এরা বেশিরভাগই হয় জড়বুদ্ধি, মানসিক বিকারগ্রস্ত, অথবা গ্রাম থেকে সদ্য শহরে এসে পড়ায় শহরের হালচালের সঙ্গে তেমন ওয়াকিবহাল নয়। এখানের আলোচনা হবে শুধু তাদের নিয়েই যারা ইচ্ছাকৃতভাবে পালায়।

এই ধরনের বাড়ি থেকে পালিয়েদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া মুস্কিল। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের সংবাদ প্রচার করা হয় না। সামান্য ক'জনের খবর পৌঁছোয় পুলিশ দপ্তরে বা ঐ ধরনের কোনো সংস্থায়।

কেউ বাড়ি ছেড়ে পালায় বাড়ির অবস্থা সহ্য করতে না পেরে। যেমন, বাড়িতে অনবরত ঝগড়াঝাঁটিতে তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে ; কেউ বা যখন তখন কড়া সমালোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, আবার কেউ বাড়ি ছাড়ে বাইরের বাড়তি সুখের আকর্ষণে—যেমন, যৌন সুখের প্রত্যাশায়, অবাধে ড্রাগ অথবা মদ্যপানের সুখভোগের ইচ্ছায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাড়ির বিরক্তিকর পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠলে যারা পালায়, তারা একবার দু'বারের বেশি আর পালায় না। কিন্তু যারা বাড়ির বাইরের বাড়তি সুখের টানে গৃহত্যাগী হয়, তারা বাড়ি ছাড়ে বার বার।

এছাড়াও কিছু সংখ্যক ছেলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে না। এরা কেউ যাযাবর হয়ে যায়, কেউ সমাজবিরোধীদের দলে ভিড়ে গিয়ে অথবা তাদের খপ্পরে পড়ে নানা রকম অসামাজিক কাজের মাধ্যমে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

ঘর ছেড়ে যারা পালায় তারা প্রায়ই আর তাদের বাবা-মার কাছে ফিরতে চায় না। কিন্তু মনে মনে চায় সেইসব পরিবারে থাকতে যেখানে আছে স্নেহ ভালবাসার পরিবেশ, যেখানে সে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে থাকতে পারবে অনায়াসে। এই ধরনের ঘটনার কিছু কিছু কাহিনী আমাদের কানে আসে। শুনে মনে হয়, এই ধরনের গৃহত্যাগের জন্যে দায়ী বাবা-মার আচার-আচরণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই ধারণা ভুল। বিশেষ করে বাইরের জগতের মজা লোটবার প্রবণতা যাদের মধ্যে বেশি বাবা-মার আচার-আচরণের জন্যে তারা গৃহত্যাগী হয় না। মনোচিকিৎসার সাহায্যে এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় এইসব শিশুদের ঘরমুখো করে তোলা যায় ; কুপথ থেকে সরিয়ে এনে সুষ্ঠু সুন্দর জীবন যাপনে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে এদের ফিরিয়ে আনার যেসব ব্যবস্থা সমাজে থাকা দরকার, তার বিশেষ কিছুই নেই।

এর ফলে দেখা যায়, এই ধরনের শিশু যদি মেয়ে হয়, তাহলে তার অভিভাবক তাকে আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে চায় না। তখন সে যাবে কোথায় ? করবে কি ? নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার জোরে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কি পারবে সমাজ-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে ? নাকি, সমাজবিরোধীদের শিকার হয়েই থাকতে হবে ?

আর যদি শিশুটি ছেলে হয় ? সম্মানজনক পুনর্বাসন যদি না পায় ? তাহলে কি সে অসামাজিক অথবা সমাজবিরোধীদের সংখ্যা আরও একটু বাড়াবে না ?

অপরাধপ্রবণ শিশু

এদের আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সব সময়ে কোনো না কোনো অসামাজিক আচরণে লিপ্ত থাকা।

শুভঙ্কর দাশের বয়স ১২ বছর। থাকে শহরতলীর এক বস্তিতে। বাবা একটা কারখানার শ্রমিক, আর মা কয়েকটা বাড়িতে কাজের মেয়ের কাজ করে। স্কুল যাওয়া

ছেড়েছে এক বছর আগে। প্রথম দিকে ঘর থেকে টাকা পয়সা চুরি করে সিনেমা দেখতো আর বিড়ি খেতো। অত্যন্ত মিথ্যা কথা বলে, অবাধ্য আর বদমেজাজী। পড়ায় মন ছিল না একেবারেই। স্কুলে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে না গিয়ে যেতো সিনেমায়। অনেক মারধর খেয়েছে বাবা-মার কাছে, স্বভাব কিন্তু বদলায়নি। চুরি করতে গিয়ে একবার ধরা পড়ে এবং বেদম মার খায় পাঁচজনের হাতে। আর একবার সিনেমা হলের সামনে চড়া দামে টিকিট বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে, অল্পবয়স দেখে পুলিশ তাকে দু-চার ঘা দিয়ে এবং থানায় আটকে রাখার ভয় দেখিয়ে সে যাত্রা ছেড়ে দেয়। আজকাল সে মুখ খিস্তি ছাড়া কথা বলে না, গাঁজা আর মদে রপ্ত হয়ে গেছে। ওর ছোট্ট একটা ভাই আছে। কোনো মমতা নেই তার ওপর। মাঝে মধ্যে তাকে ঠেঙায় নির্মমভাবে।

শুভঙ্কর দাশ যে অপরাধপ্রবণ শিশু, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই ধরনের প্রবণতা ছেলেদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ঝোঁক চলে যায় যৌন অপরাধের দিকে। সাধারণত বিশৃঙ্খল পরিবার আর দূষিত সামাজিক পরিবেশ থেকেই এরা আসে। মস্তিষ্কে আঘাতের ইতিহাস এবং এপিলেপ্‌সিও বেশি দেখা যায় এদের মধ্যে।

এদের জন্যে কি করা যেতে পারে

প্রবণতাটা অল্পমাত্রায় থাকলে এমনিতেই সেরে যায়, তবে বাড়াবাড়ি মাত্রায় হলে অবশ্যই প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার। ওষুধ প্রয়োগে বিশেষ সুবিধে হয় না। বাবা-মাকে পরামর্শ দেওয়া এবং সম্ভব হলে পরিবেশের কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে। যথেষ্ট সুফলের আশা করা যায় যদি সমস্ত পরিবারকে নিয়ে একসঙ্গে মনোচিকিৎসা (family therapy) এবং রোগীর আলাদাভাবে মনোচিকিৎসা (individual psychotherapy) করা সম্ভব হয়।

প্রবণতা যদি অধিক মাত্রায় থাকে, তাহলে শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে বয়স বাড়লেও প্রবণতা থেকে যাবে।

অমনোযোগী চঞ্চল শিশু (Attention Deficit Hyper Kinetic Syndrome)

অমনোযোগিতাই এদের আসল দোষ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় অস্থির চঞ্চলমতি হয় এই শিশুরা।

বিনোদের বয়স এখন ৮ বছর। খুব ছোট থেকেই একটু বেশি মাত্রায় চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। কিন্তু গত দু'বছর ধরে তার আচার-আচরণ অত্যন্ত অস্বাভাবিক। অতিশয় অস্থির, মুহূর্তের জন্যেও স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, কথাও বেশি বলে। কোনো ব্যাপারেই মনঃসংযোগ রাখা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব—কি স্কুলে, কি বাড়িতে—সর্বত্রই একই ছবি। এই অমনোযোগিতার জন্যে তাকে কিছু শেখানোও মুস্কিল। কিছু কিছু অসামাজিক হাবভাব, বিশেষ করে অবাধ্যতা আর অন্যের ক্ষতি করার প্রবণতা, ভালমাত্রাতেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে ওর মধ্যে। এই সঙ্গে আছে খামখেয়ালিপনা আর হঠাৎ হঠাৎ রেগে যাওয়া। ওকে নিয়ে রাস্তায় বেরোনোই মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখন যে কি করে বসবে, অথবা গাড়ি চাপা পড়বে, তার ঠিক নেই।

বিনোদের মত ছেলেদেরই বলা হয় অস্থিরমতি চঞ্চল শিশু (attention deficit hyper-kinetic disorder)।

তুলনামূলকভাবে, মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই এই রোগ বেশি হয়। এদের এপিলেপ্সি, জড়বুদ্ধি এবং স্নায়ুর রোগ (neurological disorder) থাকতে পারে।

কম মাত্রায় থাকলে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণগুলো কমে যায়। কিন্তু যেখানে থেকে যায় জড়বুদ্ধি আর অপরাধ প্রবণতা অথবা বেশি মাত্রায় চঞ্চলতা, সেখানে ভাল হবার সম্ভাবনা কম।

চিকিৎসা

অভিভাবকরা এইসব শিশুদের নিয়ে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে আগে সেই অভিভাবকদের আশ্বস্ত করা দরকার। অনেক সময়ে ওষুধ প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। শিশুর অভিভাবক এবং শিক্ষককে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে তাদের মাধ্যমেই শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়।

আত্মকেন্দ্রিক শিশু (Autistic Child or Infantile Autism)

অমল ছেলেটার বয়স ৫ বছর। বাবা-মার একমাত্র সন্তান। বাবা এবং মা উভয়েই ভাল চাকরি করেন, শিক্ষায় আর্থিক সামর্থ্যে এঁরা সমাজের উঁচুতলার মানুষ। আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল অমল—হাঁটা-চলা, কথা বলতে শেখা, সবই ঠিক ছিল। এরপরেই দেখা গেল, অন্যের সঙ্গে মেলামেশায় কোনো আগ্রহ নেই অমলের, কোলে নিতে হাত বাড়ালে নিজে আর হাত বাড়ায় না, হেসে তাকালে সে আর হেসে তাকায় না। হেসে জবাব দেয় না, চেনা আর অচেনাতে কোনো তফাৎ নেই তার কাছে, জড় আর চেতনের কোনো প্রভেদ আর সে দেখে না—মা আর ঘরের দেওয়াল তার কাছে যেন একই। কারো চোখের দিকে তাকায় না—সবার থেকে সে যেন বিচ্ছিন্ন, একা—পৃথিবীর কোনো কিছুতেই আর তার আকর্ষণ নেই। দু-চারটে শব্দ ছাড়া মুখ দিয়ে অন্য কোনো শব্দ বা কথা প্রায় কিছুই বেরোয় না। কথাবলা একদম বন্ধ; যদি বা দু-একটা বলে, তা অন্যের কথার পুনরাবৃত্তি-প্রতিধ্বনি মাত্র। খেলায় অথবা খেলনায় কিছুতেই নেই আগ্রহ। আচার আচরণে দেখা যাচ্ছে একটা জিনিস—পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না—বিন্দুমাত্র হেরফের পছন্দ করে না আহারে বা পোশাকে—একই খাবার, একই জামাকাপড় না হলেই বিরক্ত হয়, রেগে যায়।

অমলের যা হয়েছে, তাকেই বলা হয় ইন্ফ্যান্টাইল অটিজিম্ (Infantile Autism)। কেন যে এই অবস্থা হয়, তার কোনো কারণ আজও জানা যায়নি। কোনো চিকিৎসায় এদের কোনো উন্নতি হতে দেখা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের জড়বুদ্ধি দেখা যায় এবং কিছু সংখ্যক রোগীদের মধ্যে এপিলেপসির ফিটও দেখা যায়।

চিকিৎসা

এ রোগ সারানোর কোনো ওষুধ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে অস্বাভাবিক আচার-আচরণগুলিকে কিছু কমাবার চেষ্টা নিশ্চয় করা যায়। প্রয়োজন মত বিশেষ শিক্ষার পরামর্শ (special education) এবং হাসপাতাল বা উপযুক্ত কোনো হোমে ভর্তির ব্যবস্থা

করে শিশুর পরিবারকে সাহায্য করা যায়।

শৈশবে আবেগের বিকার (Affective Disorders of Childhood) ম্যানিয়া (Mania)

বয়ঃসন্ধিক্ষণের আগে ম্যানিয়া রোগ খুব কমই দেখা যায়। কখনো কখনো এই রোগ শিশুর আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় : যেমন দেখা যায়, শিশুর মধ্যে চঞ্চলতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা পর্যাবৃত্তভাবে (periodically) আসছে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে যদি হয়, তাহলে অনেক সময়ে দেখা যায় লক্ষণগুলো বড় বয়েসে রোগ হলে যেমনটি হয় ঠিক সেই রকম।

বিষণ্ণতা (Depression)

শৈশবের বিষণ্ণতা রোগে পড়াশুনোয় অমনোযোগ, অহেতুক রাগ, অপরাধ প্রবণতা, শারীরিক ব্যথা যন্ত্রণা আহারে অনিচ্ছা—এই ধরনের লক্ষণ বেশি দেখা যায়, সোজাসুজি বিষাদ ভাবের (unhappy feeling) প্রকাশ নাও থাকতে পারে।

চিকিৎসা : মনোচিকিৎসা এবং অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ড্রাগ দিয়েই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসা করা হয়। আত্মহত্যা প্রবণতা থাকলে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা নিরাপদ। ব্যক্তিগত মনোচিকিৎসা (individual psychotherapy) ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ীর অন্যান্যদের এক সঙ্গে নিয়ে পারিবারিক মনোচিকিৎসার (family psychotherapy) প্রয়োজন হয়।

শৈশবে সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia in Children)

এই রোগ বয়ঃসন্ধিক্ষণের আগে প্রায়ই দেখা যায় না। বয়ঃসন্ধিক্ষণে হলে, বড়দের মতই সব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ভীতু স্বভাব এবং স্পর্শকাতরতা এই রোগের পূর্বলক্ষণস্বরূপে প্রকাশ পেতে পারে।

চিকিৎসা : বড়দের মতই একই নিয়মে অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধপ্রয়োগে এর চিকিৎসা করা হয়।

বিশেষ বিশেষ মানসিক বৃত্তির ক্রমবিকাশের গোলযোগ

(Specific Development Disorders

জড়বুদ্ধি, মস্তিষ্ক-বিকার, অন্ধ অথবা বধির থাকলে, অথবা পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষণের সুযোগের অভাবে বিশেষ বিশেষ মানসিক বৃত্তিযেমন, পড়তে বা লিখতে পারা, কথা বলতে শেখা, অঙ্ক শেখা ইত্যাদিতে দেরি হতে পারে ; অথবা, ঠিকমতভাবে এসব বৃত্তির বিকাশ ঘটল না, এমনটাও হতে পারে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা বিশেষ কোনো বৃত্তি, যেমন—ঠিকমত পড়তে না পারা, বা অঙ্ক কষতে না পারা এমন দেখা যায় অথচ, জড়বুদ্ধি, মস্তিষ্ক-বিকার, অন্ধত্ব বা বধিরত্ব এসব কিছুই নেই অর্থাৎ, অন্য সব বিষয়েই স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়ে গেছে শুধু দু-একটা ব্যাপারে যেমন, পড়া, লেখা ইত্যাদিতে ত্রুটি থেকে যায়। এইসব ত্রুটি যথাসময়ে ধরতে পারলেএবং সেসবের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারলে লেখাপড়া ইত্যাদি স্বাভাবিক মতই হতে পারে। নইলে এদের জড়বুদ্ধিদের দলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

শয্যামূত্র (Enuresis)

সাধারণতঃ দেখা যায়, তিন বছর বয়সেই ঘুমের মধ্যে মূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়ে যায়। ৫-৬ বছর বয়সের পরেও ঘুমের মধ্যে বিছানায় মূত্রত্যাগের অভ্যেস থেকে গেলে তাকেই বলা

হয় শয্যামূত্র।

মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই এ রোগ বেশি হয়। অপেক্ষাকৃত বড় বয়সের শিশুরা যখন ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে, তখন প্রায়ই দেখা যায় তারা স্বপ্নের মধ্যে মনেকরছে যেন ঠিক জায়গাতেই মূত্রত্যাগ করছে এবং হয়ে গেলে আবিষ্কার করেযে সেটা হয়েছে বিছানাতেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে এই অভ্যেস এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের শেষে প্রায় থাকে না বললেই চলে।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে :

(১) মূত্রাশয়ের মূত্রত্যাগ ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে যেসব মাংসপেশী, সেগুলির বৃদ্ধি কোনোভাবে ব্যাহত হলে শয্যামূত্র হতে পারে, যেমন ঘটে জড়বুদ্ধি শিশুদের ক্ষেত্রে।

(২) মলমূত্র ত্যাগের উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের জন্যে এরকমটা হতে পারে, এবং

(৩) প্রতিকূল পরিবেশে পড়লেও কখনো কখনো দেখা যায় এ অভ্যেস যাদের বন্ধ হয়ে গেছিল, আবার অভ্যাসটা তাদের মধ্যে ফিরে এসেছে। শিশুকে যদি কোনো কারণে তার মাকে ছেড়ে কিছুদিন বা কিছুক্ষণ থাকতে হয় (যেমন কোনো কারণে মা যদি হাসপাতালে ভর্তি হয়, অথবা শিশুর স্কুলে যাওয়া শুরু হলে, অথবা তার নতুন ভাই বা বোন জন্মালে)—বন্ধ হয়ে যাওয়া শয্যায় মূত্রত্যাগের অভ্যেস আবার ফিরে আসে তার মধ্যে।

কদাচিৎ কখনো শরীরভিত্তিক কারণেও শয্যায় মূত্রত্যাগ হতে পারে। এ অভ্যেস থাকলে শিশুদের মনে একটা হীনমন্যতার ভাব দেখা যায়।

এর চিকিৎসা কি

(১) শিশুর পরিবেশে কোনো প্রতিকূল অবস্থা দেখা গেলে শিশু এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে (family therapy) এর প্রতিকার সম্ভব।

(২) শিশু এবং অভিভাবকরা মিলিতভাবে একটা তালিকা তৈরি করতে পারে, এতে থাকবে কবে এবং কতবার বিছানায় মূত্রত্যাগ ঘটেছে। অনেক সময়ে দেখা যায় কিছুই আর করতে হয় না—শুধু এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই রোগমুক্তি ঘটে।

(৩) অপেক্ষাকৃত দুরূহ ক্ষেত্রে সম্মোহন এবং অন্যান্য মনোচিকিৎসার (psychotherapy) প্রয়োজন হয়।

(৫) বৈদ্যুতিক বিছানার (electric bed) ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে অল্পদিনের মধ্যেই সুফল পাওয়া যায়। এই বিছানার ব্যবস্থাটা এমনই যে, ২-৪ ফোঁটা প্রস্রাব বিছানায় পড়লেই বেজে ওঠে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (electric bell) —সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায় শিশুর, প্রস্রাবও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, বেড়ে যায় মূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। কয়েকদিন এই প্রক্রিয়া চালালেই সেরে যায় শয্যায় মূত্রত্যাগের বদভ্যেস।

দাঁত দিয়ে নখ কাটার স্বভাব (Nail Biting)

প্রায় এক পঞ্চমাংশ শিশুর মধ্যে কোনো না কোনো সময়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যেস দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভ্যেসটা আপনা থেকেই চলে যায়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে শুধু থেকেই যায় না—অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে বেশ বাড়াবাড়ি আকারে ভোগাতে থাকে। বড় হলেও থেকে যায়।

যেসব শিশুদের তোৎলামি থাকে, এ অভ্যেস তাদের মধ্যেই বেশি করে দেখা যায়। ছেলেদের মধ্যে এর সম্ভাবনা বেশি। উদ্বেগপ্রবণ এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের মধ্যেই এই স্বভাবের প্রাদুর্ভাব বেশি করে দেখা যায়।

এই অভ্যেস শিশুমনের উৎকণ্ঠা প্রশমনের একটা উপায় যা শিশুর অজ্ঞাতসারেই তার নির্জ্ঞান মন থেকে নির্ধারিত হয়। নির্জ্ঞান মন কিভাবে আমাদের বাহ্যিক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, এটি তার একটি উদাহরণ।

এর চিকিৎসা কি

ধমকানি দিয়ে, হাত বেঁধে রেখে অথবা আঙুলে তেঁতো জিনিস লাগিয়ে রেখে খুব একটা সুবিধে হয় না। কিছুটা উপশম ঘটে শান্ত করার ওষুধ প্রয়োগ করলে। মনের মধ্যে চাপ পড়তে পারে, এমন কিছু পরিবেশের মধ্যে থাকলে সম্ভবপর ক্ষেত্রে সেই পরিবেশ পরিবর্তনের দিকে নজর দেওয়া দরকার। মনোচিকিৎসায় (psychotherapy) যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। শিশুর আত্মমর্যাদা এবং নিরাপত্তা বোধ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দরকার।

আঙুল চোষার অভ্যাস (Finger Sucking)

জীবনের প্রথম বছরটাতে সব শিশুকে আঙুল চুষতে দেখা যায়—আর আঙুলের মধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল চোষার (thumb sucking) দিকেই ঝোঁকটা বেশি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা কমতে থাকে। ৫ বছর পর খুবই কম দেখা যায়। কোনো কোনো সময়ে কঠিন মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লে বুড়ো আঙুল চোষার অভ্যেস আবার ফিরে আসে। যেমন—শিশুর বয়স যখন ৫-৬ বছর, তখন তার একটি ভাই বা বোন জন্মালে অনেক ক্ষেত্রেই বিছানায় প্রস্রাব করা বা বুড়ো আঙুল চোষার অভ্যেস আগে চলে যাওয়া সত্বেও আবার নতুন করে শুরু হয়ে যায়। এই রকম ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক প্রতিক্রিয়াটা কতকটা এই ধরনের : মায়ের স্নেহে এতদিন ছিল একচেটিয়া অধিকার ; বখরা বসাতে এটা আবার কে এল ? নিরাপত্তার অভাব বোধ বিলক্ষণ শুরু হয় তখন থেকেই এবং এই অভাববোধ আরও বেড়ে যায় আত্মীয় স্বজনদের আলগা মন্তব্যে—এবার তোর জায়গা দখল করে নিল আর একজন।

মেয়েদের মধ্যেই এই অভ্যেসটা বেশি দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, মা খুব উচ্চশিক্ষিতা। দাঁত দিয়ে নখ কাটার মত এই অভ্যেসটাও শিশুমনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ। অভিভাবকরা এই অভ্যেসকে কখনোই ক্ষমার চোখে দেখে না, ফলে, বিরূপ সমালোচনা, বিদ্রূপ এবং শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে শিশু অভ্যেসটাকে গোপনে অব্যাহত রাখে—তার থেকেই এসে যেতে পারে হীনমন্যতার ভাব।

চিকিৎসা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অভ্যেস বড় হলে আপনা থেকেই চলে যায়। কদাচিৎ এই অভ্যেস দাঁত বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। শিশু এবং অভিভাবক উভয় পক্ষের আগ্রহ এবং সহযোগিতা পাওয়া গেলে আচরণ পরিবর্তনের যে-পদ্ধতি (Behaviour Therapy) প্রচলিত আছে, তার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার, শিশুকে যেন কোনো অপমানজনক পরিস্থিতিতে ফেলা না হয়।

১৭

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব

জনসাধারণের মধ্যে মানসিক রোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব এবং এই অজ্ঞতাই মানসিক রোগের প্রতিকার আর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা।

সমাজে শিক্ষকের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি যা শেখাচ্ছেন, তা ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমে তাদেরই পরিবারে তথা বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করছে এবং লোক তা শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করে চলেছে।

সাধারণ পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানের পিপাসা মেটে—তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব গঠনেএবং সমাজে তাদের সুষ্ঠুভাবে চলার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

ছেলে মেয়েদের জীবনে আদর্শ নির্ধারিণে অথবা আগামীদিনের সমাজে তাদের ভূমিকা কি হবে, এইসব স্থির করতে শিক্ষকের ভূমিকা অনেকখানি। ছাত্রাবস্থায় যেমন তাদের প্রতিভার নানা দিক বিকাশের ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠিত হচ্ছে, সেইসঙ্গে তাদের বয়ঃসন্ধিক্ষণ, কৈশোরে এবং যৌবনের প্রারম্ভে নানা জটিল মানসিক সমস্যা আর মানসিক দ্বন্দ্বেরও সামনাসামনি এসে পড়ছে তারা—এবং এইখানেই এদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উপযুক্ত নির্দেশ এবং পথ প্রদর্শন যাতে তারা শঙ্কাহীনভাবে আত্মসচেতনতা এবং আত্মনির্ভরতা নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে।

এইসব কারণেই শিক্ষকের দরকার মানসিক বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান। তাহলেই তার পক্ষে ঐ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

তাছাড়া, এই দীর্ঘ ছাত্রাবস্থায় যেসব মনোবিকারের প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেগুলিই পরবর্তীকালে কঠিন মানসিক ব্যাধির আকার ধারণ করতে পারে। এইসব প্রাথমিক লক্ষণ সাধারণের দৃষ্টিতে নাও ধরা পড়তে পারে ; কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞান থাকলে শিক্ষকের চোখ এড়ানো কঠিন। প্রবল হয়ে যাওয়ার আগেই যদি তা ধরা পড়ে, তাহলে তার প্রতিকার অনেক সহজসাধ্য হয়। এই বয়েসে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য অনেক ঘটনা ঘটে যার সম্বন্ধে আগেই ব্যবস্থা নিতে পারলে অনেক দুরূহ মানসিক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

যেমন কোন কোন সময়ে দেখা যায় একজন ছাত্র বা ছাত্রীর লেখাপড়ার অবনতি হচ্ছে, অথবা অশালীন আচরণে ক্লাসের শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। এসব বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান না

করে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার আত্মসম্মানকে নষ্ট করে দিয়ে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল।

পরে দেখা গেল, এই শাস্তির ব্যবস্থাই তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হয়ত সহৃদয়তা আর মানবিক আচরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে, তার আত্মমর্যাদাকে খর্ব না করেও সুষ্ঠু সমাধান হতে পারত।

শিক্ষকের মতামত এবং নির্দেশ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকরা সহজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেন। তার ফলে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা এবং অনেক মানসিক রোগ বিষয়ে অজ্ঞতা আর কুসংস্কার থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারে।

শিক্ষকের শিক্ষা দেবার ক্ষেত্র বিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তাঁর ক্ষেত্র বৃহত্তর সমাজেও বিস্তৃত। সমাজে শিক্ষকের এই সম্মানিত স্থান থাকার ফলে সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব যথেষ্ট। বিপদে আপদে এঁদের কাছে লোকে পরামর্শ নিতে যায় এবং এইসব কারণেই প্রতি শিক্ষকের সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে, বিশেষত মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার; যাতে তিনি মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় এবং মানসিক রোগ প্রতিকারে জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করতে পারেন, সুপরামর্শ আর সঠিক নির্দেশ দিয়ে সবাইকে সাহায্য করতে পারেন।

এইসব বিবেচনা করলেই বোঝা যায়, মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক রোগ বিষয়ে শিক্ষকদের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার।

১৮

মনস্তত্ত্ব ও যৌন বিকার

যে কটি জৈব আকর্ষণ (biological tendency) মানুষের জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে—সেগুলি হচ্ছে : আহার (eating), কাম (sex), নিদ্রা (sleep) এবং কর্ম (activity) ।

কামবৃত্তি বা যৌনবৃত্তি মানব জীবনের মূল প্রেরণার অন্যতম। যৌন ইচ্ছা, যৌন আবেগ, যৌনক্রিয়া—এসব এত ঘনিষ্ঠভাবে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত যে মনোবিদ্যাকে বাদ দিয়ে যৌনবিষয়ক কোনো অলোচনাই সম্ভব নয়। শরীর এবং মন যে অবিচ্ছেদ্য, সেটা মানুষের যৌনজীবন বিচার করতে গেলেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আবার দেখা যায় বেশির ভাগ মনোবিকারেই—রোগীদের যৌনজীবন কোনো না কোনোভাবে বিঘ্নিত হয়।

যৌনবৃত্তিকে নিয়ে ব্যক্তি এবং সমাজে দ্বন্দ্বের শেষ নেই। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষকে সমাজবদ্ধ রাখতে তার যৌন প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে কত বিচিত্র প্রয়াসই না করেছে। শিশুকে মানুষ করতে অর্থাৎ তাকে সভ্য নাগরিক করতে যেদিকে প্রধান লক্ষ্য রাখা হয়—সেটি হচ্ছে তার যৌন জীবনকে প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুসারে পরিচালিত করা।

মানুষের যৌনজীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং জটিল। সামাজিক, দৈহিক এবং মানসিক—এই তিনটে শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে এই কামবৃত্তিকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে।

সাধারণ লোকের ধারণা অনুসারে দেখতে গেলে, স্বাভাবিক কামবৃত্তি হচ্ছে সেই প্রবল ইচ্ছা যার পরিণতিতে প্রাপ্তবয়স্ক দুজন ব্যক্তির মধ্যে (তাদের মধ্যে একজন পুরুষ এবং অন্য জন স্ত্রীলোক) যৌনমিলনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন ঘটে। এই সীমাবদ্ধ সংজ্ঞায় যৌনবৃত্তি আবদ্ধ নয়—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে কামের প্রকাশ এবং প্রভাব ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে বহুদূর বিস্তৃত।

সংক্ষিপ্তভাবে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে যৌন বিকারকে প্রধানত : দুভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) যৌন অক্ষমতা (sexual dysfunction) এবং কাম বিকৃতি বা লক্ষ্যভ্রষ্ট কাম (sexual deviation)।

যৌন অক্ষমতা (Sexual Dysfunction)

বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কোনো পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গমে অসমর্থ হয়, তখন তাকে পুরুষের যৌন অক্ষমতা বলা হয়; স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এর অর্থ যৌন সহবাসে সুখের অনুভূতির

অভাব। যেসব কারণে যৌন অক্ষমতা হয়, সেগুলি হচ্ছে :

১) যৌন ইচ্ছার অভাব,
২) যৌন উত্তেজনার অভাব,
৩) যৌনসুখের চরম অভিব্যক্তির (orgasm) অভাব,
৪) যন্ত্রণাদায়ক যৌন সহবাস।

১) যৌন ইচ্ছার অভাব

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যেই যৌন ইচ্ছার অভাব বেশি দেখা যায়। বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে এই অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। নানা কারণে এরকম হতে পারে। যেমন : ১) শারীরিক অসুস্থতা, দুর্বলতা

২) আকর্ষণীয় নয় এমন সঙ্গী,
৩) দীর্ঘস্থায়ী পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অবস্থার চাপ,
৪) উৎকণ্ঠা, বিষাদ, নির্লিপ্ত মনোভাব,
৫) নির্জ্ঞান মনে যৌন বিষয়ে দ্বন্দ্ব, যার ফল ভীতি,
৬) ধর্মীয় বা অন্য কোনো কারণে যৌন আবেগকে দমন করে রাখার ফল স্বরূপ,
৭) যৌন সঙ্গীর প্রতি সদ্ভাবের অভাব অথবা একের প্রতি অন্যের বিদ্বেষ।

২) যৌন উত্তেজনার অভাব

যৌন ইচ্ছা না থাকলে যৌন উত্তেজনা হয় না, আর উত্তেজনা না হলেযৌন সঙ্গম সম্ভব হয় না। পুরুষের ধ্বজভঙ্গ থাকলে, অর্থাৎ লিঙ্গ যথেষ্ট শক্ত এবং খাড়া না হলে, এবং ওই অবস্থায় লিঙ্গ রতিক্রিয়ার শেষ পর্যন্ত না থাকলে সহবাস ঠিকমত হয় না। স্ত্রীলোকের যোনিস্ফীতি এবং নিঃসৃত রসের দ্বারা যোনিপথ মসৃণ এবং পিচ্ছিল না হলে রতিক্রিয়া ঠিকভাবে হতে পারে না।

ধ্বজভঙ্গ

লিঙ্গ যথেষ্ট শক্ত না হওয়ার জন্য পুরুষের যৌনসঙ্গমের অক্ষমতাকে ধ্বজভঙ্গ (impotence) বলা হয়। কোনদিনই এই কারণে যৌন সহবাসে সক্ষম না থাকলে, তাকে বলা হয় প্রাথমিক ধ্বজভঙ্গ (primary impotence)। আর যেসব ক্ষেত্রে পূর্বে সক্ষমতা ছিল, কিন্তু এখন অসমর্থ—সেই অবস্থাকে পুরুষের দ্বিতীয় পর্যায়ের ধ্বজভঙ্গ (secondary impotence) বলা হয়।

ধ্বজভঙ্গ দৈহিক এবং মানসিক উভয় কারণেই হতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে (শতকরা ৯০ ভাগের বেশি) এই অক্ষমতা মানসিক কারণেই হয়। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে একজন পুরুষ কোনো বিশেষ অবস্থায় অথবা বিশেষ কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাসে অক্ষম—কিন্তু অন্য অবস্থায় অথবা অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে সঙ্গমে সমর্থ। পুরুষদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌনক্ষমতা কিছু কিছু কম হতে থাকে এবং বার্ধক্যে এই শক্তি খুবই সীমিত হয়ে যায়। বিখ্যাত যৌনবিজ্ঞানী মাসটারস্ এবং জনসন দেখেছেন, যেসব পুরুষদের বয়স চল্লিশের বেশি, তাদের সকলেরই ধ্বজভঙ্গ হয়ে যেতে পারে—এমন ভয় থাকে। এর থেকে তাঁরা মনে করেন, পুরুষত্ব বা যৌনশক্তি হারাবার ভয় পুরুষদের খুবই প্রবল।

শারীরিক অসুস্থতা এবং নানারকম ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলেও ধ্বজভঙ্গ হয়—এর জন্য যথাযথভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয়। এছাড়া বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখা দরকার সহবাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে (যেমন, হস্তমৈথুনের সময়ে অথবা অসময়ে) লিঙ্গ খাড়া এবং শক্ত হচ্ছে কিনা—যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই অবস্থা মানসিক কারণেই হচ্ছে—দৈহিক কারণে নয়।

সাধারণত যেসব শারীরিক কারণে যৌন অক্ষমতা হতে পারে

১) ডায়াবিটিস মেলিটাস্।
২) থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের আধিক্য (hyperthyroidism) অথবা স্বল্পতা (hypothyroidism)।
৩) অ্যাজমা।
৪) এনজাইনা পেকটরিস (angina pectoris), পূর্বে মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কসেন (previous myocardial infarction) হয়ে গেছে এমন।
৫) যোনির প্রদাহ (vaginitis, endometriosis, etc)।
৬) নানা প্রকার শল্য চিকিৎসার পর (after surgical operation), বিশেষ করে শরীরের কোনো যৌন অঙ্গ যেখানে বাদ দেওয়া হয়—mastectomy, orchitectomy, oophorectomy etc.
৭) কিডনীর, হৃৎপিণ্ডের, লিভারের ক্রিয়ার ত্রুটি।
৮) এছাড়া যে কোনো দৈহিক রোগ বা শরীরকে যথেষ্ট দুর্বল করে দেয়, যেমন, রক্তাল্পতা, অপুষ্টি ইত্যাদি
৯) কোনো কারণে যৌন অঙ্গের বৃদ্ধি ঠিকমত না হলে যৌন অক্ষমতা থাকবে।

সাধারণতঃ যেসব ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে যৌন অক্ষমতা হতে পারে

১) মদ (alcohol) এবং অন্যান্য নেশার ওষুধ, যেমন, হেরোইন, মরফিন, কোকেন ইত্যাদি।
২) মানসিক রোগের ওষুধ, যেমন, বিষণ্ণতার ওষুধ (anti-depressants) উৎকণ্ঠার ওষুধ, বাতুলতার ওষুধ (anti-psychotic) বিশেষত thioridazine।
৩) অধিক রক্তের চাপের ওষুধ (anti-hypertensives)।
৪) হরমোন (স্টেরয়েড-steroids), ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে যৌন উত্তেজনা কম হবার কারণ

নানা রকমের মানসিক কারণ, যেমন, গর্ভবতী হবার ভয়, সহবাসে যন্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা, যৌনইচ্ছার অভাব, নির্জ্জন মনের মানসিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

সহবাস সম্পূর্ণ হবার আগেই বীর্যস্খলন (Premature Ejaculation)

এসব ক্ষেত্রে যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করানোর পূর্বেই অথবা প্রবেশ করানোর পর স্ত্রীলোকের সঙ্গম সুখ লাভ হবার আগেই বীর্যপাত হয়ে যায়। বীর্যপাত হয়ে গেলেই লিঙ্গও শিথিল হয়ে যায়, যার ফলে সফল সঙ্গম সম্ভব হয় না। ঠিক যে সময়ে বীর্যপাত করা দরকার, সেই সময় পর্যন্ত বীর্যধারণ ক্ষমতা এদের থাকে না। এটা অবশ্য পুনঃ পুনঃ হওয়া চাই, তবেই সেটা হবে অক্ষমতা—মাঝে মাঝে এক আধবার স্বাভাবিক লোকেরও হতে পারে। যৌবনের প্রারম্ভে যুবকদের মধ্যে এই ধরনের অভিজ্ঞতা অতি সাধারণ। অতিদ্রুত বীর্যস্খলনই সফল যৌন সঙ্গমের প্রধান অন্তরায়।

বীর্যস্খলনে অতি বিলম্ব (Retarded Ejaculation)

এটি খুবই বিরল ঘটনা। এতে বীর্যস্খলনের অতিশয় দেরি হয় অথবা স্খলন একেবারে নাও হতে পারে। এটা যৌন সহবাসেও হতে পারে আবার হস্তমৈথুনেও হতে পারে। এই ঘটনা মানসিক কারণে যেমন হতে পারে তেমনই আবার কিছু কিছু ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলেও হতে পারে।

৩) যৌনসুখের চরম অনুভূতির অভাব (Orgastic Dysfunction)

স্ত্রীলোকের যৌনসুখের চরম অনুভূতির অভাব নানা কারণে হতে পারে। পুরুষ সঙ্গীর ধ্বজভঙ্গ থাকলে স্ত্রীলোকের এই অনুভূতির কথাই ওঠে না, তবে এই ঘটনা সবেচেয়ে বেশি যে কারণে হয় সেটি হচ্ছে, স্ত্রীলোকের এই অনুভূতি সম্বন্ধে পুরুষদের অজ্ঞতা এবং অনভিজ্ঞতা। পুরুষের দৈহিক ক্ষমতার হয়তো কোনো ত্রুটি নেই, যথেষ্ট সময় দিয়ে যৌন সহবাস করা হল—যোনির মধ্যে বীর্যপাত এবং পুরুষটির সুখের চরম অনুভূতিও হল—কিন্তু যে অভাব থেকে গেল, সেটি হচ্ছে ওই সহবাসে স্ত্রীলোকের যৌনসুখের চরম অনুভূতির অভাব। পুরুষের অজ্ঞতার ফলে—যৌন সহবাসের পূর্বে উপযুক্ত পূর্বসুখক্রিয়ার অর্থাৎ আদর সোহাগ এবং শৃঙ্গারের অভাব হয়—যার ফলে যৌনবাসনা পরিপূর্ণভাবে উদ্দীপিত হয় না—ঠিকমত যৌনবাসনা পরিপূর্ণভাবে উদ্দীপিত হয় না—ঠিকমত যৌন-উত্তেজনা ঘটে না বলেই যৌনক্রিয়ার জন্যে লিঙ্গ ও যোনির উপযুক্ত প্রস্তুতি পর্বও হয় না। পুরুষ ও নারীর যৌন-কামনার মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরুষ যেমন হঠাৎ কামতপ্ত হয়ে ওঠে, নারী সেরকম হয় না। তার কাম-বাসনা জাগে খুব ধীরে ধীরে। স্ত্রীলোককে রতিবিহারের জন্যে উন্মুখ করে তোলার জন্যে অর্থাৎ তার এই প্রস্তুতি পর্বে একটু বেশি সময় লাগে। সেটা হবার আগেই অর্থাৎ নারীদেহকে রতিক্রিয়ার উপযোগী করে তোলার আগেই যৌনক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে সাধারণত স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে চরম অনুভূতি লাভের সম্ভাবনা কমে যায়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে পুরুষের দোষের জন্য এমনটা ঘটে তা নয়। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে যাদের অন্য সবকিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও, ওই অনুভূতি তাদের আসে না—এমন কি স্বমেহন (masturbation) ক্রিয়াতেও আসে না। এরা হচ্ছে সত্যিকার যৌন আবেগহীন কামশীতল স্ত্রীলোক। সভ্য জগতে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের এই অনুভূতি নিয়মিত হয় না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এনিয়ে কারো বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু ইদানীং দৃষ্টিভঙ্গী বদলাচ্ছে, এদিকে লোকের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এবং এসবের নিরাময়ের জন্যে চিকিৎসকের কাছে এই সমস্যা নিয়ে লোক আসছে।

৪) যন্ত্রণাদায়ক যৌন সহবাস (Painful Sexual Intercourse)

(ক) যোনি সঙ্কোচন (Vaginismus)

যৌন সহবাসের সময়ে যোনির মাংসপেশীর অনিচ্ছাকৃত প্রচণ্ড সঙ্কোচনকেই যোনি সঙ্কোচন (vaginismus) বলা হয়। এই অবস্থায় লিঙ্গ প্রবেশ করানোর চেষ্টা করলে লিঙ্গ প্রবেশ করানোও যেমন কষ্টকর, তেমনি স্ত্রীলোকের পক্ষেও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। সাধারণত এই ধরনের প্রচণ্ড পেশী সঙ্কোচন ঘটে দুটি কারণের জন্যে। এক, লিঙ্গ প্রবেশ করানোর প্রতি কঠিন ভীতি ; দুই, যৌন সহবাসের প্রতি মনে অন্যায় অপরাধবোধ। এই অসুবিধা থাকলেসেটা দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে।

(খ) সঙ্গমকালে বেদনা (Dyspareunia)

যোনি সঙ্কোচনের ফলে সঙ্গমকালে যেমন অসহনীয় যন্ত্রণা হয়, তেমনি অন্যান্য কারণেও সহবাস স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টদায়ক হতে পারে। যৌন আবেগ এবং উত্তেজনার অভাব থাকলে, যোনিপথ যথেষ্ট পরিমাণে রসসিক্ত হয় না—ফলে যোনিপথ শুষ্ক থেকে যায়, তখন লিঙ্গপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করলেই স্ত্রীলোকের যন্ত্রণা হয়। এছাড়া, জরায়ু, ওভারি অথবা তলপেটে কোনো যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি থাকলে তার ফলেও লিঙ্গপ্রবেশে বেদনা হতে পারে।

(গ) বীর্যস্খলনে যন্ত্রণা

বীর্যস্খলনের সময়ে পুরুষের যন্ত্রণা হতে পারে, কিন্তু এ ঘটনা অতিশয় বিরল।

স্বমৈথুন বা হস্তমৈথুন (Masturbation) এবং স্বপ্নদোষ (Night Pollution)

এবিষয়ে অজ্ঞতা এবং নানা ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত আছে। এই ধারণাগুলির মধ্যে দুটি প্রধান :

(১) বীর্য শরীরের একটি অমূল্য সম্পদ এবং বীর্যস্খলন শরীরমনের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকারক।

(২) স্বমৈথুন এবং স্বপ্নদোষ (ঘুমের মধ্যে বীর্যস্খলন) যৌন অক্ষমতার প্রধান কারণ, এছাড়া এগুলি অনেকরকম শারীরিক এবং মানসিক রোগেরও কারণ।

এই ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক মতে একেবারেই ভুল, এইসব ভ্রান্ত ধারণার বশে মনে উৎকণ্ঠা জন্মায় এবং সেই উৎকণ্ঠার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় মনের ওপর। এই ধারণাকে বদ্ধমূল করে রাখতে সাহায্য করে যৌনবিষয়ে সাধারণের অজ্ঞতা, এক শ্রেণীর হাতুড়ে চিকিৎসকের মন্তব্য এবং কিছু অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন।

অজয় দাশ—এর বয়স ১৯/২০। কলেজের ছাত্র। ছাত্রাবাসে থাকে। সে তার স্বপ্নদোষের কথা বলেছিল এক বন্ধুকে। অজ্ঞতাবশত বন্ধুটি তাকে চিকিৎসার পরামর্শ দেয়—কেননা স্বপ্নদোষ নাকি খুবই খারাপ জিনিস। বিড়ম্বিত অজয় তখন চুপি চুপি যায় এক ওষুধের দোকানে। নিজের অবস্থা খুলে বলে জানতে চায় এই 'বিশ্রী' অবস্থার প্রতিকারের কোনো দাওয়াই আছে কিনা। দোকানদার তাকে আরও ভয় দেখিয়ে দিয়ে খেতে দিল একটা বেজায় দামি টনিক। দু-চারদিন সেই টনিক সেবনের পর অজয় দেখলে, নৈশস্খলন তো কমলই না—উপরন্তু আরও বৃদ্ধি পেল। ফলে তার ঘুম কমে গেল, উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল, পড়ায় মনঃসংযোগ হ্রাস পেল। এই সময়ে সে একজন ডাক্তারী ছাত্রের সংস্পর্শে আসে। তারই পরামর্শে একটা হাসপাতালে মানসিক বিভাগে মনোচিকিৎসকের সুপরামর্শ এবং সুচিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই নিরাময় হয়ে ওঠে। এই 'রোগ' আরোগ্যর সঙ্গে সঙ্গে পরম বিস্ময়বোধ জাগ্রত হয় অজয়ের মনের মধ্যে। এই রকম একটা সাধারণ ঘটনা সম্পর্কে লোকে এত অজ্ঞ !

হস্তমৈথুন এবং স্বপ্নদোষ যে মারাত্মক ব্যাধি নয়, অতিসাধারণ ঘটনা—এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সুবিপুল অজ্ঞতা স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার মাধ্যমে দূর করতে পারলেই মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ সহজতর হতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা মনের স্বাস্থ্য অটুট রাখার ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক।

মেয়েদের মধ্যেও হস্তমৈথুন বা স্বমৈথুন অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা এবং এই প্রক্রিয়াই অনেক স্ত্রীলোকের যৌনসুখের চরম অভিব্যক্তি উপভোগের একমাত্র উপায়।

যৌনসঙ্গম (Sexual Intercourse)

যৌনসঙ্গমকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝতে হলে যৌন অঙ্গের শারীরবিদ্যা (anatomy and physiology of sex organ) বিষয়ে জ্ঞান অবশ্যই দরকার। কিন্তু তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তাই শুধু সঙ্গম কালে স্ত্রী-পুরুষের শরীর মনের প্রতিক্রিয়ার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

স্ত্রী-পুরুষের যৌনসঙ্গমকে চারটি ধাপে ভাগ করা যায়।

১) প্রথম ধাপ

উত্তেজনা বর্ধন : এই ধাপে কতকগুলি দৈহিক এবং মানসিক প্রক্রিয়া যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, কামোদ্দীপক কথোপকথন, কামক্রীড়া (love play) ইত্যাদি প্রয়োজনীয়। এর ফলে পুরুষের লিঙ্গ স্ফীত এবং দৃঢ় হয়, আর স্ত্রীলোকের যোনির মধ্যে এক প্রকার রস নির্গত হয় যা যোনিপথকে মসৃণ ও পিচ্ছিল করে দেয়। এছাড়া যোনিপথ বিস্তৃত এবং প্রশস্তও হয় এবং পুরুষের লিঙ্গের মুখ থেকে কিছু পরিমাণ আঠাল রস নিঃসৃত হয়। এটাকে মোটামুটি যোনি-লিঙ্গের মিলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। এই পর্বে কতকটা সময় লাগবে, সেটা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষ এবং সঙ্গমের উপযোগী পরিবেশের ওপর। মোটামুটি এর জন্যে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

(২) দ্বিতীয় ধাপ

এই পর্ব শুরু হয় যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করা থেকে এবং শেষ হয় যৌনসুখের চরম অভিব্যক্তি পর্বের (Orgastic phase) শুরু পর্যন্ত। এ সময়ে যোনিমধ্যে লিঙ্গ সঞ্চালন অবস্থায় লিঙ্গের দৃঢ়তা এবং স্ফীতি আরও বাড়ে, যোনিপথ আরও প্রশস্ত হয়, যোনি থেকে নির্গত রসের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং যোনিমধ্যে মৃদু মৃদু সঙ্কোচন হতে থাকে। যৌনবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই পর্বে সাধারণত ৩০ সেকেন্ড থেকে ৩ মিনিট পর্যন্ত সময় লাগে।

(৩) তৃতীয় ধাপ

এই ধাপকে বলা হয় যৌনসুখের চরম অভিব্যক্তি পর্ব (Orgastic phase) এই পর্বে খুব কম সময়ের মধ্যে পুরুষের যৌন অঙ্গের পর পর তিন চারবার পেশী সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ থেকে বেগে বীর্য নির্গত হয়। স্ত্রীলোকেরও এই সময়ে ৩ থেকে ১৫ বার পর্যন্ত যোনির পেশীর সঙ্কোচন ঘটে। যৌন অঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গেরও পেশীসঙ্কোচন ঘটে স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ঠিক এই সময়টাতেই। ৩ থেকে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যেই সমাপ্ত হয় পর্বটি। তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই যৌন সুখের চরম মানসিক অনুভূতি বোধ হয়।

(৪) চতুর্থ ধাপ

এটি হচ্ছে নিবৃত্তি পর্ব। যৌন উত্তেজনা শুরু হওয়ার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে কত সময় লাগবে, সেটা নির্ভর করে যৌনসুখের চরম অভিব্যক্তি হল কিনা—তার ওপর। সুখের পূর্ণ অনুভূতি দিয়ে যৌনক্রিয়া সমাপ্ত হলে মাত্র ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই নিবৃত্তি পর্ব শেষ হয়, আর চরম সুখের অভিব্যক্তি না হলে ১২-২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

একবার চরম সুখের অনুভূতি হলে পুরুষের ক্ষেত্রে পুনরায় উত্তেজিত হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে—সেটা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে।

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভিন্ন—নিবৃত্তির কোনো সময় না দিয়েই এদের পুনঃপুনঃ কয়েকবার চরম সুখের অভিব্যক্তি আসা সম্ভব।

যৌন সঙ্গমের সাফল্য কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

যৌনসম্ভোগ সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে হলে চাই :

১) যৌন ইচ্ছা বা কামপ্রেরণা (sexual drive)।
২) আকর্ষণীয় জুড়ি বা সঙ্গী।
৩) নির্বিঘ্ন পরিবেশ।
৪) শৃঙ্গারক্রিয়া অথবা সঙ্গমপূর্ব কামোদ্দীপক ক্রিয়া (forepleasure activity or loveplay) উপযুক্তভাবে সম্পাদনের দ্বারা—
   ক) পুরুষের লিঙ্গ স্ফীত এবং দৃঢ় হওয়া এবং
   খ) স্ত্রীলোকের যোনির বিস্তার এবং যোনিমধ্যে পিচ্ছিল ও মসৃণকারী রস নিঃসরণ।
৫) যোনিমধ্যে লিঙ্গের প্রবেশ এবং সঞ্চালন।
৬) স্ত্রী-পুরুষ একে অন্যের যৌন অনুভূতি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করে উপযুক্ত সময়ে চরম সুখের অনুভূতিকে উপলব্ধি করা।

উল্লিখিত যে কোনোটির অভাবেই সঙ্গমের সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে। উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, লজ্জা, অন্যায়-অপরাধবোধ, ভয়-ভীতি, যৌন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা, পুরুষের যৌনক্ষমতা সম্পর্কে নারীর প্রতিকূল মন্তব্য, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসা এবং পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, ইত্যাদি যৌন সম্ভোগ সাফল্যের পরিপন্থী।

যৌন অক্ষমতা (Sexual Dysfunction) কিভাবে নির্ধারণ করা যায়

চিকিৎসার জন্য যখন কোনো ব্যক্তি নারী অথবা পুরুষ চিকিৎসকের কাছে আসে, তখন সেই ব্যক্তির চিকিৎসা করার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার দৈহিক এবং মানসিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে নিয়ে অক্ষমতার স্বরূপ নির্ণয় করা দরকার। পরীক্ষার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :

(১) সম্ভবক্ষেত্রে রোগী এবং তার যৌন সঙ্গীকেও আলাদা আলাদা ভাবে এবং একই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

(২) সমস্যাটাকে দুজনের মধ্যে কে কিভাবে দেখে, তা বিস্তারিতভাবে জানা প্রয়োজন।

(৩) যৌন সঙ্গম কালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরা কিভাবে কি করে সেটা বিস্তারিতভাবে জানতে হয়।

(৪) সমস্যাটা প্রথম থেকেই ছিল, না প্রথম কিছুদিন স্বাভাবিক থাকার পর এরকম হয়েছে, সেটা দেখতে হয়।

(৫) যৌন ইচ্ছা বা আবেগ, উত্তেজনা, যৌনসঙ্গম এবং স্বমৈথুন ইত্যাদির রীতি কেমন?

(৬) যৌন সহবাস বিষয়ে জ্ঞান, এই বিষয়ে উৎকণ্ঠা অথবা ঘৃণা, ঐ পরিবারের অন্যদের এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী, যৌন বিষয়ে শিক্ষা আছে কিনা, এ বিষয়ে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা, জুড়ি বা সঙ্গী কি ধরনের রীতি বা কৌশল প্রয়োগ করে—এসব বিষয়ে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

(৭) জানা দরকার এই দম্পতির যৌন বিষয় ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক কি রকম।

(৮) অনেক শারীরিক রোগ আছে—যেমন ডায়াবিটিস, কঠিন হৃৎপিণ্ড অথবা কিডনীর অসুখ ইত্যাদিতে যৌন অক্ষমতা হতে পারে। এ জন্য প্রত্যেক রোগীর শারীরিক পরীক্ষা এবং রোগনির্ণয়ের জন্য দরকারমত ল্যাবোরেটরির পরীক্ষা করা আবশ্যক।

(৯) শারীরিক এবং মানসিক অসুখের জন্য যেসব ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, সেগুলির মধ্যে কিছু ওষুধ আছে (যেমন, রক্তের চাপের জন্যে মিথিলডোপা অথবা মানসিক রোগে থায়োরিডাজিন) সাময়িকভাবে যৌন অক্ষমতা ঘটাতে পারে। এইসব কারণে ভালভাবে অনুসন্ধান করা দরকার রোগী ঐ সময়ে কোনো ওষুধ খেয়েছে বা খাচ্ছে কিনা।

(১০) অনেক মানসিক ব্যাধি আছে—যেমন বিষণ্ণতা রোগ, উৎকণ্ঠা—এসব অসুখে যৌন ক্ষমতা কমে যায়। এমনও দেখা যায় যে, কেবলমাত্র যৌন অক্ষমতার লক্ষণ নিয়ে যে রোগী চিকিৎসার জন্যে এসেছে—অনুসন্ধানে জানা গেছে রোগীর আসল রোগ বিষণ্ণতা এবং সেই চিকিৎসাতেই তার যৌনবিকার নিরাময় হয়ে গেছে। এইসব কারণেই রোগীর মানসিক অবস্থা ভালভাবে দেখা আবশ্যক।

(১১) অধিক মদ্যপান এবং ড্রাগের নেশা মানুষের যৌন অক্ষমতা ঘটাতে পারে, অধিক পরিমাণে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ মদ্যপান, আফিং, মরফিন, হেরোইন, কোকেন, ব্রোমাইড ইত্যাদির ব্যবহার যৌন অক্ষমতার কারণ হতে পারে। অতএব এ বিষয়ে উপযুক্তভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

(১২) কাম বিকৃতি (sexual perversion) যেমন—সমকামিতা (homosexuality) যৌন অক্ষমতার কারণ হতে পারে। একবার এক নববিবাহিত যুবক চিকিৎসকের কাছে এসে বলে, স্ত্রীর সঙ্গে সে যৌনসঙ্গমে অপারগ, অতএব তার চিকিৎসা দরকার। সাধারণভাবে পরীক্ষায় তার অক্ষমতার কোনো কারণ ধরা যাচ্ছিল না। তারপর রোগীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, সে স্বেচ্ছায় চিকিৎসার জন্যে আসেনি—এসেছে স্ত্রীর চাপে। যুবকটির অন্য সময়ে যৌন উত্তেজনা, লিঙ্গে স্ফীতি এবং দৃঢ়তা সবই ঠিকমত হয়, স্বমৈথুনও করতে পারে ঠিকভাবে—আগ্রহ নেই শুধু স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে। আরও জানা গেল, কোনো স্ত্রীলোকের প্রতিই তার কোনো যৌন আগ্রহ নেই, কিন্তু যথেষ্ট যৌন আগ্রহ আছে সমবয়সী অথবা তার চেয়ে কমবয়সী ছেলেদের প্রতি।

এই যুবকটির স্ত্রীসঙ্গমে অক্ষমতার কারণ তার সমকামিতা। একে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নিজের ত্রুটিটা তুমি যখন জানতেই, তাহলে বিয়ে করতে গেলে কেন? সংক্ষিপ্ত জবাবটা এই : বাবা-মার কাছে লজ্জায় স্বীকার করতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি অন্যায় হয়ে গেছে।

যৌন অক্ষমতার অনুসন্ধানে তাই যৌন বিকৃতির কথা সবসময়ে মনে রাখা দরকার।

যৌন অক্ষমতার চিকিৎসা

প্রথমতঃ সমস্তরকম পরীক্ষানিরীক্ষা করে সমস্যাটিকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। শারীরিক ব্যাধি অথবা অন্য কোনো মানসিক ব্যাধি নেই এবং কোনো ওষুধ ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে এমন হয়েছে কিনা—এটা বুঝতে হবে। সবশেষে যখন পরিষ্কার বোঝা যাবে যে এই অসুবিধা শুধুমাত্র মানসিক কারণে হচ্ছে, তখন উপযুক্ত যৌন চিকিৎসার (sex therapy) প্রয়োগ করতে হবে। এককভাবে (individual therapy), একত্রে একাধিক রোগীকে একসঙ্গে নিয়ে (group therapy), অথবা যৌনসঙ্গমের

আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার যে চিকিৎসা (behaviour modification therapy), ইত্যাদি চিকিৎসার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এর যে কোনো একটির, বা একাধিক পন্থার একই সঙ্গে প্রয়োগ প্রয়োজন কিনা—সেটা নির্ধারিণ করতে হবে রোগীর অবস্থার সামগ্রিক বিচার করে দেখার পর। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এই চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। এলোমোলোভাবে এসব চিকিৎসা করতে যাওয়া বিপজ্জনক।

সংক্ষেপে এই চিকিৎসার কিছু বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে :

১) সম্ভব ক্ষেত্রে দম্পতির উভয়কেই চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

২) এদের প্রথমেই বুঝিয়ে দিতে হবে, যৌন সঙ্গমের সাফল্য কারো একার কাজ নয়—উভয়কে মিলিতভাবে এই যৌন সম্ভোগের কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হবে—তবেই এর থেকে যথার্থ সুখ আহরণ করা যাবে।

৩) এরপর দেখতে হবে যাতে উভয়ে সহজভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারে—শুধুমাত্র যৌনসমস্যার কথা কিন্তু নয়—দুজনের আলাপ এবং কথাবার্তা এমনভাবে হবে যাতে উভয় উভয়কে সব বিষয়ে বুঝতে পারে এবং তাদের ভালবাসার বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হয়।

৪) যৌনাঙ্গ এবং যৌনক্রিয়ার শারীরতত্ত্ব বিষয় যাতে এরা বুঝতে পারে সেদিক দিয়েও এদের সাহায্য করতে হবে এবং তা করতে হবে খুবই সহজ সাবলীলভাবে।

৫) এরপর এদের বিশদভাবে উপলব্ধি করানো দরকার যৌন উদ্দীপক পূর্বসুখ ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং তার দ্বারা যৌনসঙ্গমের প্রস্তুতি হয় কিভাবে।

৬) এরপর বুঝিয়ে দিতে হবে, ধাপে ধাপে সঙ্গমের শেষ পর্যায়ের প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হতে হবে কিভাবে।

৭) প্রায়ই দেখা যায়, যৌনসমস্যা জড়িয়ে থাকে মানুষের জীবনের নানা জটিল সমস্যার সঙ্গে। সেই কারণেই, যৌন অক্ষমতার চিকিৎসা করতে হলে মনোচিকিৎসা এবং যৌন চিকিৎসা দুটোই একইসঙ্গে করা উচিত।

১৯

কামবিকৃতি

(Sexual Perversion or Sexual Deviations of Paraphilias)

সামাজিক ভাবে বৈধ সম্পর্কিত দুজন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী এবং পুরুষের যৌনসঙ্গমকে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী স্বাভাবিক যৌন-আচরণ বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক জীবনে এর বহুরকম ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের অভ্যাস সাধারণ লোকের মধ্যে অল্পবিস্তর দেখা যায়, তবে যখন যৌন ইচ্ছা পূরণের এটিই একমাত্র পন্থা হয়, অথবা এই অভ্যাসের দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয়, অথবা অন্য কোনভাবে অপরাধ বলে গণ্য হয়—তখনই সেই সব কামবিকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি যায়। বেশির ভাগ যৌনবিকৃতিই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘটে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে কামবস্তু (sexual object) এবং অন্যটি হচ্ছে যৌনক্রিয়া। এই বিকৃতি বহু রকমের আছে, এখানে তার মধ্যে মাত্র কয়েকটির আলোচনা করা হবে।

ক) যৌনক্রিয়ার ব্যতিক্রম থেকে যেগুলির উদ্ভব হয়:

১। বিলসনকাম বা যৌনঅঙ্গ প্রদর্শন (Exhibitionism)
২। আড়িপাতা বা চুপি দেওয়া (Voyeurism or Scopophilia)
৩। ধর্ষকাম (Sexual Sadism)
৪। মর্ষকাম (Sexual Masochism)

খ) যৌনবস্তুকে কেন্দ্র করে যেগুলির উদ্ভব হয়:

১। বিপরীত সাজসজ্জাকামিতা (Transvestism)
২। বসতকামিতা (Fetishism)
৩। বালকামিতা (Paedophilia)
৪। প্রাণীকামিতা (Zoophilia or Bestality)
৫। শবকামিতা (Necrophilia)
৬। সমকামিতা (Homosexuality)

গ) এছাড়া আরও কিছু আছে, যেমন:

১। লিঙ্গ পরিবর্তন কামিতা (Trans-sexualism)
২। ধর্ষণ (Rape)
৩। অজাচার (Incest)

বিলসনকাম বা যৌনঅঙ্গ প্রদর্শন (Exhibitionism)

যৌনসুখের জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের যৌনঅঙ্গ অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রদর্শন করানোর অভ্যাসকে বলা হয় বিলসনকাম (exhibitionism) । বিলসনকাম পুরুষদের মধ্যেই দেখা যায়, স্ত্রীলোদের মধ্যে এই অভ্যাস খুবই কম। এসব পুরুষেরা সচরাচর তাদের যৌনঅঙ্গ দেখাতে চায় স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরকেই। এদের উদ্দেশ্য থাকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, চমক লাগানো অথবা ভয় দেখানো। এরা এমন জায়গায় একাজটি করে যেখান থেকে ইচ্ছা করলে সহজেই পালানো যায়। মেয়েরা অনেক সময়ে এটাকে ধর্ষনের ইঙ্গিত মনে করে ভয় পায়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বিলসনকামীরা ধর্ষনকামী (Rapist) হয় না। অল্পবয়সী যুবকদের মধ্যেই এটা বেশিমাত্রায় দেখা যায়। প্রায়ই এই প্রদর্শনীর পরেই এরা হস্তমৈথুন করে যৌনসুখের সমাপ্তি ঘটায়, আবার কদাচিৎ কখনো প্রদর্শনপর্ব এবং হস্তমৈথুন একই সঙ্গে ঘটানো হয়। পুলিশের কাছে অপরাধের অভিযোগের মধ্যে সম্ভবতঃ এটার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

একজন যুবককে জানতাম যে এক পোড়োবাড়ির বাইরের সিঁড়ি দিয়ে একতলার ছাদে উঠে ওই বাড়ির পাশে একটা কারখানার মেয়ে কর্মীদের নিজের লিঙ্গ দেখাত। কাজটি সে ওই জায়গায় অতর্কিতে মধ্যে মধ্যে করত এবং একটু হই-চই হলেই পালিয়ে যেত—ধরা আর যেত না। একদিন অবশ্য ধরা পড়ে গেল আকস্মিকভাবে।

যুবকটির বাড়ি ওই জায়গা থেকে বহুদূরে। আরও জানা গেল, একাজ সে অন্য জায়গাতেও করত। লোকটি শিক্ষিত এবং একটি অফিসের কর্মী।

কোনরকমে কোর্টকাছারির হাত থেকে সে রেহাই পায় এবং চিকিৎসার জন্যে আসে। যদিও এই ধরনের ব্যক্তির চিকিৎসা সহজসাধ্য নয়, তবুও কিছুদিন সে মনোচিকিৎসা (psychotherapy) এবং আচরণ পরিবর্তনের চিকিৎসায় (behaviour therapy) থাকায় তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। প্রৌঢ় বয়সে অথবা বার্ধক্যে এই স্বভাব দেখা দিলে বুঝতে হবে এটা মস্তিষ্কের কোনো শরীরভিত্তিক ব্যাধি—চিত্তভ্রংশ (dementia)-র লক্ষণ।

বিলসনকামের কারণ কি

নানাতত্ত্ব, নানা মতবাদ দিয়ে এর কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কারণ নির্ণয় এখনও সম্ভব হয়নি—যা সবক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়।

প্রায়ই দেখা যায়, এদের ব্যক্তিত্ব অপরিপক্ক (immature) । এদের মধ্যে যৌনবিষয়ে হীনমন্যতার ভাব থাকে। পুরুষত্ব প্রমাণ করার দিকে একটা প্রবল আবেগ বা জেদ দেখা যায়। সুবিধে থাকলে এরা প্রদর্শনীর সময়ে কখনো কখনো মেয়েদের জিজ্ঞেস করে—'এতবড় লিঙ্গ কখনো দেখেছো ?'

জড়বুদ্ধি (mental retardation) এবং চিত্তভ্রংশ-(dementia)দের মধ্যে এটা বেশি দেখা যায়। এ ছাড়া ম্যানিক এবং সিজোফ্রেনিয়া মনোবিকারের মধ্যেও এই লক্ষণ দেখা যায়। এই সব অবস্থায় যৌন আবেগকে দমন-নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কমে যায়।

সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্বের বিকারের (antisocial personality disorder) মধ্যে এই ধরনের অভ্যাস প্রায়ই দেখা যায়—এদের মধ্যে অবশ্য অন্যান্য সমাজবিরোধী মনোভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

এদের চিকিৎসা খুব সহজসাধ্য নয়। ভালভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা দরকার। এই সঙ্গে কোনো শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি থাকলে সম্ভব ক্ষেত্রে তার চিকিৎসা অবশ্যই করা দরকার। শুধুমাত্র এই স্বভাবের পরিবর্তনের জন্য কোনো চিকিৎসা এখনও জানা নেই। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য মনোচিকিৎসায় (psychotheraphy), আচরণ পরিবর্তনের চিকিৎসায় (behaviour therapy) সুফল পাওয়া যায়।

আড়িপাতা বা চুপি দেওয়া (Voyeurism or Scopophilia)

যৌনসুখ পাবার আশায় গোপনে অন্যের যৌনঅঙ্গ অথবা যৌনসঙ্গম দেখার অভ্যাসকেই আড়িপাতা বলা হয়। সাধারণতঃ কিশোর এবং অল্পবয়সী যুবকদের মধ্যেই এই অভ্যাস বেশি দেখা যায়। দেখার সময়ে অথবা তার অব্যবহিত পরে স্বমৈথুন দ্বারা এরা যৌনসুখ উপভোগ করে। যথেষ্ট সন্তর্পণে এরা একাজ করে, যাতে যাদের দেখেছে, তারা যেন টের না পায়। স্নানের ঘর অথবা শোবার ঘরের কোনো রন্ধ্র (ছিদ্র) থাকলে তার মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা হয়। যাদের এরা দেখে, তারা টের না পেলেও, অন্য লোকের হাতে এরা প্রায়ই ধরা পড়ে। এই অভ্যাস যখন বেশি মাত্রায় থাকে, অথবা এটিই যৌনসুখ পাবার একমাত্র পন্থা হয়—তখন একে অস্বাভাবিক বলা হয়। অন্যথায় এই ধরনের অভ্যাস শৈশব থেকে প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত অনেকের মধ্যে দেখা যায়। নবদম্পতিদের শোবার ঘরের আশেপাশে আড়িপাতা সব বয়সের মেয়েদের মধ্যেই প্রায় প্রচলিত প্রথার মত। পার্কে পাথরের নগ্ন নারী মূর্তি, মঞ্চের ওপর সুন্দরী যুবতীর অঙ্গাবরণ ক্রমে ক্রমে উন্মোচনের (striptease) দ্বারা দর্শকদের মনোরঞ্জন, এসব তো সমাজগ্রাহ্য। তবে কেউ কেউ বলবেন, এর দোষ নেই—এ সবই শিল্প। এ ছাড়া অশ্লীল চিত্রের পত্রিকা এবং নগ্ন স্ত্রী-পুরুষ দ্বারা অভিনীত অশ্লীল সিনেমা (Blue Film) , ইত্যাদি একটু গোপনে প্রচলিত হলেও সর্বজনবিদিত।

সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে মানুষের যৌন প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যে প্রয়াস, তা সত্ত্বেও নির্জ্জন মনের সুপ্ত যৌন বাসনা নানা ভাবে তার অদম্য শক্তি নিয়ে পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে। এই সব যৌনবিকৃতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই সুপ্ত যৌন প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ কৌশল।

এর কারণ কি

ঠিক কি কারণে এই বিকৃতি হয় তা নির্দিষ্টভাবে জানা নেই। তবে এটা দেখা যাচ্ছে, যেখানেই সহজ সামাজিক নিয়মে চলার পথে অসুবিধা, সেখানেই বিকল্প পথের সন্ধান চলে। যে সব ব্যক্তির কাছে এই আড়িপাতার মাধ্যমই যৌনসুখ পাবার একমাত্র উপায়, তারা নিজেদের যৌনক্ষমতায় হীন মনে করে এবং গোপনে দেখার মধ্যে দিয়ে এইভাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে যে একটা কিছু তো করতে পারলাম। সমাজও এই অভ্যাসকে অতটা অপরাধমূলক মনে করে না বলেই সেটাও একদিকে কিছু উৎসাহ জোগায়। 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' সিনেমার মধ্যে এই ধরনের ইচ্ছার পরিপূরণের পথ

থাকলেও কিছু লোক আরও বেশি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা চায় এবং গোপনীয়তা তাদের উত্তেজনাকে আরও বৃদ্ধি করে।

চিকিৎসা

এই ধরনের যৌন বিকৃতির জন্যে খুব কম ব্যক্তিই চিকিৎসার জন্যে আসে। চিকিৎসার ধরন বিলসনকামের মতই।

ধর্ষকাম (Sexual Sadism)

যৌনসঙ্গীকে যন্ত্রণা দিয়ে যৌন উত্তেজনা অথবা যৌনসুখ ভোগ করার রীতিকে ধর্ষকাম বলা হয়।

যন্ত্রণা দেবার পদ্ধতি নানা রকমের। বেতমারা, কামড়ানো, চিমটি কাটা, বেঁধে রাখা, গালাগাল দিয়ে অথবা অপমান করে অথবা অন্য ভাবে নির্যাতন করা। এই যৌনবিকৃতি পুরুষদের মধ্যেই প্রধানতঃ দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইভাবে যন্ত্রণা দেওয়ার পর বাস্তবিক যৌনসঙ্গমের দ্বারা এরা চরম সুখ উপভোগ করে, অথবা শুধুমাত্র নির্যাতন করে চরম যৌন সুখ পায়। ধর্ষকামী পুরুষ কখনো কখনো স্ত্রীলোকের শরীরে ক্ষুর দিয়ে কেটে, ছুঁচ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে, অথবা গরমে ছেঁকা দিয়ে যৌনসুখ পায়। এমনও দেখা যায় যে, মেয়েদের ব্যবহার করা জিনিস যেমন জুতো, সায়া, ব্লাউজ, ইত্যাদিকে ছিঁড়ে, কেটে, টুকরো টুকরো করে যৌনসুখ পায়, এরা জীবজন্তুর ওপরেও নির্যাতন করে একই সুখ পায়। ধর্ষকামী সমকামী (homo-sexual)-ও হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তার পুরুষ সঙ্গীকে একই ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ধর্ষকমী কখনো কখনো তার স্ত্রী সঙ্গীকে হত্যা করে যৌনসুখ ভোগ করে, এদের এই হত্যার রীতিতে যৌন অঙ্গের ওপর আঘাত হানবার প্রবণতা বেশি।

এর কারণ কি

নির্দিষ্ট কারণ জানা নেই। এই ধরনের যৌনবিকৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে শৈশবের-অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, বলা হয়েছে কোনোভাবে শারীরিক নির্যাতন এবং যৌন সুখ ভোগের ঘটনা একই সঙ্গে যদি ঘটে, তাহলে পরবর্তীকালে ওই ব্যক্তি ধর্ষকামী হয়ে যেতে পারে।

যৌনসুখে বিতৃষ্ণা এবং ধ্বজভঙ্গের ভয় থেকে এরকম যৌনবিকৃতি হতে পারে।

অন্যান্য মানসিক রোগের সঙ্গেও যেমন—সিজোফ্রেনিয়া অথবা ম্যানিয়াতে ধর্ষকাম থাকতে পারে।

চিকিৎসা

মনোচিকিৎসা এবং আচরণ পরিবর্তনের চিকিৎসা এদের ক্ষেত্রে সম্ভব। যদি যথেষ্ট আগ্রহ থাকে, তাহলে সফলতাও যথেষ্ট ভাবে পাওয়া যায়।

মর্ষকাম (Sexual Masochism)

শুধু নিজের ওপর নির্যাতন ভোগের মাধ্যমে যৌনসুখ আহরণের রীতিকে মর্ষকাম বলা হয়।

ধর্ষকামের মতই এক্ষেত্রে নানা রকম দৈহিক ও মানসিক পীড়ার মাধ্যমে যৌনসুখ ভোগ করা হয়। আংশিক শ্বাসরোধের দ্বারা যৌনসুখ উপভোগের রীতিও কখনো মর্ষকামীদের মধ্যে দেখা যায়। এই ধরনের পন্থা যথেষ্ট বিপজ্জনক এবং এর ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

কারণ এবং চিকিৎসা

ধর্ষকামের কারণ এবং চিকিৎসার মতই।

বিপরীত সাজসজ্জাকামিতা (Transvestism)

এই যৌনবিকৃতি পুরুষদের মধ্যেই সাধারণতঃ দেখা যায়। এইসব পুরুষেরা একমাত্র স্ত্রীলোকের মত সাজসজ্জা করেই যৌনসুখ ভোগ করে। সমকামী (homosexual) অথবা যৌনঅঙ্গ পরিবর্তনকামীদেরও এই ধরনের সাজসজ্জা করতে দেখা যায়—যদিও এর থেকে তারা যৌনসুখ পায় না। অনেক বিবাহিতও থাকে এদের মধ্যে এবং বাস করে স্ত্রী সন্তানাদির সঙ্গে—স্ত্রীরা এই অভ্যাস পছন্দ না করলেও মেনে নেয়। সাধারণতঃ এই বিকৃতি বয়ঃসন্ধিক্ষণ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বাড়ে। প্রথমে হয়ত শুরু হয় সায়া অথবা ব্লাউস দিয়ে, তারপর বাড়তে বাড়তে মেয়েদের সবরকম পরিচ্ছদ পরতে থাকে—কপালে টিপ, ঠোঁটে লিপষ্টিক, ইত্যাদিও শুরু হয়ে যায়। তবে এরা সাধারণতঃ এটা করে গোপনে,ঘরের মধ্যে আয়নার সামনে বসে উপভোগ করে। বাইরে বেশি সমালোচনার মধ্যে যেতে চায়না, বিব্রত হয় শুধু এদের স্ত্রীরা।

এর কারণ কি

কোনো নির্দিষ্ট কারণ জানা নেই।

চিকিৎসা

মনোচিকিৎসা এবং আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসা এতে প্রয়োগ করা হয়।

বস্তুকামিতা (Fetishism)

এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা যৌন সুখ আহরণ করে প্রধানতঃ দেহের কোনো অংশ অথবা বিশেষ কোনো জড়বস্তুকে নিয়ে ; এসব ব্যক্তিদের বস্তুকামী বলা হয়। পুরুষদের মধ্যেই এই বিকৃতি প্রধানতঃ দেখা যায়। যৌনক্ষুধার তৃপ্তির জন্যে এরা মেয়েদের স্তন,

চুল, হাত, পা, কান, মেয়েদের ব্যবহৃত নিম্নাঙ্গের বসন, জুতো, মোজা, রুমাল, প্রসাধনদ্রব্য, ইত্যাদি বেছে নেয়। কিভাবে ব্যবহার করবে এই সব বস্তুকে, তার কোনো নির্দিষ্ট রীতি নই। তবে সাধারণতঃ চুমো দেওয়া, হাত বোলানো, গায়ে ঘষা, জিভ দিয়ে চাটা, গন্ধ শোঁকা, ইত্যাদি দেখা যায়। কখনো কখনো ওই বস্তুকে সামনে রেখে স্বমৈথুন করে চরম যৌনসুখ ভোগ করে। চুরি করেও সংগ্রহ করে এসব বস্তু।

এর কারণ কি

এখানেও কোনো নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা

মনোচিকিৎসা এবং আচরণ পরিবর্তন করার চিকিৎসা প্রধানতঃ প্রয়োগ করা হয়।

বালকামিতা (Paedophilia)

যে সব ব্যক্তি যৌনসুখের জন্য শিশুসঙ্গ পছন্দ করে, তাদের বালকামী (paedophiliac) বলা হয়। এরা অন্যভাবে যৌনসুখ ভোগের চেয়ে এই পন্থাতেই বেশি আগ্রহী অথবা এটি তাদের একমাত্র উপায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা পুরুষ। যৌনসুখ ভোগ করার জন্য শিশুর যৌনঅঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করা, শিশুকে দিয়ে লিঙ্গ চোষানো ছাড়াও কখনো কখনো শিশুর যোনিতে অথবা গুহ্যদ্বারে লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সুখভোগে প্রবৃত্ত হয়। তবে এতে পূর্ণ সঙ্গম হয় না। শেষে স্বমৈথুন দ্বারাই এরা যৌনসুখ ভোগ করে। বালকামী অল্পবয়সী যুবা হলে তারা কিশোরীদের পছন্দ করে, আর অপরাধী যদি বেশি বয়সের হয়, তাহলে তারা আরও ছোট শিশুদের পছন্দ করে। এরা অনেক সময় বিবাহিত এবং সন্তানের জনক। শিশুরা প্রায়ই অপরাধীদের অপরিচিত। শিশুর অভিভাবকেরা সম্মান বাঁচানোর জন্য প্রায়ই পুলিশে অভিযোগ করে না। কোনো কোনো শিশুরা এই কাজে সহযোগিতাও করে, এমন বলা হয়, তবে সেটা কতটা স্বেচ্ছায় আর কতটা ভয়ে সেটা বলা কঠিন। যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয়, এতে শিশুর কোনো স্থায়ী মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না, তবে শারীরিক আঘাতের মাত্রা বেশি জানাজানি হলে শিশুর আত্মসম্মানের হানি ঘটে এবং তাতে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। শিশু যৌনসঙ্গী ছেলে বা মেয়ে, দুই-ই হতে পারে।

এর কারণ কি

নির্দিষ্টভাবে জানা নেই। অপরাধীদের ব্যক্তিত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপরিপক্ক থাকে—এরা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভয় পায়। উপযুক্ত যৌনসঙ্গীর অভাবেও বালকামিতার প্রতি আগ্রহ আসতে পারে। অনাথ আশ্রমের পুরুষকর্মীদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এই স্বভাব গড়ে ওঠে। অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে এই স্বভাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিছু কিছু মানসিক ব্যাধিতে এই স্বভাব দেখা যায়—যেমন,

সিজোফ্রেনিয়া, চিত্তভ্রংশ (dementia), ম্যানিয়া, ইত্যাদি।

প্রাণীকামিতা (Zoophilia or Bestiality))

যৌনসুখের জন্য অন্য পন্থা অপেক্ষা জীবজন্তুকে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে প্রাণীকামিতা বলা হয়। এটিই একমাত্র পন্থা, এরকম অবশ্য কম দেখা যায়। গৃহপালিত জীবজন্তু, যেমন, গরু, ভেড়া, ছাগল, ইত্যাদি এবং পোষা জন্তুও যেমন, কুকুর, বেড়াল, বানর, ইত্যাদিকে যৌন উত্তেজনার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সব জীবজন্তুদের দিয়ে যৌনঅঙ্গ লেহন করানো বা চোষানো, এবং যৌনসঙ্গম, স্বমৈথুন, ইত্যাদি দ্বারা যৌনসুখ ভোগ করা হয়।

স্বাভাবিকভাবে যৌনসুখ ভোগের পথ যেখানে রুদ্ধ, সেখানে জীবজন্তুকে ব্যবহার করার সুযোগ থাকলেই কখনো কখনো এই যৌনবিকৃতি দেখা যায়।

চিকিৎসার জন্য প্রায়ই আসে না।

শবকামিতা (Necrophilia)

শবকামিতা অত্যন্ত বিরল ঘটনা, শবদেহের ওপর যৌন সঙ্গমকে শবকামিতা বলা হয়। এই ধরনের ঘটনার সঠিক বিবরণ খুব কমই পাওয়া যায় এবং কারণ সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বলা যায় না।

সমকামিতা(Homosexuality)

প্রধানতঃ অথবা একান্তভাবে যখন এক পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে অথবা এক স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়—তখন তার নাম সমকামিতা।

একই ব্যক্তির মধ্যে সমকামিতা এবং অসমকামিতা (ইতরবৃত্তি) দুই-ই থাকতে পারে। মাত্রা অনুসারে প্রধানতঃ সমকামী, অথবা প্রধানতঃ অসমকামী, অথবা আপেক্ষিকভাবে নানা মাত্রার সমকামিতা থাকতে পারে। সম্ভোগের উপায় হিসাবে পরস্পরের মৈথুন, মুখ দিয়ে লিঙ্গ লেহন এবং চোষণ, অথবা পায়ুকাম (sodomy) দ্বারা যৌন ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করা হয়।

সমকামিতার সম্পর্ক অসমকামিতার মত দীর্ঘদিন একই সঙ্গী নিয়ে স্থায়ী হয় না। কখনো দেখা যায়, দুই সঙ্গী পর্যায়ক্রমে সক্রিয় এবং নিক্রিয় সঙ্গী হিসাবে ব্যবহার করে, আবার কোনো কোনো সময়ে একজন সঙ্গী সব সময় হয় সক্রিয় নয় নিক্রিয় সঙ্গী হিসাবে যৌনক্রিয়ায় অংশ নেয়। যারা সব সময়ে সক্রিয় সঙ্গীর অংশ নেয়, তারা প্রায় সমাজে অধিক পুরুষালিভাবে চলে, আর যারা সব সময়ে নিক্রিয় সঙ্গীর অংশ নেয়, তাদের মধ্যে মেয়েলিপনা বেশি দেখা যায়।

মেয়েদের সমকামিতাকে লেসবিয়ানিজম্ (Lesbianism) বলা হয়।

কোনো কোনে দেশে সমকামিতা যৌন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়, আবার কোনো দেশে যদি ২১ বছরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি উভয়ের সম্মতি অনুসারে গোপনীয়তা বজায় রেখে সমকামিতাতে লিপ্ত হতে থাকে, তাহলে সেটা আইনসঙ্গত বলে পরিগণিত হয়।

সমকামিতার সঙ্গে সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্ব (antisocial personality) থাকতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, অল্প বয়েসে সমকামিতা থাকলেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমকামিতা কমে যায় এবং পূর্ণমাত্রায় অসমকামী হয়ে যায়।

এর কারণ কি

বংশগত এবং শিশুর লালন পালন পদ্ধতি, এই দুয়েরই সমকামিতার কারণ হিসেবে দেখা যায়। যমজদের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, মনোজাইগটিক যমজ (monozygotictwin)দের[১] একজনের সমকামিতা থাকলে অন্যজনেরও সমকামিতা থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি হয়। শিশু পালন পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু থাকে, যেমন অসমকামিতার প্রতি কড়া দমননীতির দ্বারা পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব, এগুলির ফলেও এরকম হতে পারে।

যৌন পরিবর্তনকামিতা (Transsexualism)

যৌন পরিবর্তনকামীদের দৃঢ় ধারণা যে মানসিকভাবে তারা তাদের শারীরিক যৌনাঙ্গের বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তি। অর্থাৎ দৈহিক ভাবে যে পুরুষ লিঙ্গের অধিকারী তার মনে বদ্ধ ধারণা থাকে যে সে একজন নারী ; তেমনই একজন শারীরিক ভাবে স্ত্রীলোক নিজেকে পুরুষ মনে করে।

এরা নিজেদের দেহের পরিবর্তন করে এদের বিপরীত মত দেহে জীবন যাপন করতে চায়। এরা হরমোন এবং শল্য চিকিৎসার (hormone and surgical treatment) সাহায্যে দেহের পরিবর্তন করার আগ্রহ নিয়ে ডাক্তারদের কাছে যায়। এদের মধ্যে পুরুষের দেহধারীর সংখ্যা বেশি হলেও স্ত্রীদেহধারিনীদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়।

এরা দেহ পরিবর্তনের এত আগ্রহ দেখালেও বাস্তবিক যৌন ইচ্ছা এদের কম এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌন অঙ্গকে এরা ঘৃণা করে।

কোনো কোনো সময়ে এরা লিঙ্গ পরিবর্তনে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে যে, ডাক্তারদের বা অভিভাবকদের সাহায্য-সহানুভূতি না পেলে নিজেরাই নিজেদের লিঙ্গ কেটে ফেলতে উদ্যত হয়, অথবা আত্মহত্যা প্রবণ হয়ে ওঠে।

এদের চিকিৎসা করা খুবই শক্ত। লিঙ্গ পরিবর্তনের অদম্য বাসনা থেকে এদের বিরত করা প্রায় অসম্ভব। এই টুকুই শুধু এদের বোঝানো যায় যে, শল্য চিকিৎসার দ্বারা লিঙ্গ পরিবর্তন এবং হরমোনের সাহায্যে কখনোই সম্পূর্ণভাবে স্ত্রী বা পুরুষ হতে এরা পারবে না। এই ধরনের অপারেশনের খবর বা আলোচনা কোনো পত্র-পত্রিকায় বের হলে এদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এরা এই ধরনের চিকিৎসার খারাপ দিকটা একেবারেই দেখতে চায় না। তারা চায় যা পাওয়া যায় তাতেই খুশি হতে এবং মনে করে যে জন্ম হয়েছে যে লিঙ্গ

[১] স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই জনন কোষের (genmatic) মিলনের ফলে জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ একটি জাইগোট থেকে একটি শিশু উৎপন্ন হয়। একই সঙ্গে একটি স্ত্রীলোকের গর্ভে দুটি শিশুর জন্ম হলে এই শিশু দুটিকে বলা হয় যমজ। দুটি ভিন্ন জাইগোট থেকে দুটি শিশু জন্মালে তাকে বলা হয় ডাইজাইগোটিক যমজ (dizygotic twin) এবং যখন একটি জাইগোট থেকে দুটি শিশু জন্মায় তখন তাকে বলা মনোজাইগোটিক যমজ (monozygotic twin)।

নিয়ে তা বহন করে নিয়ে যাওয়া দুর্বিসহ।

এর কারণ কি

আজও জানা যায়নি। বংশগত কারণের যেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তেমনি লালন পালন পদ্ধতির মধ্যেও কোনোরকম অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ধর্ষণ বা নারীধর্ষণ (Rape)

যখন কোনো পুরুষ ভয় দেখিয়ে, বলপ্রয়োগ করে অথবা প্রতারণার দ্বারা কোনো স্ত্রীলোকের (বা বালিকার) সঙ্গে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যৌনসঙ্গম করে, তখন তাকে ধর্ষণ বলা হয়। স্ত্রীলোকটির বয়স ১৬ বছরের কম হলে স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক সেটা ধর্ষণ বলে গণ্য করা হয়।

ভোজসভায় যথেষ্ট মদ্যপানের পর ধর্ষণের ঘটনা কোনো কোনো সময়ে ঘটে। অনেক সময় একদল যুবক একজন যুবতীকে রাস্তা থেকে জোর করে তুলে এনে গণধর্ষণ করতেও দ্বিধা করে না। কখনো কখনো দেখা যায় ধর্ষণকারীর সঙ্গে স্ত্রীলোকটির পূর্ব পরিচয় ছিল। কোনো কোনো সময়ে দেখা যায় নিষ্ঠুরভাবে শারীরিক নির্যাতনের পর ধর্ষণকারী যৌনসঙ্গম করছে। এই যৌন অপরাধ যে কতরকম পন্থায় ঘটতে পারে, তা বলে শেষ করা যায় না। এই অপরাধের সঙ্গে মদ্যপানের যে একটা ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক আছে, তা প্রায়ই দেখা যায়। মানসিক রোগের বশে এই অপরাধ ঘটতে পারে, কিন্তু তার সংখ্যা নগণ্য।

অজাচার (Incest)

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে যৌন সম্পর্কের নাম অজাচার। এই ঘটনা ভাইবোন, মা ছেলে, অথবা বাপ-মেয়ে এদের মধ্যে ঘটে। আইনে এটা দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এই ঘটনা খুব বিরল নয় এবং এই ধরনের ঘটনা নিয়ে সচরাচর পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয় না। কারণ বেশি জানাজানি হলে পারিবারিক কলঙ্কের ভয় থাকে। বহু প্রাচীনকালে কোনো কোনো সমাজে ভাই-ভগ্নীতে বিবাহ প্রচলিত থাকলেও আজকাল পৃথিবীর কোথাও কোনো সমাজই অজাচারকে সমর্থন করে না।

২০

ব্যক্তিত্বের বিকার (Personality Disorders)

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে যা তার নিজের এবং বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠানকে দৃঢ়ভাবে নির্ধারণ করে। এই বৈশিষ্ট্যকেই ব্যক্তিত্ব বলা হয় এবং ব্যক্তির এই বিশেষত্ব দিয়েই একের সঙ্গে অন্যের ভিন্নতার বিচার করা হয়। এই ব্যক্তিত্ব তার শরীর-মনের সামগ্রিক গঠন এবং কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তিত্বের এই গঠন এক দিক থেকে তার বংশগত সুপ্ত সম্ভাবনা আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যখন এমন কিছু বিশেষত্ব থাকে যা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতাকে খর্ব করে এবং তা ওই ব্যক্তি কিম্বা সমাজের অন্যদের পক্ষে পীড়াদায়ক বা ক্ষতিকারক হয়, তখনই ওই ধরনের ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তিত্বের বিকার বলা হয়। ব্যক্তিত্ব বিকারের লক্ষণ শৈশবে অথবা বয়ঃসন্ধিক্ষণের মধ্যেই প্রকট হয় এবং প্রায় জীবনভোরই থাকে, তবে বার্ধক্যে এগুলি স্পষ্টভাবে আর দেখা যায় না।

এখানে এমন কতকগুলি ব্যক্তিত্ব বিকারের আলোচনা করা হবে, যেগুলি সাধারণতঃ প্রায়ই দেখা যায় : যেমন-

১। সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্ব (Paranoid Personality)
২। সিজয়েড (চিত্তভ্রংশী) ব্যক্তিত্ব (Schizoid personality)
৩। আবেগমূলক ব্যক্তিত্ব-বিকার (Affective personality disorder)
৪। উৎকণ্ঠা প্রবণ ব্যক্তিত্ব (Anxious personality)
৫। অহঙ্কারী ব্যক্তিত্ব (Narcissistic personality)
৬। অবসেসনাল ব্যক্তিত্ব (Obsessional personality)
৭। হিস্টিরিয়নিক ব্যক্তিত্ব (Hysterionic personality)
৮। নির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব (Dependent personality)
৯। সমাজ বিরোধী ব্যক্তিত্ব (Anti-social personality)

১। সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্ব (Paranoid Personality)

এক ধরনের লোক আছে যারা অহেতুক মনে করে অন্য লোকে তাদের পেছনে লাগছে, ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। এরা সন্দেহ করে অন্য লোকে কেবল তাদের নিজেদের

স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এদের কাজে লাগায়। এরা নিজেদের আত্মীয়, বন্ধু অথবা সহকর্মীদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। স্বামী অথবা স্ত্রী-র চরিত্রে সন্দেহ করে দাম্পত্য জীবনকে বিষিয়ে তোলে। অতি তুচ্ছ কারণে এরা অপমানিত বোধ করে। কেউ এদের অপমান করছে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে এমন মনে হলে এরা সে কথা ভুলে যেতে পারে না, প্রতিশোধের সুযোগ খোঁজে। এরা কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস করে কাউকে কোনো কথা বলে না, পাছে কেউ তা জেনে নিয়ে ওদেরই ক্ষতি করে বসে। এরা সব সময়ে সতর্কভাবে চলা ফেরা করে এবং কারও ওপর কোনো কারণে এতটুকু সন্দেহ হলেই সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সাবধানতার বর্ম দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখে। কেউ কোনো ষড়যন্ত্র করছে, এমন সন্দেহভাজনদের ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে। এই সব সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিরা নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলাফেরা করে অতি সাবধানে এবং সতর্কভাবে লক্ষ্য করে অন্যদের গতিবিধি। এরা তিলকে তাল করে দেখতে এবং নিরর্থক ঝগড়াঝাঁটি করতে অতিশয় অভ্যস্ত। অন্যের দোষ দেখতে এরা নিদারুণ ব্যগ্র হলেও নিজেদের বিরূপ সমালোচনা বরদাস্ত করতে পারে না একেবারেই। অন্যের সঙ্গে অধিক হৃদ্যতা এরা চায় না। নিজেদের প্রাধান্য যেখানে নেই, সেখানে এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মিলেমিশে কাজ করতে পারে না।

এদের সন্দেহ প্রবণতার ভাব কিশোর বয়স থেকেই বোঝা যায় এবং সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে। এর কারণ নির্দিষ্ট ভাবে এখনও কিছু জানা যায়নি।

ওষুধ প্রয়োগের চিকিৎসায় এদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে মনোচিকিৎসা (psychotherapy) সম্ভব হলে তাতে কিছু সুফল পাওয়াও যেতে পারে।

২। সিজয়েড (চিত্তভ্রংশী) ব্যক্তিত্ব (Schizoid Personality)

এদের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা আত্মকেন্দ্রিক, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশায় অনাগ্রহ এবং কল্পনাপ্রবণ। আন্তরিকতার অভাবের জন্য এদের সঙ্গে অন্যদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না। এদের স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা প্রকাশের ক্ষমতারও অভাব থাকে। অসামাজিক মনোভাব এবং রসবোধের অভাব এদের মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

সিজোফ্রেনিয়ার সঙ্গে সিজয়েড ব্যক্তিত্বের কি সম্পর্ক, সে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরা সকলে একমত নন।

এই ব্যক্তিত্বের কারণও সঠিকভাবে জানা যায়নি।

সাধারণতঃ এই ব্যক্তিরা চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে আসে না। তবে সীমিত সামাজিক পরিবেশে এরা কাজকর্ম মোটামুটি ঠিকই করে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ব্যাপী মনোচিকিৎসায় সুফল পাওয়া যেতে পারে এবং এই ধরনের চিকিৎসা চলাকালীন দেখা দরকার যেন এদের আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে এবং বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে না হয়।

৩। আবেগমূলক ব্যক্তিত্ব বিকার (Affective Personality Disorder)

এই ধরনের ব্যক্তিত্ব বিকার তিন রকমের হতে পারে :
ক) বিষণ্নতা প্রবণ ব্যক্তিত্ব (depressive personality)
খ) ফুর্তিবাজ ব্যক্তিত্ব (hyperthymic personality) এবং
গ) আবর্তনশীল ব্যক্তিত্ব (cyclothymic personality)।

ক। বিষণ্নতাপ্রবণ ব্যক্তিত্ব (Depressive Personality)

এই ধরনের ব্যক্তিত্বের লোকেরা সর্বদাই বিমর্ষ, নৈরাশ্যবাদী, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং কাজকর্মে তৎপরতাহীন। সব কিছুতেই এরা খারাপ দিকটাই বড় করে দেখে এবং ভবিষ্যতের কাল্পনিক দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে বিচলিত হয়। এরা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না এবং জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব পোষণ করে। সাধারণতঃ নীতিবোধ এবং কর্তব্য পরায়ণতার দিকে এদের সজাগ দৃষ্টি থাকে।

খ। ফুর্তিবাজ ব্যক্তিত্ব (Hyperthymic Personality)

এরা বেশি আশাবাদী হয়, ফুর্তি আর হই-চই এর মধ্যে থাকতে ভালবাসে এবং জীবনকে উপভোগ্য মনে করে। এদের বিচারবুদ্ধি অনেক সময়ে দুর্বল হয় এবং সব দিক বিবেচনা না করেই চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে ; বেশি চিন্তা-ভাবনার তোয়াক্কা করে না, তবে উদ্দেশ্য সফলে বাধা পেলেই হতাশ হয়ে পড়ে।

গ। আবর্তনশীল ব্যক্তিত্ব (Cyclothymic Personality)

এরা কিছুদিন বিষাদে কাটায়, কিছুদিন ফুর্তিতে চলে, আবার কিছুদিন স্বাভাবিকভাবে থাকে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে এদের জীবনপট পরিবর্তন হতে থাকে।

এই ধরনের আবেগমূলক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আবেগ বিকার (affective disorder)-এর কিছু বংশগত সম্পর্কও দেখা যায়। শুধুমাত্র এই রকম ব্যক্তিত্ব বিকারের জন্যে কেউ চিকিৎসকের কাছে আসে না। পূর্ণমাত্রায় আবেগ বিকার (affectivie disorder) দেখা গেলে তখনই চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়।

৪। উৎকণ্ঠাপ্রবণ ব্যক্তিত্ব (Anxious Personality)

সব কিছুতেই এদের দুশ্চিন্তা, বিপদের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেখতে এরা অভ্যস্ত ; তিলকে তাল করে দেখতে এদের জুড়ি নেই, সব সময়েই এরা ভয়-ভীতি-আতঙ্কের মধ্যে থাকে এবং আশ্বাস ছাড়া এরা চলতে পারে না।

এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানা নেই। ওষুধ প্রয়োগে বিশেষ কিছু সুবিধে হয় না। একমাত্র মনোচিকিৎসা-(psychotherapy)তে কিছু ভাল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫। অহঙ্কারী ব্যক্তিত্ব (Narcissistic Personality)

এই ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা নিজেদের অহেতুক অত্যন্ত বড় মনে করে যেটা তাদের চাল-চলনে কথা-বার্তায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এরা উদ্ধত প্রকৃতির হয়, সব সময়ে নিজেদের প্রশংসা চায় এবং নিজেদের বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। শক্তি আর সামর্থ্যে, সৌন্দর্যে আর মেধায়, দক্ষতায় এবং অন্য সব বিষয়েই এরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। অন্যের সাফল্যকে এরা ঈর্ষার চোখে দেখে। যেখানে কিছু পাবার আশা, এরা বন্ধুত্ব পাতায় শুধু সেইখানেই। খুবই উঁচু পর্যায়ের লোককে এরা সম্মান দেয়, কিন্তু ঘৃণা করে তাদের যারা একটু নীচু মানের। এদের সঙ্গে হিস্টিরিয়নিক (অসংযত আবেগী) ব্যক্তিত্বের মানুষদের অনেক মিল পাওয়া যায়।

অহঙ্কার প্রবণ ব্যক্তিত্ব কি কারণে হয়, সে সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি।

ওষুধ প্রয়োগে এর কোনো প্রতিকার হয় না। একমাত্র মনোচিকিৎসাতেই কিছু সুফল পাওয়া যায়।

৬। অবসেসনাল ব্যক্তিত্ব (Obsessional Personality)

এই ব্যক্তিত্বের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা সব জিনিসই নিখুঁতভাবে করতে চায়, কিন্তু নিখুঁতভাবে করতে গিয়ে অনেক কাজই শেষ করে উঠতে পারে না। খঁতখুঁতে মনোভাবের দরুন ক্ষুদ্র অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি বেশি দৃষ্টি দিতে গিয়ে কোনো জিনিসকে পছন্দ করে উঠতে পারে না। কাজ করতে গিয়ে কোন কাজে কতটা সময় দিতে হবে, সেটা ঠিক রাখতে পারে না। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে ক্ষুদ্র বিষয়ে অধিক সময় ব্যয় করে ফেলে, বৃহৎ বিষয়ের উপযুক্ত সময় আর কুলিয়ে উঠতে পারে না। নিয়মানুবর্তিতা, সময় নিষ্ঠতার প্রতি অনমনীয় দৃঢ়তা রাখতে গিয়ে এরা ব্যবহারিক জীবনে সামঞ্জস্য করে চলতে পারে না। কোনো বিষয়ে কর্মপন্থা ঠিক করতে এদের অস্বাভাবিক দেরি হয়। এরা উদারহীন গোঁড়ামির প্রতি এত বেশি আসক্ত যে নিজেদের মতবাদ যতই অবাস্তব আর অযৌক্তিক হোক না কেন, সেখান থেকে তাদের টলানো কঠিন। এরা প্রায়ই কৃপণ স্বভাবের হয়। স্নেহ-ভালবাসার আদান-প্রদানে যথেষ্ট সঙ্কোচ থাকার জন্যে এদের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা খুবই সীমিত হয়। মনের আবেগের বহিঃপ্রকাশেরর অভাবের জন্যে এদের নীরস ব্যক্তি বলে মনে হয়। আনন্দ উৎসবের মাতামাতি করতে এরা পছন্দ করে না মোটেই। অত্যন্ত অধ্যবসায়ী হয় বলে এই ব্যক্তিত্বের মানুষরা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করার সুযোগ পেলে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে—কিন্তু বিচলিত হয় কাজের বা কর্মস্থলের পরিবর্তন ঘটলেই। নিজেদের দিনপঞ্জী বিস্তারিত ভাবে লিখতে পছন্দ করে এরা। নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে সম্পন্ন করার পক্ষপাতী হয় এরা। কথিত আছে, বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট এমন নির্দিষ্ট সময়ে পথে যাতায়াত করতেন যে তাঁকে দেখে সবাই ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিত।

এই ব্যক্তিত্বের মানুষদের মধ্যে বিমর্ষ রোগের প্রাদুর্ভাব বড় বেশি দেখা যায়।

কোনো কোনো সময়ে চিকিৎসা ছাড়াই এদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে যায় ; কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে এই সব মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটানো কঠিন। ওষুধ প্রয়োগে তেমন কিছু কাজ হয় না। একমাত্র মনোচিকিৎসায় (psychotherapy) এবং আচরণ

পরিবর্তনকারী চিকিৎসায় কিছু সুফল পাওয়া যায়।

৭। হিস্টিরিয়নিক ব্যক্তিত্ব (Hysterionic Personality)

এদের আচার আচরণে এমন কিছু হাবভাব প্রকাশ পায় যাতে অন্য লোকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এরা প্রায়ই নানারকম শারীরিক অক্ষমতা এবং ব্যথা-যন্ত্রণার অভিযোগ করে—যেগুলোর কোনো শরীরভিত্তিক কারণ বের করা যায় না। এদের ব্যবহার অন্যদের প্রলুব্ধ করে, কিন্তু তার মধ্যে কোনো গভীর আন্তরিকতা থাকে না, থাকে শুধুমাত্র ছলনা। এরা আসল প্রেমের পরিবর্তে প্রেমের ভান করতে খুব দক্ষ। নিজেদের মধ্যে একটা নিরাপত্তা বোধের অভাবের জন্যে ভালবাসা অর্জনের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজেদের ওপরেই যথেষ্ট সন্দেহ থাকে, তাই এরা বাইরের চাকচিক্য দিয়ে, নায়কী ভাবভঙ্গী দিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের ভেতরের দুর্বলতাকে ঢাকার চেষ্টা করে। বাইরে এদের উচ্ছলতা এবং প্রেমের অভিনয় খুব চমকপ্রদ হলেও এরা বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব, সন্তানধারণ এবং সন্তান পালনের দায়িত্ব, অথবা গৃহিণীর দায়িত্ব নিতে ভয় পায়, এড়িয়ে যেতে চায়। এরা দায়িত্ব এড়াতে অন্যের অধীনে আশ্রিত থাকতে বেশি পছন্দ করে। সমাজ-জীবনে চলবার যে পরিপক্বতা থাকার প্রয়োজন সেটার অভাবের জন্যে অন্য সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলবার ক্ষমতা এদের সীমিত।

চিকিৎসায় এই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটানো খুবই দুষ্কর। যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মনোচিকিৎসকের হাতে কেবলমাত্র কিছু সুফল আশা করা যায়।

৮। নির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব (Dependent Personality)

অন্যের ওপর নির্ভরতা এবং পরমুখাপেক্ষিতাই এই ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরা দুর্বলচিত্ত হয় : আত্মবিশ্বাসের অভাব, হীনমন্যতা এবং অসহায় ভাবের জন্যে অন্যের বাধ্য হয়ে থাকতে পছন্দ করে। এরা বিবাহিত হলে স্ত্রৈণ স্বামী অথবা অতিশয় বাধ্য স্ত্রী হয়। এরা অন্যের অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে। প্রত্যাখান এবং সমালোচনার ভয়ে এরা নিজেদের দাবি জানাতে সাহস পায় না।

এই ধরনের ব্যক্তিত্ব মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগত প্রভাব যেমন কিছু থাকে, তেমনি শৈশবে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গঠনে বাধার সৃষ্টি হলেও এমনটা হওয়া সম্ভব। ওষুধ প্রয়োগে তেমন কিছু সুবিধে হয় না। যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায় মনোচিকিৎসায়।

৯। সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্ব (Anti-social Personality)

এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা অল্প বয়স থেকেই অপরাধ প্রবণ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেপরোয়া, কলহপ্রবণ এবং উগ্র স্বভাবের হয়। এরা স্নেহ-ভালবাসা বর্জিত নির্মম-নিষ্ঠুর, অপরাধবোধহীন এবং নিজেদের সুবিধার জন্যে অন্যের স্বার্থ উপেক্ষা করে চলাই এদের প্রকৃতি। নেশার দ্রব্যের প্রতি আসক্তি, বিচারবিহীন যৌন সম্ভোগের প্রতি স্পৃহা এবং আনুগত্যের অভাবের ফলে এদের বিবাহিত জীবন কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জীবনের

অভিজ্ঞতা থেকে এরা শিক্ষালাভ করেত পারে না ; তাই জেল, জরিমানা সত্ত্বেও বারেবারে নির্বিচারে একই অপরাধ করে বসে। যদিও এরা কোনো সময়ে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে পারে, তবুও প্রায় ক্ষেত্রেই এই ধরনের লোকেরা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী এবং রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করে ফেলতে পারে। চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, দাঙ্গাবাজি, কারাবাস এদের জীবনের অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। এরা সচরাচর দীর্ঘজীবি হয় না, নিজেদের দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়েই এরা অল্প বয়সেই মারা যায়। তবে বেঁচে থাকলে ৩৫-৪০ বছর বয়সের পরে এদের জীবনেও অনেক পরিবর্তন দেখা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাজবিরোধের পথ ছেড়ে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

কি কারণে এই রকম ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়, তা নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন ; তবে বংশগত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন সমাজবিরোধী ব্যক্তি আর একজন সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে বিয়ে করছে এবং সমাজবিরোধীর জন্ম দিচ্ছে। সমাজবিরোধীদের শৈশব জীবন পর্যালোচনা করলে প্রায়ই দেখা যায় এরা স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত সামঞ্জস্যহীন অসামাজিক, অশুভ পরিবেশে বড় হয়েছে।

এর কি কোনো চিকিৎসা হতে পারে

প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, কিন্তু সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পর তার প্রতিকার করা খুবই দুরূহ। এদের চিকিৎসার সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে, এদের নিজেদের পরিবর্তনের ইচ্ছার অভাব এবং অন্যের প্রতি, বিশেষতঃ চিকিৎসার প্রতি, এবং কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ, অনাস্থা এবং সন্দেহ প্রবণতা। ওষুধ প্রয়োগের চিকিৎসা এবং প্রচলিত পদ্ধতির মনোচিকিৎসার কোনোটাই তেমন কার্যকরী হয় না। ম্যাক্সওয়েল জোন্স প্রবর্তিত সমষ্টি মনোচিকিৎসাতে (group psychotherapy) কিছু সুফল পাওয়া যায়। এই চিকিৎসায় সমগোষ্ঠীর চাপের মাধ্যমে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা এবং অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা এই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

দূষিত পরিবেশে যারা জন্মায়, সেই সব শিশুদের সেই জায়গা থেকে দেরি না করে সরিয়ে এনে সুষ্ঠু পরিবেশে মানুষ করার ব্যবস্থা করলে সুফল পাওয়া যায়।

২১

মদ আর ড্রাগের নেশা

সেই আদি যুগে সভ্যতার উন্মেষের সময় থেকে মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখযায়—মানুষ তখনই আবিষ্কার করেছে প্রকৃতিজাত দ্রব্য থেকে সে কিভাবে দুঃখ-বেদনা লাঘব ঘটাতে পারে, কি ভাবে সুখের অনুভূতি পেতে পারে তা সে যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন। রোজকার জীবনযাত্রায় দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা তো মানুষ মাত্রেরই চিরসঙ্গী, তা থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণের প্রয়াসও চিরন্তন। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের নিয়মে বাঁধা রুটিন মাফিক কাজ করতে করতে সাধারণ মানুষও যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সে চায় এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি—সে মুক্তি যদি নেহাৎই সাময়িক হয়, তাই সই। সাময়িক এই পরিবর্তনের প্রত্যাশায় মানুষ ভিন্ন স্থান, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, মরুভূমি, বনজঙ্গল, ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন জীবজন্তুর পরিবেশ খুঁজে বেড়ায়। কখনও সে মেতে ওঠে দুঃসাহসিক অভিযানে, বিপদের আশঙ্কা বা মৃত্যুর সম্ভাবনাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। বাইরের জগতে ছুটোছুটি না করে কেউ ডুবে যায় কল্পনার জগতে, সৃজনী প্রতিভা দিয়ে রচনা করে চারুশিল্প আর কারুশিল্প, মূর্তি আর চিত্র, কাহিনী আর কাব্য, সুর আর সঙ্গীত, নাটক আর অভিনয়, যা শুধু স্রষ্টাকেই আনন্দ দেয় না। পরিবর্তনের এই আত্যন্তিক বাসনা থেকেই এসেছে পঞ্চ ব্যঞ্জনের রন্ধন আর হরেক প্রথায় পরিবেশনার প্রণালী : উদ্ভাবিত হয়েছে সাজগোজ প্রসাধন পারিপাট্যের অজস্র উপায়, যাতে একঘেয়েমি কেটে যায় চেহারায় ; তৃপ্ত হয় দর্শনেন্দ্রিয়।

পরিবর্তনের চাহিদা রয়েছে সব কিছুরই মূলে এবং এই মূল তাগিদ থেকেই মানুষ আবিষ্কার করেছে মাদক দ্রব্য—যা থেকে সে পেতে চেয়েছে নতুন অভিজ্ঞতা -যে অভিজ্ঞতা সাধারণ জ্ঞানের অতীত— হয়তো বা অলৌকিক, বা নির্দ্বিধায় সুখের সন্ধান করেছে নিষিদ্ধ এই সব দ্রব্যের মধ্যে।

এই মাদক দ্রব্য আবিষ্কার আর তার থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়ে তাকে বিবিধ শারীরিক আর মানসিক ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে : নিজে ভুগেছে, সেই সঙ্গে সমাজের ক্ষতি করেছে— তবুও এ পথ ছেড়ে সরে আসতে চায়নি।

এরই নাম নেশা, সর্বনাশা শক্তি। কিন্তু মানবজাতি কি এই মাদক দ্রব্যের ব্যবহার থেকে আদৌ নিষ্কৃতি পাবে ? স্বেচ্ছায় বিরত থাকতে পারবে আগামী কোনো এক দিন থেকে ? হোক ক্ষণস্থায়ী, হোক ক্ষতিকারক তবুও কি সে এই সুখের উৎস সন্ধানের পথ ছেড়ে দেবে ? মানুষের ইতিহাস বলে, সে ছাড়বে না।

মাদক দ্রব্যের বিধিসম্মত ব্যবহারের সঙ্গে অপব্যবহারের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। পরবের দিনে আদিবাসীদের হাঁড়িয়ার [১]... ... ...ব্যবহার অথবা সমাজের উঁচুতলার লোকদের পার্টিতে মদ্যপান মোটামুটি বিধিসম্মত বলেই ধরে নেওয়া হয়। রোগ নিরাময়ে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধের ব্যবহার নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই ওষুধ নেশার জন্যে ব্যবহার করতে গিয়ে যখন তার প্রতি আসক্ত হয়ে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময়ে তাই বলা হয়, নেশার দ্রব্য অনেক আছে, আসলে এই সব দ্রব্য বিপজ্জনক নয়। সমস্যাটা তখনই তৈরি হয় যখন কিছু লোক এই দ্রব্যগুলিকেই বিপজ্জনকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

তখন সবে ডাক্তারি পাশ করেছি। এক ভদ্রলোক এলেন আমার কাছে। বললেন—'বড্ড কাশি হয়েছে, সারছে না কিছুতেই'। কাশি সারানোর ওষুধ চাইলেন আমার কাছে। ভদ্রলোকের কথা শুনেই মনে পড়ল কলেজের ফার্মাকোপিয়াতে কাশি সারানোর একটা ব্যবস্থাপত্র দেওয়া আছে; হাসপাতালের রোগীদের দিয়ে ভাল ফল পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে ফার্মাকোপিয়া বের করে লিখে দিলাম ২ আউন্স লিংটাস ডাইমরফিন-এর (lictus dimorphin) ব্যবস্থাপত্র। ভদ্রলোক পরের দিনই এসে জানিয়ে গেলেন—তাঁর কাশি সেরে গেছে।

শুনে ভালই লাগল। কারণ, তাঁর ভাল হওয়া মানেই আমার কৃতিত্ব। বললাম- "ভাল যখন হয়ে গেছেন, তখন ওষুধটা আর ব্যবহারের দরকার নেই।

৪/৫ বছর পর ভদ্রলোক আবার এলেন। বললেন—'কাশির সেই ওষুধের আর একটা প্রেসক্রিপশন চাই। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেউ দিতে চাইছে না।"

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, উনি আবিষ্কার করেছেন, ওষুধটা খেলেই তাঁর ভাল ঘুম হয়—না খেলেই অসুবিধে হয়। আমার প্রেসক্রিপশন অর্থাৎ ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে জানাশুনা ডাক্তারখানা থেকে এতদিন পেয়েছেন সেই ওষুধ, এখন আর তারাও দিতে চাইছে না।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম আমি। কি সর্বনাশ! আমারই জন্যে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

যাই হোক, নানাভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আর ভয় দেখিয়ে এবং বিকল্প ওষুধ দিয়ে ড্রাগ নির্ভরতা থেকে ভদ্রলোককে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, কাশির ওষুধ অতটা দোষযুক্ত নয়, দোষ হচ্ছে ওইভাবে তার অপব্যবহার করার।

মদ্যপান এবং ড্রাগের ব্যবহার প্রধানত সামাজিক সমস্যা এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে ভেষজ বিজ্ঞান আর চিকিৎসা বিজ্ঞান।

হেরোইনের নেশায় আসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা হেরোইন শুরু করার আগে অন্যান্য ড্রাগ এবং মদের ব্যবহার করেছে; অন্যান্য ড্রাগ আসক্তির ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই অভ্যেস, অর্থাৎ আসক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ড্রাগ এবং মদের ব্যবহার করেছে। কিন্তু মদ্যপানে আসক্ত বেশিরভাগ ব্যক্তির মদ ছাড়া অন্য ড্রাগের নেশা নাও থাকতে পারে।

[১] একরকম মদ : ইংরেজীতে যাকে বলা হয় রাইস বিয়ার যেহেতু এটা তৈরী হয় ভাত থেকে গাঁজানর প্রণালী (fermentation) দিয়ে।

কি কারণে লোকে মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের দিকে ঝোঁকে

নানা কারণে লোকে মদ্যপানে এবং ড্রাগের ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দ্রব্যে ক্রিয়ার সঙ্গে আসক্ত ব্যক্তির চাহিদার একটা সম্পর্ক প্রায়ই দেখা যায়। যে কারণগুলি ব্যক্তিকে ওই নেশার দিকে আকৃষ্ট করে, সেগুলি হচ্ছে :

(১) নেশার দ্রব্যটি কত সহজে পাওয়া যায়, তার ওপর ওই দ্রব্যে নেশাগ্রস্ত হওয়ার কিছু কিছু সম্পর্ক দেখা যায়। নেশার দ্রব্যের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ওই নেশার প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। ব্রুয়ারি অথবা বারে যে ব্যক্তিরা কাজ করে, তাদের মদ্যপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একইভাবে দেখা যায়, রোগ নিরাময়ে যে সব ওষুধের ব্যবহার রয়েছে—ঠিক সেই সব ওষুধেরই নেশার কবলে পড়েছে ডাক্তার, নার্স, কম্পাউণ্ডার এবং ওষুধ ব্যবসায়ে যুক্ত ব্যক্তিরা।

(২) যে মাদক দ্রব্য যত দ্রুত শরীর-মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং নির্ভরশীলতা নিয়ে আসে সেই মাদক দ্রব্যের প্রতি নেশাগ্রস্তদের আকর্ষণ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। আফিং জাতীয় ড্রাগ এই ভাবে নিয়ে আসে নির্ভরশীলতা।

(৩) দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা ইত্যাদির উপশম ঘটাতে, অথবা কোনো দুরূহ মানসিক সমস্যাকে ভুলে যেতে, অথবা অসহ্য রূঢ় বাস্তব থেকে সাময়িক ভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে এই সব নেশার দিকে লোকে আকৃষ্ট হতে পারে।

(৪) প্রচলিত সামাজিক রীতি অথবা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবণতা এই সব নেশার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে।

(৫) কৌতূহল বশে, অথবা চিত্ত বিনোদনের জন্যে, অথবা আমোদ প্রমোদে উত্তেজনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নেশার দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হতে পারে।

(৬) মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রায়ই এদের পিতামাতাও মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। কিন্তু ড্রাগে আসক্তদের ক্ষেত্রে বংশগত প্রভাব তেমন কিছু দেখা যায় না।

(৭) শৈশবের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মদ্যপানে আসক্তি এবং ড্রাগে আসক্তি শৈশবের অভিজ্ঞতার অশুভ প্রভাবের ফলে হতে পারে।

একটা উদাহরণ দিই :

বিশু দাস নামে ১৩/১৪ বছরের এক কিশোরকে দেখেছিলাম। দু-বছর বয়েসে মা মারা গেলে তার বাবা ফের বিয়ে করেন এবং বিশুকে রাখা হয় তার দিদিমার কাছে। কিছুদিনের মধ্যেই ক্যানসার হয় দিদিমার এবং মারা যান বছর দুই ভোগবার পর। তখন তাকে রাখা হল তার এক মামীর কাছে। কিছুদিন থাকবার পর অসুবিধে হওয়ায় বিশুকে নিয়ে গিয়ে রাখা হল তার মাসীর কাছে। তখন বিশুর বয়স ৭/৮ বছর। এই সময়ে বিশুর নাম হয়ে গেছে— মা-খেকো বিশু ; সে মা'কে খেয়েছে, দিদিমাকে খেয়েছে, এখন মাসীকে। মাসী কিন্তু কোনোদিনই এ কথা বলেননি বিশুকে— বলেছে তার মাসতুতো দাদা আর দিদিরা। বিশুকে বড় ভালবাসতেন এই মাসী, কিন্তু প্রায়ই ভুগতেন হাঁপানিতে। কষ্ট বাড়লেই মন প্রাণ দিয়ে সেবা করত বিশু—কিন্তু ভয়ে ভয়ে থাকত অষ্টপ্রহর মাসীর মৃত্যু হলে তাকেও তো মেরে ফেলবে পাঁচজনে। আতঙ্ক যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তখন একদিন বিশু পালালো মাসীর কাছ থেকে। গেল বাবার কাছে—

বললে, এখন থেকে সে বাবার কাছেই থাকবে। বাবা তাকে আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু বিশুর ফিরে আসাটাকে ভাল চোখে দেখলেন না তার সৎ-মা।

ফলে, বেচারির বরাতে জুটল অবহেলা আর ঘৃণা। তবুও সে রয়ে গেল বাবার কাছেই। ১২ বছর বয়েসে ধরল বিড়ি-গাঁজা-চরস এবং দেখা দিল অপরাধ প্রবণতা।

বিশুকে আমি দেখেছিলাম এই সময়ের দু-বছর পরে। মেধা অত্যন্ত ভাল। এত হেলায় থেকেও এত অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেও বরাবর উঁচু জায়গা দখল করেছে ক্লাশে। কিন্তু স্বভাব চরিত্র যার খারাপ, তাকে স্কুল রাখতে চাইবে কেন ? ফলে, চারদিক থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ল বিশু দাস!

ঠিক এই সময়েই তার বাবা এবং তাঁর কিছু বন্ধু বিশুকে নিয়ে এলেন আমার কাছে— যদি কিছু করার থাকে এই আশায়। প্রায় দেড় বছর ধরে চলল মনোচিকিৎসা। নানাভাবে চেষ্টা করার পর জীবনের প্রতি বিশুর দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা বদলে গেল। শেষ পর্যন্ত একটা মিশনারী স্কুল রাজী হওয়ায় নতুন করে পড়াশুনোও শুরু হল সেখানে। ১৮ বছর বয়েসে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করল স্কুল ফাইনাল। এরপর থেকেই বিশেষভাবে পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা গেল তার জীবনে। এখন সে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিশুর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, সেটা ব্যতিক্রম। বেশিরভাগ বিশুরা কোথায় যে তলিয়ে যায়, সে হিসেব কেউ রাখে না।

(৮) ড্রাগে আসক্ত ব্যক্তিদের ইতিহাসে দেখা যায়, এদের ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এরা ড্রাগে আসক্ত হবার আগেই ছিল। যেমন এদের মধ্যে মানসিক পরিপক্বতার অভাব এবং হিংসাশ্রয়ী মনোভাব দেখা যায়। এরা যা চাইবে তা তাদের তখনই দিতে হবে, সবুর এরা সহ্য করে না। অসামাজিক এবং অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদের ড্রাগে আসক্ত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। নেশার কবলে পড়ার আগেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এদের নানা রকম ব্যক্তিত্বের বিকার দেখা যায়।

যারা শুধুমাত্র মদ্যপানে আসক্ত, পূর্ব্বে যে তাদের কোনরকম অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ছিল তার যথেষ্ট কোন প্রমাণ নাই। তবে দীর্ঘদিন ধরে অধিক পরিমাণ মদ্যপানের ফলে ব্যক্তিত্ব বিকার ত ঘটেই তাছাড়া নানা রকম শারীরিক এবং মানসিক রোগও এদের হ'তে পারে।

(৯) শরীর-মনের কোনো কষ্টের লাঘব ঘটাতে গিয়েও মদ্যপান এবং ড্রাগে আসক্তি জন্মাতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ধূমপান এবং মদ শরীর-মনের কোনো কষ্টকেই কমাতে পারে না, দূর করতেও পারে না, যদিও অনেক সময়ে মদ্যপায়ী আর ধূমপায়ীরা মনে করে, বিশেষ এই নেশার জিনিস দুটি উপশম ঘটাচ্ছে তাদের উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা আর একাকীত্ব-বোধের। দীর্ঘদিন অত্যধিক মদ্যপানের ফলে কমে যায় এদের আত্মবিশ্বাস, নিজেদের গুটিয়ে নেয় সমাজ থেকে, বৃদ্ধি পায় বিমর্ষভাব আর উৎকণ্ঠা।

অন্যদিকে আফিং, কোকেন, অ্যামফেটামিন জাতীয় ড্রাগ শরীর-মনের ব্যথা যন্ত্রণার লাঘব ঘটায়। যেমন, আফিং রাগ কমিয়ে দেয় এবং শরীরের ব্যথা-যন্ত্রণার লাঘব ঘটায়। অল্প সময়ের জন্যে হলেও অ্যামফেটামিন এবং কোকেন মনে প্রফুল্লতা নিয়ে আসে। মানুষ এই ভাবেই ড্রাগের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, ড্রাগ-নির্ভর হয়ে পড়ে।

কালে ভদ্রে একটু-আধটু মদ্যপান করে অনেকেই অল্প বিস্তর ফুর্তি-আনন্দের জন্যে। এদেরকে অবশ্যই মদ্যাসক্ত বলা যায় না। মদে আসক্তি এক রকমের ড্রাগ নির্ভরতা।

সেইসব দ্রব্যকেই ড্রাগ বলা যায় যা শরীরে প্রবেশ করলে শারীরিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ডাক্তারি মতে রোগ নিরাময়ে যখন ড্রাগের ব্যবহার হয়, তখন তা ড্রাগের উপযুক্ত প্রয়োগ, নইলে নয়।

রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্য ছাড়া যখন ক্রমাগত এবং মাত্রাধিক ভাবে কোনো ড্রাগের ব্যবহার হয়ে চলে, তখনই তাকে বলা হয় ড্রাগের অপব্যবহার (drug abuse)। ব্যক্তির ওপর ড্রাগের প্রতিক্রিয়ার ফলে শরীর-মনে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন সেই ব্যক্তি অবিরাম অথবা কিছুদিন পর পর সেই ড্রাগের ব্যবহার করতে বাধ্য হয় ; এই অবস্থাকেই বলা হয় ড্রাগ নির্ভরতা (drug dependence)।

এই ড্রাগ নির্ভরতা দু-রকমের হয় :

(১) শারীরিক নির্ভরতা (physical dependence) এবং

(২) মানসিক নির্ভরতা (psychical dependence)

শারীরিক নির্ভরতা (Physical Dependence)

পুনঃ পুনঃ ড্রাগের ব্যবহারের ফলে এমন এক শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন ওই ড্রাগ বন্ধ করলে যন্ত্রণাদায়ক শারীরিক লক্ষণ (withdrawal symtoms) প্রকাশ পায়। হেরোইন নির্ভরতা হয়েছে এমন ব্যক্তি যখন কোনো কারণে হেরোইন বন্ধ করে দেয় তখন অস্থিরতা, অনিদ্রা, পেশী এবং গ্রন্থিতে যন্ত্রণা, নাক এবং চোখ দিয়ে জল ঝরা, বেশি ঘাম, পেটে ব্যথা, বমি, উদরাময়, শরীরের লোম খাড়া হওয়া, ইত্যাদি দেখা যায়। এই লক্ষণগুলি সাধারণতঃ হেরোইন বন্ধ করার ঘন্টা ছয় পরে শুরু হয় এবং চরমে ওঠে ৩৬-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে,তারপর কমতে থাকে। মদে নির্ভরতা এসে যাওয়ার পর মদ্যপান বন্ধ করলে শরীরে কাঁপুনি, গা-বমি ভাব, দুর্বলতা, বিরক্তি-রাগ, অনিদ্রা দেখা যায়। কখনো তা থাকে অল্প মাত্রায়, বেশি হলে মৃগীর মত ফিট এবং প্রলাপের অবস্থা দেখা দিতে পারে। তখন আতঙ্ক, অমূল প্রত্যয়[১] (delusion) , অমূল প্রত্যক্ষ[২] (hallucination) দেখা যায় এবং স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান লোপ পায়। এরকম অবস্থার দ্রুত চিকিৎসা না করলে জীবন বিপন্ন হতে পারে। মানসিক নির্ভরতার কোনো সর্বজন সম্মত লক্ষণ বলা মুশকিল। সাধারণভাবে দেখা যায়, নেশার দ্রব্য গ্রহণে আগ্রহটা এমনই প্রবল যে ওই ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ সেই দ্রব্যের ব্যবহার

(১) অমূল প্রত্যয় (delusion) -ভ্রান্ত ধারণা, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে যার পরিবর্তন ঘটানো যায় না ; যে ধারণা ওই ব্যক্তির বয়স, শিক্ষা, ধর্ম এবং সমাজের ধ্যান ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। যেমন, কোনো ব্যক্তির কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই মনে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে শত্রুতা ষড়যন্ত্র চলছে, অথবা সে নিজে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

(২) বহির্জগতে কোনো সঙ্কেত ছাড়াই-যখন ভূল প্রত্যক্ষ (perception) বা উপলব্ধি ঘটে, তাকেই বলা হয় অমূল প্রত্যক্ষ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, চর্ম-এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (sense organ) যে কোনোটির ভুল উপলব্ধি হতে পারে ; যেমন, শব্দ না থেকেও শোনা, দৃশ্য না থেকেও দেখা, গন্ধ না থেকেও গন্ধের উপলব্ধি, জিভে কোনো স্বাদ বস্তু না থেকেও স্বাদের উপলব্দি। যেমন, কেউ উপলব্ধি করছে যে তার চামড়ায় পোকা চলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে সে রকম কিছুই নেই।

রোধ করা অথবা ব্যবহারের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শারীরিক নির্ভরতা থাকতে পারে, অবার নাও থাকতে পারে।

ড্রাগকে সহ্য করার শক্তি
(Drug Tolerance)

ক্রমাগত ড্রাগ ব্যবহারের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে আগে যে মাত্রায় শরীর-মনে যতটা ক্রিয়া হত, এখন মাত্রাকে আরও না বাড়ালে ততটা ক্রিয়া হয় না। এইভাবেই ড্রাগের মাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকে— একেই বলা হয় ড্রাগ সহ্য করবার শক্তি (drug tolerance)। শারীরিক নির্ভরতার দিক থেকে বিচার করলে ড্রাগগুলিকে দু-ভাগে ফেলা যায় :

১। অধিক শক্তিসম্পন্ন ড্রাগ (**hard drug**)

যে ড্রাগ ব্যবহারের ফলে আসক্ত ব্যক্তি কঠিন ভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে, অথবা শারীরিক নির্ভরতা এত বেড়ে যায় যে ওই ড্রাগ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এবং

২। স্বল্প শক্তিসম্পন্ন ড্রাগ (**soft drug**)

যে ড্রাগ ব্যবহারে শারীরিক নির্ভরতা বেশি হয় না। এ ড্রাগগুলি শরীরের ক্ষতি বেশি না করলেও মানসিক এবং সামাজিক ভাবে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। সাধারণতঃ নেশার ড্রাগগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) যে দ্রব্যগুলি ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত নিক্রিয় অক্ষম করে দেয়— যেমন, আফিং জাতীয় ড্রাগ।

(২) যে দ্রব্যগুলি সাময়িক ভাবে শরীর-মনে সক্রিয়, উৎফুল্ল ভাব নিয়ে আসে— যেমন, কোকেন।

(৩) যে সব ড্রাগ প্রয়োগের ফলে অমূল প্রত্যক্ষের (hallucination উদ্ভব হয়—যেমন- লাইসারজিক অ্যাসিড, ডায়ইথাইল অ্যাসিড।

এছাড়া আর এক প্রকার ড্রাগ আছে— যেমন ভাং, গাঁজা এবং চরস। এগুলিতে শারীরিক নির্ভরতা বেশি হয় না ; কিন্তু অতি মাত্রায় মানসিক নির্ভরতার সৃষ্টি করে—যার ফলে একবার ধরলে ছাড়া কঠিন হয়।

মদ্যপানে আসক্তির চিকিৎসা

রোগ নির্ণয় চিকিৎসার প্রথম পদক্ষেপ। নানা কারণে এরা অজ্ঞাতই থেকে যায়। খুব কম সংখ্যকই চিকিৎসকের কাছে আসে। এদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া দরকার—এরা সব সময়ে সত্য কথা বলে না এবং নানা ছলচাতুরি করে আসল তথ্য গোপন করতে পারে—নিজেদের যে সব অসুবিধা আছে, তা স্বীকার করতে চায় না। আতঙ্ক এবং অপরাধবোধের জন্যেও এরা সহজভাবে কথা বলতে পারে না। পরিবারের অন্যদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। অথচ চিকিৎসায় তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সামিল করতে না পারলে ঠিকমত চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়। এই সব কারণে

পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে এক সঙ্গে কথা বলা দরকার।

মদ্যপানে আসক্তির ফলে শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি যেমন হয়, তেমনি কর্মক্ষেত্রে, পারিবারিক জীবনে এবং বৃহত্তর সমাজে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে, মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। আসক্ত ব্যক্তিরা অনেক সময়ে বোঝাতে চায় যে, তাদের প্রতি আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্যবহার, কর্মজীবনে ব্যর্থতা, উৎকণ্ঠা, বিষণ্ণতা, ইত্যাদি থেকে অব্যাহতির জন্যেই মদ্য পানের দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের জীবনের ব্যর্থতা, পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি একাকিত্ববোধ, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ইত্যাদির প্রাথমিক কারণ—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অধিক মদ্যপান। মদ্যপানের ফলেই দুর্ভাগ্য এসেছে—দুর্ভাগ্যের জন্যে আসক্তি হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মদ্যপানে আসক্তি একপ্রকার ব্যাধি আর সেই ব্যাধির ফলেই মদ্যপায়ীর যত কিছু শারীরিক, মানসিক, সামাজিক অসুস্থতা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য। সেই কারণে, এ রোগের পরিণামের দিকেই শুধু নজর দিলে যথেষ্ট হবে না, এ সবের মূলে যা আছে (মদ্যপানে আসক্তি)— সেটিকে বন্ধ করতে হবে।

মদ্যপানে আসক্তির ফলে কি কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে

(১) এপিলেপ্সির মত ফিট।

(২) প্রলাপ (delirium)।

(৩) বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হয়ে চিত্তভ্রংশ (demantia) দেখা দিতে পারে।

(৪) অধিক মদ্যপানের ফলে শরীরে থায়ামিন নামক ভিটামিনের অভাব ঘটে ; তার ফলে স্নায়ুতন্ত্রের ওপর আঘাত পড়ে—যা থেকে কঠিন স্মৃতি বিলোপ (amnestic syndrome) ঘটতে পারে। এই অবস্থার দ্রুত চিকিৎসা না করলে ব্যক্তি চিরতরে অকর্মণ্য হয়ে যেতে পারে, মৃত্যু ঘটতে পারে।

(৫) স্নায়ুতন্ত্রের ওপর আঘাতের ফলে অন্যান্য ব্যাধি—যেমন, পলিনিউরাইটিস্, এনকেফেলাইটিস্, সেরিবেলার ডিজেনারেশন, ইত্যাদি ঘটতে পারে।

(৬) ইসোফেগাস (oesophagus), পাকস্থলী, ক্ষুদ্র অন্ত্র, লিভার, প্যানক্রিয়াস (pancreas) এবং হৃৎপিণ্ডের অনেক ক্ষতি হতে পারে।

(৭) মদের বিরূপ ক্রিয়ার ফলে কতকগুলি মানসিক ব্যাধির যেমন, ভ্রমবিকার (delusional disorder), হ্যালুসিনোসিস (hallucinosis) আবেগ বিকার (affective disorder), এবং ব্যক্তিত্বের বিকার (personality disorder), —এই সবেরও উদ্ভব হতে পারে।

মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য যা যা করতে হবে

(১) মদ্যপানের ফলে শরীর মনে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, অতি সত্বর ওষুধ প্রয়োগে সে সবের প্রতিকার করতে হবে।

(২) মদ্যপান বন্ধ করতে হবে এবং বন্ধ করার ফলে শরীর ও মনে যেসব অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দেখা দেবে, সেগুলির চিকিৎসা করতে হবে।

(৩) মদ ছাড়িয়ে তার পরিবর্তে এমন কিছু দিতে হবে যাতে অন্তত ড্রাগের আসক্তি না

হয়, অথচ মদের প্রতি যে নির্ভরতা ছিল, তার উপযুক্ত প্রতিকল্প হতে পারে। উপযুক্ত বলতে বোঝানো হচ্ছে, এমন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী যার সহযোগিতায় ও আদর্শে নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—যার প্রভাবে স্বাভাবিক জীবন প্রবাহে পুনরায় ফিরে আসতে পারবে। এ বিষয়ে মনোচিকিৎসক যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে, আর পারে অ্যালকোহলিক্স অ্যানোনিমাস (Alcoholics Anonymus)[১]নামক সংস্থাটি।

(৪) একবার মদ ছাড়ার পর আবার যাতে ঐ অভ্যাসে ফিরে না যেতে পারে, তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে—শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করা চলবে না। এ বিষয়ে আচরণ পরিবর্তনকারী মনোচিকিৎসা (behaviour therapy)অনেক সময়ে কার্যকরী হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ করে পুনরায় মদ্যপান বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় ; যেমন—ডাইসালফিরাম (disulfiram) নামক ওষুধ প্রয়োগ করা আছে এমন অবস্থায় মদ্যপান করলে রোগীর মধ্যে বিশ্রী অস্বস্তিকর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়—যা রোগীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন। এই ওষুধ প্রয়োগ করা অবস্থায় খুব অল্প পরিমাণ মদ্য পান করিয়ে রোগীকে ঐ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার নমুনা দেখিয়ে দিলে রোগী সাধারণতঃ মদের সংস্পর্শে আর যেতে চায় না। কিন্তু এর একটা বিপজ্জনক দিক আছে : যন্ত্রণাবোধ সত্বেও রোগী যদি মদ্যপান করে যায়, তাহলে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। এই সব কারণেই এই চিকিৎসা খুব বিচার বিবেচনা করে প্রয়োগ করা উচিত।

(৫) মদ্যপানে আসক্তির ফলে কর্মক্ষেত্রে, পারিবারিক এবং সমাজের অন্য ক্ষেত্রে যেসব ক্ষতি হয়েছে—সেগুলিকে সাবধানতার সঙ্গে পূরণ করতে চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে সমাজ কর্মী (social worker) সাহায্য করতে পারেন।

ড্রাগ নির্ভরতার চিকিৎসা

প্রথমেই মনে রাখা উচিত, ব্যক্তিত্বের বিকারের (personality disorder) ফলেই মানুষ ড্রাগ ব্যবহারের দিকে আকৃষ্ট হয়। পরে নির্ভরতার কবলে পড়ে। এদের দীর্ঘদিন হাসপাতালে রেখে দিলে অথবা জেলখানায় আটকে রাখলে খুব লাভ হয় না। ড্রাগের নির্ভরতা থেকে রোগীকে মুক্ত করতে হলে চাই—

(১) এমন একটা জায়গা যেখানে নেশার ড্রাগ পাবার কোনো উপায় নেই।

(২) ড্রাগ বন্ধ করার ফলে শরীর মনে যেসব যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেগুলির উপযুক্ত চিকিৎসা এবং তার জন্য চিকিৎসক যেখানে পাওয়া যাবে।

(৩) মানসিক সহায়তা দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি যেখানে থাকবে।

এরকম অবস্থা পাওয়া সম্ভব হাসপাতালের কোনো বিশেষ ওয়ার্ডে—যেখানে এই তিন ধরনের সাহায্যেরই ব্যবস্থা আছে। এরপর ওই ব্যক্তি যাতে ড্রাগের নেশায় ফিরে না যায়,

[১] অ্যালকোহলিক্স অ্যানোনিমাস এ এ (Alcohlics anonymus AA)
পূর্বে মদ্যপানে আসক্তি ছিল, এমন দুজন ব্যক্তি আমেরিকাতে ১৯৩৪ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সঙ্ঘ এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের কাজ সুরাসক্ত ব্যক্তিদের ওই নেশার পথ থেকে সরিয়ে এনে জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা। এই সংগঠনের মূল মন্ত্র হচ্ছে এই : মদ্যাসক্তি জনিত দুরবস্থাকে স্বীকার করে স্বাবলম্বনের পথে তার মোকাবিলার চেষ্টা করা। সংগঠনের সদস্যরা পরস্পরকে যে কোনো সময়ে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত, সংগঠনের প্রতি অনুগত, আত্মসচেতন, এবং একে অন্যের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে মনে করে। অনেকেই মনে করেন মদ্যপানের নেশার মোকাবিলায় এদের জুড়ি আর নেই।

তার জন্যে দিতে হবে ড্রাগের প্রতিকল্প (substitute),-অবশ্যই এক ড্রাগের পরিবর্তে আর এক ড্রাগ নয়। দরকার উন্মুক্ত মানুষের সাহচর্য, সহনশীল দরদী মানুষের পরিবেশ, সহকর্মীদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, যে পরিবেশে সে নিজেকে ঘৃণার পাত্র মনে করবে না, যে পরিবেশে সে লুপ্ত আত্মমর্যাদা ফিরে পাবে। এ বিষয়ে উপযুক্ত মধ্যবর্তী পুনর্বাসন কেন্দ্র (midway home) যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন বিষয়ে ওই ব্যক্তির পরিবারের সকলকে সামিল করা, তাদের অবগত করানো যে কিভাবে রোগীকে পুনরায় সুস্থ জীবন যাত্রায় নিয়ে আসা যায়। এ বিষয়ে সমগ্র পরিবারকে একত্রে মনোচিকিৎসার আওতায় আনলে সুফল পাওয়া যায়। তাছাড়া ড্রাগে আসক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের জন্য একক মনোচিকিৎসারও প্রয়োজন। ড্রাগে আসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের কাজে যথেষ্ট ধৈর্যের দরকার : কারণ সেরে গিয়েও পুনঃ পুনঃ ড্রাগ নির্ভরতার শিকার হতে পারে। সেজন্যে চিকিৎসক এবং তাঁর সহযোগীদের হতাশায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটালে চলবে না।

অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিত্ব (antisocial personality disorder) সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনেক সময় ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়ে। এ জাতীয় আসক্ত ব্যক্তিদের পরিবর্তনের পথে নিয়ে আসা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

কিন্তু যেসব ব্যক্তি ড্রাগে আসক্ত হওয়ার পূর্বে কর্মজীবনে এবং বিবাহিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যারা কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়নি অথবা যাদের কঠিন মানসিক ব্যাধি ছিল না—তাদের চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় সহজেই।

২২

মস্তিষ্ক ও মনের কাজ

মানুষের দেহের নার্ভতন্ত্র (nervous system)কে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটা হচ্ছে মূল বা কেন্দ্রিক নার্ভতন্ত্র (central nervous system) এবং অন্যটা বহিঃস্থ নার্ভতন্ত্র (peripheral nervous system)।

কেন্দ্রিক নার্ভতন্ত্রে আবার দুটি ভাগ আছে— ১) মস্তিষ্ক (brain) এবং ২) সুষুম্না কাণ্ড (spinal cord)। চিত্র ১ চিত্র ২

মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক দণ্ড

চিত্র-১

মস্তিষ্ক দণ্ড ও সুষুম্না কাণ্ড
Brain Stem and Spinal Cord

চিত্র-২
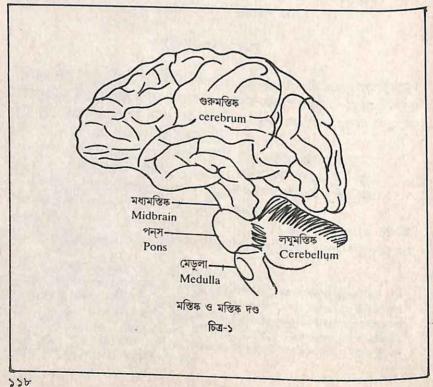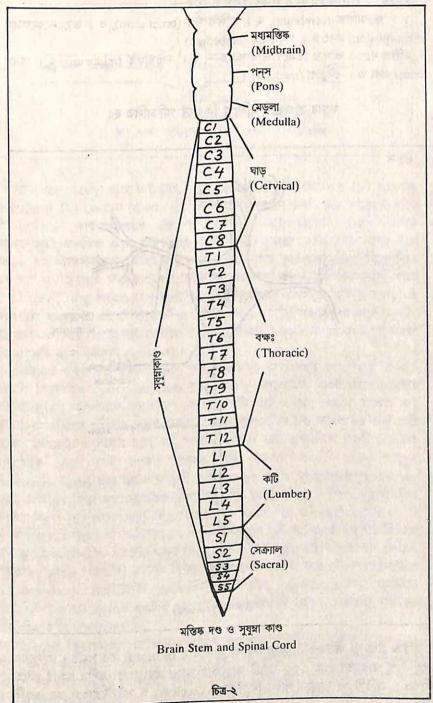
মস্তিষ্ক যে অংশগুলো দিয়ে গঠিত, সেগুলি হচ্ছে—

১। গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum), ২। মস্তিষ্ক দণ্ড (brain stem), ৩। ডায়েনকেফেলন (diencephalon) এবং ৪। লঘুমস্তিষ্ক (cerbellum)।

মস্তিষ্ক দণ্ডের আবার তিনটে ভাগ আছে— ১। মধ্যমস্তিষ্ক (midbrain), ২। পনস (pons) এবং ৩। মেডুলা (medulla)।

মনের কাজগুলি মস্তিষ্কে কিভাবে পরিচালিত হয়

চিত্র-৩
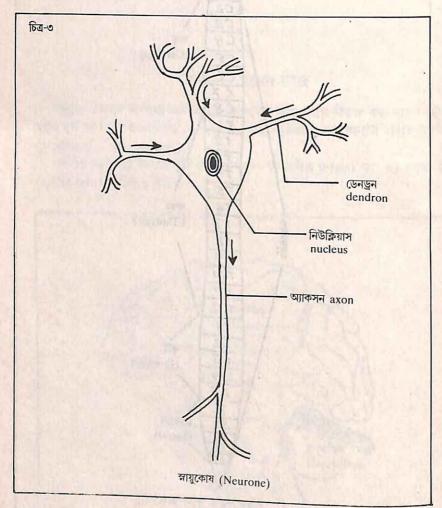
স্নায়ুকোষ (Neurone)

মস্তিষ্ক প্রধানত কতকগুলি স্নায়ুকোষ বা নার্ভকোষ (neurone) এর সমষ্টি। মানুষের দেহে সারা স্নায়ুতন্ত্রে প্রায় ১০০ কোটি স্নায়ুকোষ আছে এবং তার বেশীর ভাগই আছে মস্তিষ্কে। প্রতিটি স্নায়ুকোষে থাকে নিউক্লিয়াস (nucleus) ও সাইটোপ্লাজম সহ একটি

স্নায়ু সঙ্কেত স্নায়ুদূতের মাধ্যমে সাইন্যাপ্‌স পার হচ্ছে
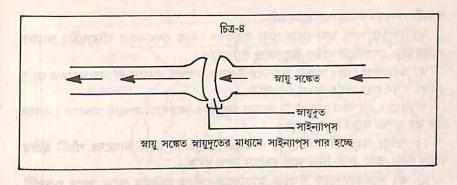
কোষদেহ্ (cell body) এবং এই দেহ্ থেকে বেরিয়েছে দু রকমের তন্তু (১) অ্যাকসন (axon) এবং (২) ডেনড্রন (dendron)। একটি স্নায়ু কোষে একটি মাত্র অ্যাকসন থাকে কিন্তু ডেনড্রন থাকতে পারে এক বা একাধিক। এই তন্তুগুলি বাস্তবিক পক্ষে কোষদেহেরই প্রলম্বিত অংশ কারণ এরা একই সাইটোপ্লাজমের দ্বারা কোষদেহের সঙ্গে যুক্ত। এই অ্যাকসন কোষদেহের স্নায়ু সংকেত বহন করে তার গন্তব্যস্থলের দিকে নিয়ে যায় আর ডেনড্রনগুলি অন্য স্নায়ুকোষ থেকে সংকেত গ্রহণ করে তাকে কোষদেহে পৌঁছে দেয়। একটি স্নায়ুকোষের সঙ্গে অন্য একটি স্নায়ুকোষের যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে এই তন্তুগুলির মাধ্যমে। এই যোগসূত্রগুলির বৈশিষ্ট্য এই : একটির অ্যাকসনের সঙ্গে অন্যটির ডেনড্রন এক সঙ্গে জোড়া লাগান থাকে না ; এখানে একটি ক্ষুদ্র ব্যবধান থাকে যাকে বলা হয় স্নায়ুসন্ধি বা সাইন্যাপস্ (synapse)।

টেলিগ্রাম অথবা টেলিফোন যেমন শব্দ সঙ্কেত বা বার্তা বহন করে, স্নায়ু বা নার্ভ তেমনি স্নায়ুসঙ্কেত (nerve impulse) বহন করে। স্নায়ুসঙ্কেত একটা বিশেষ পন্থায় সাইন্যাপস্-এর ব্যবধানকে পেরিয়ে যায়। পন্থাটি এই : যখন একটা সঙ্কেত ওই সাইন্যাপস্-এ এসে পৌঁছায়, তখন সেখানে একটা রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষরিত হয় এবং সেই দ্রব্যের মাধ্যমেই স্নায়ুসঙ্কেত চলে যায় পরবর্তী নার্ভে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটি এক এক স্নায়ুকোষে এক এক রকম। স্নায়ুর এই প্রেরক দ্রব্যটি—যাকে স্নায়ুদূত (neurotransmitter) বলা হয় তার ভূমিকা স্নায়ুতন্ত্রের কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর দ্বারাই মস্তিষ্কের ক্রিয়া তথা মানসিক ক্রিয়া বহুলাংশে নির্ধারিত হয়। বেশ কিছু মানসিক রোগের বিকারতত্ত্ব (pathology) এই প্রেরক দ্রব্যের ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

মনোবিকারে মনের কার্যকারিতার যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতে যেসব মানসিক রোগের ওষুধ (psychotropic drugs) প্রয়োগ করা হয় সেগুলি স্নায়ুতন্ত্রের প্রেরক দ্রব্যগুলির কাজের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই ঐ কাজ করে। নরঅ্যাড্রিন্যালিন (noradrenaline), সেরোটোনিন (serotonin), ডোপামিন (dopamine), গামা অ্যামিনো বিউটেরিক অ্যাসিড (gama amino butyric acid), ইত্যাদি প্রেরক দ্রব্যগুলি মানসিক ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এর প্রধান কাজ হচ্ছে যোগাযোগ রক্ষা করা— এই যোগাযোগ দেহের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের এবং বহির্জগতের সঙ্গে দেহের। জীবের নিরাপত্তা বজায় রেখে দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এবং বর্হিজগতের সঙ্গে দেহের সামঞ্জস্য করে চলাই এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য। এই

কাজটি সম্পাদন করার পন্থা হচ্ছে এই :

ক) দেহের সমস্ত স্থান থেকে এবং বর্হিজগৎ থেকে সেখানকার ঘটনাবলীর সংকেত সংগ্রহ করে সেগুলিকে সঠিক স্নায়ুকেন্দ্রে পাঠানো।

খ) স্নায়ুকেন্দ্র থেকে অবস্থা অনুসারে উপযুক্ত কাজের মাধ্যমে জীবের মঙ্গলের জন্যে সমন্বয় সাধন করে চলার ব্যবস্থা নেওয়া।

স্নায়ুতন্ত্রের এই কাজগুলো ঘটে কখনো আমাদের জ্ঞাতসারে কখনো অজ্ঞাতে। একাজ ঠিক মত সম্পন্ন করার জন্যে আছে :

১) সঙ্কেত গ্রহণকারী গ্রাহক যন্ত্র (receptor organ)। এরা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিভ আর চামড়ার মধ্যে থাকে।

২) এই সঙ্কেতগুলোকে উপযুক্ত স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আছে অন্তবহী স্নায়ু (afferent nerve)।

৩) সঙ্কেতগুলিকে উপলব্ধি করে উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারিণ করে নেয় স্নায়ুকেন্দ্রগুলো (nerve centers) এরপর সেই কর্মপন্থার সংবাদ (স্নায়ুসঙ্কেত) পাঠানো দরকার শরীরের যথাযথ জায়গায়।

৪) স্নায়ুসঙ্কেতগুলোকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয় বহিবহী স্নায়ু (efferent nerve) যাতে কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে।

৫) কাজ শুরু হওয়ার জায়গা অর্থাৎ কর্মস্থান (effector organ) হচ্ছে আমাদের দেহের মাংসপেশী (muscle) অথবা গ্রন্থি (gland); পেশী সঙ্কোচন-প্রসারণ (contraction-relaxation) এবং রসক্ষরণ (secretion)-এর দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হতে থাকে কাজগুলো।

আকাশে ঝড়ের আভাস দেখেই ঘরের জানলা বন্ধ করেন আপনি ; খাবার সময়ে খাদ্যবস্তু পাকস্থলিতে পৌঁছোলেই হজমের রস (digestive juice) নিঃসৃত হতে থাকে পাকস্থলীর গা থেকে— দুটিই কিন্তু স্নায়ু সঙ্কেতের ফল, যোগাযোগ চালিয়ে গেল স্নায়ুতন্ত্র গ্রাহকযন্ত্র থেকে সঙ্কেত নিয়ে পাঠিয়ে দিল স্নায়ুকেন্দ্রে অন্তবহী স্নায়ুর মাধ্যমে। এরপর স্নায়ুকেন্দ্র বার্তা পাঠালো বহিবহী স্নায়ুর মাধ্যমে কর্মস্থানে— কাজটি সম্পাদিত হল। প্রথমটি ঘটল আপনার জ্ঞাতসারে— দ্বিতীয়টি আপনার অজ্ঞাতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাইরের জগতের তথ্য শরীরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা— দুটোই শারীরবৃত্তীয় (physiological) কাজ। কিন্তু এইভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং সেই অনুসারে কর্ম সম্পাদনের মাঝখানে ঘটছে আরও কিছু ঘটনা, যেমন, সঙ্কেতের উপলব্ধি (perception), স্মৃতি (memory), কল্পনা (imagination) আবেগ (emotion), অনুভূতি (feeling), আত্মচেতনা (self-consciousness), বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ (reasoning), সিদ্ধান্ত নেওয়া (decision making), ইচ্ছাকৃত কর্ম নির্ধারণ (volition), ইত্যাদি। মানসিক ক্রিয়া বলা হয় মাঝের এই ঘটনাগুলিকে। এই মানসিক ক্রিয়াগুলি অবশ্যই শারীরবৃত্তীয় কাজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

পুরো মস্তিষ্কটা একই সঙ্গে মস্তিষ্কের সব কাজেই অংশ নেয়— যদিও তা বাস্তব তবুও বিশেষ বিশেষ কাজে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ জায়গার কিছু কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্বও থাকে। মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের যে অংশগুলি বেশি ভূমিকা পালন করে, তাদের নাম :

১) গুরুমস্তিষ্কের বহিস্তর (cerebral cortex),

২) রেটিকিউলার অ্যাক্টিভেটিং সিসটেম (reticular activating system),
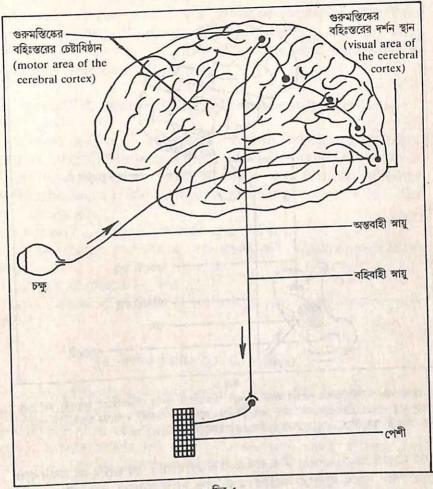
চিত্র-৫

আমাদের জ্ঞাতসারে স্নায়ুতন্ত্রে যে সব কাজ হয় তার একটি নমুনা : আকাশে ঝড়ের আভাস দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্তর্বহী স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কের সংজ্ঞা কেন্দ্রে (sensory centre) পৌঁছে গেল এবং তার উপলব্ধি হল। এরপর এই সংজ্ঞা কেন্দ্র থেকে স্নায়ু সঙ্কেত কতকগুলি স্নায়ু কোষের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের চেষ্টা কেন্দ্রে (motor centre) পৌঁছে গেল এবং সেখানেই কর্মপন্থা ঠিক হল। এবার সেখান থেকে বহির্বহী স্নায়ু দিয়ে শরীরের সমস্ত পেশীতে স্নায়ু সঙ্কেত পৌঁছে গেল এবং তার ফলে পেশীগুলির মিলিত ক্রিয়ার দ্বারা ঘরের জানলাগুলি বন্ধ করা সম্ভব হল।

৩) লিম্বিক সিসটেম (limbic system) এবং
৪) হাইপোথালামাস (hypothalamus)।

১। গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্তর (Cerebral Cortex)

গুরুমস্তিষ্কের এই বহিস্তরটি ধূসর বর্ণের (grey matter)। এখানে খুবই বেশি পরিমাণে
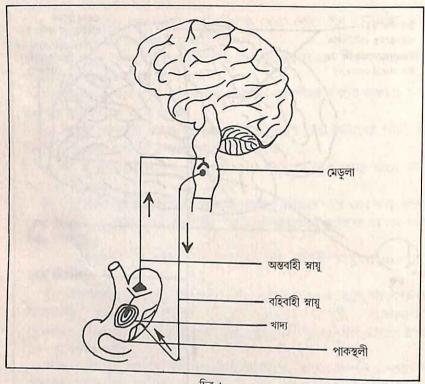
চিত্র-৬

আমাদের অজ্ঞাতে স্নায়ুতন্ত্রের কাজের একটি নমুনা : পাকস্থলিতে খাবার পৌঁছানমাত্রই অন্তবহী স্নায়ু সেই সংবাদ স্নায়ু কেন্দ্রে পৌঁছে দেয় এবং স্নায়ু কেন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্নায়ুসঙ্কেত পাকস্থলীর গায়ের গ্রন্থিগুলিতে পাঠিয়ে দেয় বহিবহী স্নায়ু দিয়ে। এর ফলে গ্রন্থিগুলি থেকে হজমের রস নিঃসৃত হয়।

থাকে স্নায়ুকোষের (neurone) জীবকোষ (cell body)গুলো। গ্রে ম্যাটার-এর প্রধান কাজ বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তিকে অবহিত রাখা, সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা এবং স্বইচ্ছায় কাজ করা। এ ছাড়াও আমাদের ভাষা, বাক্‌শক্তি স্মৃতি, সামাজিক আচরণ-বিধি, ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে।

গুরুমস্তিষ্কের ভেতরের অংশ শ্বেতবর্ণের (white matter)। এখানে প্রধানতঃ থাকে স্নায়ুকোষের তন্তুগুলি।

গুরুমস্তিষ্ক দুটি গোলার্ধে বিভক্ত— ডানদিকে অর্ধেক আর বাঁদিকে অর্ধেক। ডান দিকের গুরুমস্তিষ্ক প্রধানতঃশরীরের বাঁদিকের কাজে অংশ নেয় আর বাঁদিকের গুরুমস্তিষ্ক অংশ নেয় শরীরের ডানদিকের কাজে।

দুই গোলার্ধের মাঝে রয়েছে করপাস ক্যালোসাম (corpus callosum), জুড়ে রেখেছে দুটি গোলার্ধকে এবং একদিকের সঙ্গে আর একদিকের যোগাযোগ রয়েছে এই করপাস ক্যালোসাম-এর মধ্যে দিয়ে।

দু দিকের গুরুমস্তিষ্কের বহিস্তরের কাজ অনেক বিষয়েই এক রকম। কিন্তু প্রত্যেক দিকের কাজের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ বেশি কাজ

করতে পারে ডান হাতে— এদের ক্ষেত্রে গুরুমস্তিষ্কের বামগোলার্ধ কথিত বা লিখিত ভাষাকে বুঝতে সাহায্য করে ; মনের ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করতে বা লিখতে বেশি সাহায্য করে। ডানদিকের গোলার্ধ কিন্তু আকারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বস্তু বা স্থানকে চিনতে এবং গানের রাগরাগিনীকে বুঝতে বেশি সাহায্য করে।

(২) রেটিকিউলার অ্যাকটিভেটিং সিসটেম (Reticular Activating System)

মস্তিষ্ক দণ্ড (brain stem) -এর কেন্দ্রস্থানে লম্বালম্বিভাবে স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ রয়েছে, তাকে বলা হয় রেটিকিউলার ফরমেশন (reticular formation), রেটিকিউলার ফরমেশনের ওপরের দিকের অংশ প্রধানত মধ্যমস্তিষ্কে থাকে। একেই বলা হয় রেটিকিউলার অ্যাকিটভেটিং সিসটেম। এটি কতকগুলো বিশেষ নিউরোন বা স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত হয়। এর কাজ এই :

১) চেতনা (consciousness)-কে সজাগ এবং সতর্ক রাখা,

২) মনঃসংযোগকে এবং বর্হিজগৎ থেকে তথ্যবহনকারী স্নায়ুতন্ত্রের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা,

৩) ঘুম আনতে সাহায্য করা, এবং

৪) গুরুমস্তিষ্কের বহিস্তরের এবং লিম্বিক সিস্টেমের কাজে সামঞ্জস্য বিধানে অংশগ্রহণ করা।

(৩) লিম্বিক সিস্টেম (Limbic System)

মস্তিষ্কের এই অংশটি গুরুমস্তিষ্কের অভ্যন্তরে (inside), নিম্নে এবং মধ্যবর্তী স্থানে (medial aspect) অবস্থিত। এর প্রধান কাজ : আমাদের আবেগ-অনুভূতির অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, স্মরণ রাখার কাজে এবং আবেগ প্রকাশেও সাহায্য করে। এছাড়াও কতগুলি সহজাত বৃত্তি (instinctive tendency) যেমন, যৌনভাব এবং আক্রমণাত্মক ভাবকেও নিয়ন্ত্রিত রাখতে সাহায্য করে।

(৪) হাইপোথালামাস (Hypothalamus)

এটি মস্তিষ্কের ডাইয়েনকেফেলনের একটি প্রধান অংশ। এর প্রধান কাজ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomic nervous system)[১]-এর কাজ পরিচালনা করা এবং হরমোন উৎপাদন, এবং হরমোনগুলির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা।

মস্তিষ্কের যে সব স্থানের কথা বলা হল, সেগুলি আবার স্নায়ুতন্ত্রের প্রেরকদ্রব্যের মাধ্যমে পরস্পরের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

[১] স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র- স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ শরীরের আভ্যন্তরীণ যেসব অঙ্গ যেমন হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রস্থলী, ইত্যাদির কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২৩

মানসিক রোগের চিকিৎসা

অধুনা মনোবিকারের চিকিৎসায় সাধারণতঃতিন প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় :

(১) ওষুধ চিকিৎসা (drug therapy) (২) মনোচিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি (psychotherapy) (৩) বৈদ্যুতিক চিকিৎসা (electric therapy) ।

এর মধ্যে ওষুধ (drug) এবং মনোচিকিৎসা (psychotherapy) পদ্ধতি দুটিকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক চিকিৎসা (electric convulsive therapy) খুবই প্রয়োজনীয় এবং জীবনদায়ী চিকিৎসা হলেও ওষুধ চিকিৎসার উন্নতির ফলে এর প্রয়োগক্ষেত্র আজকাল খুবই সীমিত ।

আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্র (nervous system)-এর বৃহৎ অংশ হচ্ছে মস্তিষ্ক (brain) এবং এই স্নায়ুতন্ত্র কতকগুলো নিউরোনের (neurone) সমষ্টি। এরা— এই নিউরোনরা স্নায়ুতন্ত্রের জীবকোষ (nerve cell)। মস্তিষ্কের নিউরোনের ক্রিয়ার সঙ্গে মানসিক ক্রিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় জানা গেছে যে এক নিউরোন থেকে অন্য নিউরোনে সঙ্কেত প্রেরণের ব্যবস্থার ওপরেই আমাদের মানসিক ক্রিয়া অনেকখানি নির্ভরশীল। বেশির ভাগ মানসিক রোগে মস্তিষ্কের নিউরোনের সঙ্কেত প্রেরণ পদ্ধতির গোলযোগ ঘটে। মানসিক রোগ নিরাময়ের ওষুধগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই নিউরোনের এই সঙ্কেত প্রেরণের ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক ক্রিয়ার উপযুক্তভাবে সমন্বয় এবং শৃঙ্খলায় নিয়ে আসে ।

মানসিক রোগীর চিকিৎসা চিকিৎসকের কথাবার্তা, আচার-আচরণ রোগীর মানসিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং রোগ নিরাময়ে খুবই সহায়ক হয়। রোগীর কথাবার্তা, আচার-আচরণ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে রোগীর মনকে প্রভাবিত করে রোগ নিরাময়ের যে ব্যবস্থা তারই নাম মনোচিকিৎসা (psychotherapy)। ওষুধ প্রয়োগে চিকিৎসার মতই মনোচিকিৎসা রোগীর মানসিক ক্রিয়াকে বাস্তবে চলার উপযোগী করে তোলে নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধনের মারফৎ।

মনোচিকিৎসা এবং ওষুধ চিকিৎসা একে অন্যের বিকল্প নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। এই কারণেই বেশির ভাগ মনোরোগের চিকিৎসায় ওষুধ বা ভেষজ চিকিৎসা এবং মনোচিকিৎসা একই সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। রোগের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব অনুযায়ী এই দুই চিকিৎসার বিধি ঠিক করতে হয়। যেখানে রোগীর আচরণ অতিমাত্রায় বিশৃঙ্খল,

অবাস্তব কল্পনায় আচ্ছন্ন— যেমন, সিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিয়া ইত্যাদি— সেখানে প্রাথমিকভাবে ঔষধ চিকিৎসার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হয় ; আবার যেখানে রোগী অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে মানসিক ক্রিয়ার বিঘ্নের ফলে উৎকণ্ঠা অথবা আতঙ্করোগে আক্রান্ত, সেখানে মনোচিকিৎসায় বেশি গুরুত্ব দিতে হয়।

২৪

মানসিক রোগে ওষুধ চিকিৎসা (Drug Therapy in Mental Disorders)

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার এবং প্রয়োগ এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে যেমন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল, পঞ্চাশের দশকে ওষুধ প্রয়োগে মানসিক রোগের চিকিৎসা (chemotherapy in mental illness) মনোরোগ চিকিৎসায় ঠিক সেই রকম আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এর ফলে মানসিক রোগ সম্বন্ধে মানুষের ধ্যান ধারণা পাল্টে যায় ; চিকিৎসা বিজ্ঞানে মনোরোগ স্থান পায় শারীরিক রোগের সঙ্গে একই সারিতে। যে দুটি ঔষধ দিয়ে এই বিবর্তনের শুরু, তার একটি হচ্ছে রেসারপিন (reserpin); সর্পগন্ধা নামে ভারতীয় এক উদ্ভিদ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়েছিল এই রেসারপিন-কে। অন্যটি হচ্ছে ক্লোরপ্রমাজিন (chlorpromazine), ফরাসী দেশে এক ল্যাবোরেটরিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল ক্লোরপ্রমাজিন ; ডিলে (১৯০৭) এবং ডেনিকার (১৯১৭) নামে দুই মনোরোগ চিকিৎসক ১৯৫২ সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এর পর একের পর এক আরও অনেকগুলো ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে অন্যান্য রোগের মত ঔষধ প্রয়োগে মনোরোগের চিকিৎসা সুদৃঢ়ভাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

১৯৫০-এর আগের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত মানসিক রোগ সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞতা এবং মানসিক রোগ চিকিৎসায় সেই প্রাচীন ব্যবস্থাই চালু ছিল— কারাগারের মত চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গায় কখনো ঘরে বন্ধ করে, কখনো বা লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা হত ; এবং এর সঙ্গে চিকিৎসার নামে চলত অবজ্ঞা অবহেলা এবং নানা রকমের দৈহিক নির্যাতন। এর কারণ একটাই, মানসিক রোগকে রোগ বলে মনে করা হত না ; তৎকালীন মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, মনের বিকার ঘটে ভৌতিক কারণে এবং ভূতে পাওয়া এই সব ব্যক্তি অন্যলোকের পক্ষে বিপজ্জনক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড নামে ভিয়েনার এক চিকিৎসাবিজ্ঞানী দেখালেন যে, মানসিক ব্যাধি দুর্বোধ্য নয়— মনের কার্যকারিতার মাধ্যমে মনের রোগ বোঝা যায় এবং অপেক্ষাকৃত মৃদু মনোরোগগুলোকে কথাবার্তা আর বিশেষভাবে আলোচনার দ্বারা নিরাময় করা যায়। বিশেষ ধরনের এই চিকিৎসাপদ্ধতির নাম মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis)। এই পদ্ধতি দিয়ে মনের ক্রিয়ার বিচার বিবেচনা আর ব্যাখ্যা করা যায়, মানসিকভাবে মনোরোগের চিকিৎসা করা যায়। মানসিক রোগ

চিত্র-৭
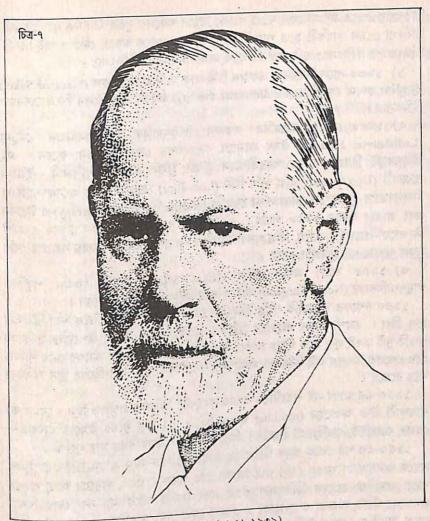
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)

চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও দুরূহ মানসিক ব্যাধিতে এই চিকিৎসা তেমন কার্যকরী হতে পারেনি। ১৯৩০-এর দশকে আমরা দেখতে পাই তিনটি উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তিত হচ্ছে মানসিক রোগের চিকিৎসায় :

১) ১৯৩৩ সালে ভিয়েনার একজন চিকিৎসক ম্যানফ্রেড সাকেল (Manfred Sakel) ইনসুলিন কোমা থেরাপির (insulin coma therapy) প্রবর্তন করেছিলেন সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায়।

২) ১৯৩৪ সালে হাঙ্গেরির একজন চিকিৎসাবিদ ল্যাডিসলাউভন মেডুনা (Ladislauvon Meduna) ঔষধ প্রয়োগে কনভালশন থেরাপির সূচনা করেন। এই চিকিৎসারই বিবর্তন ঘটিয়ে পরবর্তীকালে দু'জন ইটালিয়ান চিকিৎসাবিজ্ঞানী—ইউগো সারলেটি (Ugo Cerletti) এবং লুসি বিনি (Luci Bini) বিদ্যুৎ প্রয়োগে অনেক সহজ ও নিরাপদভাবে ইলেকট্রিক কনভালশন থেরাপি (electric convulsion therapy)-র উদ্ভাবন এবং প্রচলন করেন ১৯৩৮ সালে। যদিও মনে করা হয়েছিল, কনভালশন থেরাপি সিজোফ্রেনিয়াতেই প্রযোজ্য, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, এই চিকিৎসায় সবচেয়ে বেশি সুফল পাওয়া যায় বিষণ্ণতা রোগে।

৩) ১৯৩৫ সালে এগাস মনিজ (Egas Moniz) নামে একজন পর্তুগিজ স্নায়ুশল্যবিশারদ (Neuro Surgeon) মস্তিষ্কে শল্য চিকিৎসার প্রবর্তন করেন।

১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইনসুলিন কোমা থেরাপি এবং মস্তিষ্কে শল্য চিকিৎসা চালু ছিল। এরপর ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসা যতই বাড়তে থাকে, উপরোক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি দুটি ততই লুপ্ত হতে থাকে। তবে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার ক্ষেত্র আগের চেয়ে সীমিত হয়ে গেলেও এখনও এই চিকিৎসা মানসিক রোগ চিকিৎসায় একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

১৯৫০-এর আগে এই শতাব্দীতে আরও কয়েকটা চিকিৎসা প্রচলিত ছিল : যেমন ক) শান্তকারী উষ্ণ অবগাহন (soothing warm bath), খ) কিছু ঘুমের ঔষধের ব্যবহার—যেমন, ব্রোমাইড, বারবিচুরেট ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির ব্যবহার এখন প্রায় লুপ্ত।

১৯৫০-এর পর থেকে ওষুধ চিকিৎসার প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এহেন চিকিৎসার সুফল সম্বন্ধে জনসাধারণ আরও বেশি ওয়াকিবহাল হতে থাকে। ফলে, মানুষের আস্থা বাড়তে থাকে মানসিক রোগের চিকিৎসার ওপর এবং কমতে থাকে মানসিক রোগ বিষয়ে জনগণের ভীতি, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। এরপর দেখা গেল, মানসিক রোগের হাসপাতালে রেখে মানসিক রোগের চিকিৎসার চেয়ে, সমাজে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে রোগীর চিকিৎসা আরও বেশি সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে মানসিক রোগীদের ওপর সাধারণ মানুষের সহানুভূতি বাড়ছে এবং এই সব রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আইনগত যে সব বাধা ছিল, সেগুলিও ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

ওষুধ বা ভেষজ চিকিৎসার সুফল মানসিক রোগের দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি অনেক বেশি মাত্রায় আকর্ষণ করেছে— যার ফলে এ বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যা মানসিক রোগকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করছে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োগে বিলক্ষণ সহায়ক হচ্ছে।

১) এখনও এমন কিছু ব্যাধি আছে যেখানে ওষুধে কোনো কাজই হয় না।

২) কিছুক্ষেত্রে ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতিকারের সম্পূর্ণ সমাধান করা যায় না।

৩) অনেক মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ওষুধ চিকিৎসা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হয়,

যার ফলে খরচের জন্যেই হোক বা অবহেলার ফলেই হোক— চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায় এবং রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

৪) গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী স্ত্রীলোককে এই সব ওষুধ দেওয়া চলে না, কারণ তা সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।

যেসব উন্নততর গবেষণা চলছে, তাতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে মানসিক রোগের চিকিৎসার পথ আরও সুগম হবে এবং সহজসাধ্য হবে। শুধু চিকিৎসাই নয়, এই সব ব্যাধির প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়াও সম্ভব হবে— যার ফলে সমাজে এই রোগগুলির প্রাদুর্ভাব অনেক কমে যাবে।

এবার মানসিক রোগের ব্যবহৃত ওষুধগুলির বিবরণ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রধানতঃ তিন রকমের ওষুধ মনোরোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়—

১) অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ (Antipsychotic drugs)
অতিমাত্রায় বিশৃঙ্খল আচরণকারী, যেমন, ম্যানিক সাইকোসিস (manic psychosis) সিজোফ্রেনিয়া, ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা হয়।

২) অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ওষুধ (Antidepressive drugs)
বিষণ্ণতা রোগে এগুলিকে প্রধানতঃ ব্যবহার করা ... ।

৩) উৎকণ্ঠা প্রশমনকারী ওষুধ (Anti-anxiety drugs)
উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক ইত্যাদিতে এগুলিকে ব্যবহার করা হয়।

এই তিন রকম ওষুধ ছাড়াও আরও চার প্রকার ওষুধ মানসিক রোগ চিকিৎসায় প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। চার শ্রেণীর সেই ওষুধগুলি হচ্ছে এই :

১) লিথিয়াম (Lithium)
এটি আবর্তনশীল আবেগবিকারে (bipolar affective disorders) প্রতিষেধক হিসাবে, এবং ম্যানিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

২) ঘুমের ওষুধ (Hypnotics)
প্রায় সব রকম মনোবিকারের চিকিৎসায় কিছু কিছু সময় ঘুমের ওষুধের প্রয়োজন হয়।

৩) অ্যান্টিপারকিনসোনিয়ান ওষুধ (Antiperkinsonian drugs)
অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ প্রয়োগের সময়ে প্রায়ই এক রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যাকে বলা হয় পারকিনসোনিজম (perkinsonism)-এর ফলে রোগীর দেহে কম্পন এবং মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে সহজেই আয়ত্তে আনা যায়।

৪) অ্যান্টিএপিলেপটিক ওষুধ (Antiepileptic drugs)
এগুলিকে এপিলেপসি এবং এপিলেপসি জনিত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়। এদের বিবরণ এপিলেপসি চিকিৎসার মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

মানসিক রোগে ব্যবহৃত ওষুধগুলোর নাম, কিভাবে পাওয়া যায়, কি মাত্রায় ব্যবহার হয় এবং কোথায় প্রয়োগ করা হয়—এই বিষয়গুলি দিয়ে একটি তথ্য তালিকা দেওয়া হল।

তথ্য তালিকা

মানসিক রোগে ব্যবহৃত কিছু ওযুধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোন্ শ্রেণীভুক্ত	নির্মাতাদের দেওয়া নাম	কিভাবে এবং কত মিলিগ্রাম মাত্রায় পাওয়া যায়		প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সাধারণতঃ দৈনিক কত মিঃ গ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়		কি অবস্থার জন্য সাধারণত:প্রয়োগ করা হয়
রাসায়নিক নাম		সেবনের জন্য ট্যা=ট্যাবলেট ক্যা=ক্যাপসুল সি=সিরাপ	মাংসপেশীতে ইন্জেকশনের জন্য অ্যাম্পুল	সেবনের জন্য	মাংস পেশীতে ইন্জেকশনের জন্য	
অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ইমিপ্রামিন	ডেপসোনিল,অ্যান্টিডেপ, ইমপ্রামিন,	ট্যা ২৫ ক্যা৭৫		৫০-১৫০		বিষণ্ণতা রোগ, শয্যামূত্র
অ্যামিট্রিপটিলিন	ট্রিপটোমার,এলিওয়েল, অ্যামিলিন	ট্যা ১০, ২৫, ৭৫		৫০-১৫০		বিষণ্ণতা রোগ, শয্যামূত্র
নরট্রিপটিলিন	সেনসিভ্যাল, প্রাইমক্স	ট্যা ২৫		৫০-১৫০		বিষণ্ণতা রোগ
ট্রিমিপ্রামিন	সারমনটিল	ট্যা ১০, ২৫, ৭৫		৫০-১৫০		বিষণ্ণতা রোগ
ডক্সিপিন	ডক্সিন ডকসিটার স্পেক্ট্রা	ক্যা ১০, ২৫, ৭৫		৫০-১৫০		বিষণ্ণতা রোগ
ডোথায়াপিন	প্রোথায়াডেন	ট্যা ২৫, ৭৫		২৫-২২৫		বিষণ্ণতা রোগ

মানসিক রোগে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোন্ শ্রেণীভুক্ত	নির্মাতাদের দেওয়া নাম	কিভাবে এবং কত মিলিগ্রাম মাত্রায় পাওয়া যায়		প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সাধারণতঃ দৈনিক কত মিঃ গ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়		কি অবস্থার জন্য সাধারণতঃপ্রয়োগ করা হয়
রাসায়নিক নাম		সেবনের জন্য ট্যা=ট্যাবলেট ক্যা=ক্যাপসুল সি=সিরাপ	মাংসপেশীতে ইনজেকশনের জন্য অ্যাম্পুল	সেবনের জন্য	মাংস পেশীতে ইনজেকশনের জন্য	
মিয়ানসেরিন	টেট্রাডেপ	ট্যা ২০		৬০-১০০		বিষণ্ণতা রোগ
ট্র্যাজোডন	ট্র্যাজালন ট্র্যাজোনিল	ট্যা ২৫, ৫০, ১০০		৫০-৩০০		বিষণ্ণতা রোগ
লিথিয়াম লিথিয়াম কোর্বোনেট	লিথোসান লাইক্যাব লিথিয়াম	ট্যা ২৫০, ৩০০ ৪০০		৫০০-১২০০		আবর্তনশীল আবেগ বিকার, ম্যানিয়া
ঘুমের ওষুধ ডায়জেপাম	কামপোজ ভ্যালিয়াম	ট্যা ২, ৫, ১০	১০মিঃ গ্রাঃ প্রতি ২ মিঃ লিঃ	৫-২০	১০-২০	উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা, স্ট্যাটাস-এপিলেপ্‌টিকাস
অক্সাজেপাম	সেরিপ্যাক্স	ট্যা ১৫, ৩০		১৫-৬০		উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা
নাইট্রাজেপাম	নাইট্রোসান	ট্যা ৫, ১০		৫-২০		অনিদ্রা

মানসিক রোগে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোন্ শ্রেণীভুক্ত	নির্মাতাদের দেওয়া নাম	কিভাবে এবং কত মিলিগ্রাম মাত্রায় পাওয়া যায়		প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সাধারণতঃ দৈনিক কত মিঃ গ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়		কি অবস্থার জন্য সাধারণতঃপ্রয়োগ করা হয়
রাসায়নিক নাম		সেবনের জন্য ট্যা=ট্যাবলেট ক্যা=ক্যাপসুল সি=সিরাপ	মাংসপেশীতে ইনজেকশনের জন্য অ্যাম্পুল	সেবনের জন্য	মাংস পেশীতে ইনজেকশনের জন্য	
লোরাজেপাম	ট্র্যাপেক্স অ্যাটিভান, লারপোজ	ট্যা ১, ২		১-৬		উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা
বারবিটোন	ফেনোবারবিটোন, গারডেনাল	ট্যা ৩০, ৬০		৩০-৬০		এপিলপসি, অনিদ্রা, উৎকণ্ঠা
ক্লোরেলহাইড্রেট	ট্রাইক্লোরিল	ট্যা ৫০০ সি ৫০০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি ৫ মিঃ লিঃ		৫০০-১০০০		অনিদ্রা
এন্টিসাইকোটিক ক্লোরপ্রমাজিন	লারগ্যাকটিল	ট্যা ১০, ২৫, ৫০, ১০০ সি প্রতি ৫ মিঃ লিঃ ২৫ মিঃ গ্রাঃ	প্রতি ২ মিঃ লিঃ এ ৫০ মিঃগ্রাঃ অ্যামপুল	১০০-৬০০	৫০-১০০	সিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিয়া, যে কোন তীব্র সাইকোসিস, উৎকণ্ঠা
থায়োরিডাজিন	মেলেরিল, রিডাজিন, থায়োরিল, টেনসেরিল, সাইকোরিল			১০০-৬০০		অনিদ্রা ক্লোরপ্রমাজিনের মত

মানসিক রোগে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোন্ শ্রেণীভুক্ত	নির্মাতাদের দেওয়া নাম	কিভাবে এবং কত মিলিগ্রাম মাত্রায় পাওয়া যায়		প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সাধারণতঃ দৈনিক কত মিঃ গ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়		কি অবস্থার জন্য সাধারণতঃপ্রয়োগ করা হয়
রাসায়নিক নাম		সেবনের জন্য ট্যা=ট্যাবলেট ক্যা=ক্যাপসুল সি=সিরাপ	মাংসপেশীতে ইনজেকশনের জন্য অ্যাম্পুল	সেবনের জন্য	মাংস পেশীতে ইনজেকশনের জন্য	
প্রোমেথাজিন	প্রোমাসান ফেনারগন	ট্যা ১০, ২৫	প্রতি মিঃলিঃ এ ৫০ মিঃ গ্রাঃ	১০-১৫০		অনিদ্রা, পারকিনসোনিজম্
ট্রাইফ্লুয়োপ্যারাজিন	এসপাজিন, ট্রিনিকাম, ট্যাজিন	ট্যা ১, ৫	প্রতি মিঃলিঃ ১ মিঃ গ্রাঃ		১-২	সিজোফ্রেনিয়া, উৎকণ্ঠা
ফ্লুফেনাজিন	অ্যানাটেন্‌শন	ট্যা ১, ৫	ডেকানোয়েট, প্রতি মিঃ লিঃ-এ ২৫ মিঃ গ্রাঃ	১-১০	প্রতি ২ থেকে ৩ সপ্তাহে ২৫ মিঃগ্রাঃ	সিজোফ্রেনিয়া
প্রোক্লোরপ্যারাজিন	স্টোমিটিল	ট্যা ৫, ২৫		১০-২০		সিজোফ্রেনিয়া, উৎকণ্ঠা
থাইয়োপ্রপাজেট	ম্যাজেপ্‌টিল	ট্যা ৫		৫-৪৫		ম্যানিয়া সিজোফ্রেনিয়া
হ্যালোপেরিডল উৎকণ্ঠা প্রশমনের ওষুধ	সেরিনেস, সেনরম, ডেপিডল	ট্যা ০, ২৫, ১·৫, ৫, ১০	প্রতি মিঃ লিঃ-এ ৫ মিঃ গ্রাঃ	০·৫-৬০	৫-২০	ম্যানিয়া, সিজোফ্রেনিয়া, উৎকণ্ঠা

মানসিক রোগে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোন্ শ্রেণীভুক্ত	নির্মাতাদের দেওয়া নাম	কিভাবে এবং কত মিলিগ্রাম মাত্রায় পাওয়া যায়		প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সাধারণতঃ দৈনিক কত মিঃ গ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়		কি অবস্থার জন্য সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয়
রাসায়নিক নাম		সেবনের জন্য ট্যা=ট্যাবলেট ক্যা=ক্যাপসুল সি=সিরাপ	মাংসপেশীতে ইনজেকশনের জন্য অ্যাম্পুল	সেবনের জন্য	মাংস পেশীতে ইনজেকশনের জন্য	
উৎকণ্ঠা প্রশমনের ওষুধ ক্লোরডায়াজেপকসাইড	লিবরিয়াম, অ্যাসিব্রিয়াম, ইকুইব্রোম	ট্যা ১০		২০-৪০		উৎকণ্ঠা অনিদ্রা
ডায়াজেপাম	কামপোজ, ভ্যালিয়াম	ট্যা ২, ৫, ১০		৫-২০	১০-২০	উৎকণ্ঠা অনিদ্রা
অকসাজেপাম	সেরিপ্যাক্স	ট্যা ১৫, ৩০		১৫-৩০		উৎকণ্ঠা অনিদ্রা
লোরাজেপাম	ট্র্যাপেক্স, অ্যাটিভ্যান, লারপোজ	ট্যা ১, ২		১-৬		উৎকণ্ঠা অনিদ্রা
অ্যান্টিপারকিনসোনিয়ান ট্রাইহেক্সিফেনিডিল	প্যাসিটেন, হেকসিনল, পার্কিন	ট্যা ২		২-১২		পারকিনসোনিজম
অরফেনড্রিন	ডিসিপ্যাল	ট্যা ৫০		৫০-৩০০		পারকিনসোনিজম
প্রোসাইক্লিডিন	কেম্যাড্রিন	ট্যা ২·৫ ৫		২·৫-১৫		পারকিনসোনিজম

একই ওষুধ ভিন্নমাত্রায় ভিন্ন রোগে ব্যবহার করা হয়। এর কয়েকটি উদাহরণ পরের পাতায় দেওয়া হচ্ছে।

১) অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ সাধারণতঃ বেশি মাত্রায় সিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিয়া, ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হলেও অল্পমাত্রায় উৎকণ্ঠা প্রশমনে ব্যবহৃত হয়।

২) উৎকণ্ঠা প্রশমনের ওষুধ ভাগভাগ করে দৈনিক ২/৩ বার দেওয়া হয় উৎকণ্ঠায়, আবার এক মাত্রায় শুধু রাত্রে শোবার আগে দিলে অনিদ্রার চিকিৎসা হয়।

৩) অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ড্রাগস্ বিষণ্ণতা রোগের ওষুধ হলেও এগুলি অস্থিরমতি শিশু এবং শয্যামূত্রের ক্ষেত্রে দিলেও সুফল পাওয়া যায়।

৪) ডায়াজেপাম প্রধানতঃ উৎকণ্ঠার ওষুধ হলেও অনিদ্রা এবং স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস-এও যথেষ্ট সুফল দেয়।

৫) ফেনারগন অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ হলেও পারকিনসোনিজম-এ প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

মানসিক রোগে ব্যবহৃত ওষুধগুলির বিরূপ প্রতিক্রিয়া, বিষক্রিয়া এবং সেগুলির প্রতিকার

অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধের ক্ষেত্রে :

১) সাধারণতঃ একটু আলসেমি-তন্দ্রালুভাব, জিভ-গলা শুকনো লাগা, চোখে একটু ঝাপসা দেখা, ইত্যাদির জন্যে তেমন কিছু করার দরকার হয় না— ওষুধের মাত্রার একটু হেরফের করে দিলেই ঠিক হয়ে যায়।

২) একসট্রাপিরামিড্যাল লক্ষণ :

ক) মাংসপেশীর তীব্র সঙ্কোচন (acute dystonia)-তে জিভ, মুখমণ্ডল, ঘাড় এবং পিঠের মাংসপেশীর তীব্র সঙ্কোচনের ফলে জিভ বেরিয়ে আসে, মুখমণ্ডলের বিকৃতি ঘটে, ঘাড় বেঁকে যায়, এবং ধনুকের মত পিঠ বেঁকে যায়। আপাত দৃষ্টিতে ভয়াবহ মনে হলেও তেমন বিপজ্জনক কিছু নয় ; অ্যান্টিপারকিনসোনিয়ান ওষুধ খাইয়ে দিলে যেমন— প্যাসিটেন ২ মিলিগ্রাম বড়ি তখনই (১-২টি) অথবা ডায়জেপাম ১০ মিলিগ্রাম ইনজেকশন, অথবা ফেনারগন ২৫-৫০ মিলিগ্রাম মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে যায়।

খ) পারকিনসোনিজম (Parkinsonism)-এতে হাতে পায়ে কাঁপুনি, মুখে অধিক লালা নিঃসরণ, মুখের চেহারা অভিব্যক্তিহীন, শরীরের মাংসপেশীর শক্তভাব, এবং চলাফেরাতে আড়ষ্টভাব দেখা যায়। এই অবস্থার প্রতিকার সহজেই করা যায়, অ্যান্টিপারকিনসোনিয়ান ওষুধ মুখে খাইয়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়।

গ) অস্থির চঞ্চল ভাব এবং সেইসঙ্গে উৎকণ্ঠা (অ্যাকাথেসিয়া) অবস্থা হলে রোগী এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না দেখে বোঝা যায় কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু রোগী ঠিকভাবে বলতে পারে না কোথায় কষ্ট। এর প্রতিকারের জন্যে অ্যান্টি সাইকোটিকের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া এবং কম মাত্রায় ডায়াজেপাম মুখে খাওয়ালে উপকার হয়।

ঘ) টারডিভ ডিসকাইনেসিয়া (tardive dyskinesia)-এতে জিভ, মুখমণ্ডল, গলদেশের এবং কখনো কখনো হাত পায়ের মাংসপেশীর স্পন্দন এবং বিরক্তকর সঙ্কোচন দেখা যায়। সাধারণতঃ দীর্ঘদিন যাবৎ অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ ব্যবহারে এগুলি দেখা যায়। প্রতিকারের জন্যে ওষুধের জন্যে যে এরকম হচ্ছে, সেটি বন্ধ করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যায় ; কিছুক্ষেত্রে অবশ্য দীর্ঘদিন সময় লাগে।

৬) ম্যালিগন্যান্ট নিউরোলেপটিক সিনড্রোম (malignat neuroleptic syndrome) এটি খুবই বিপজ্জনক অবস্থা, যদিও খুবই কম দেখা যায়। এতে সমস্ত দেহের মাংসপেশী আড়ষ্ট শক্ত হয়ে যায়, শরীরে তাপ বাড়ে এবং রোগী অচৈতন্য হয়ে যেতে থাকে। এমন অবস্থা হলে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা দরকার এবং এই অবস্থার সূচনা দেখা গেলেই যে ওষুধের কারণে এমন হচ্ছে, সেটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

৩) যাদের এপিলেপসি থাকে, তাদের ফিট বেড়ে যেতে পারে। এরকম লক্ষণ দেখা দিলে অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধের সঙ্গে অ্যান্টি-এপিলেপটিক ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার।

৪) গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী স্ত্রীলোককে অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দিলে সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।

৫) কদাচিৎ স্ত্রীলোকদের স্তনে দুধ এসে যেতে পারে এবং মাসিক বন্ধ হতে পারে। এজন্যে কোনো ক্ষতি হয় না— শুধু বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার হয়। বিশেষতঃ অবিবাহিতা এবং বিধবা রোগীদের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক উৎকণ্ঠা যাতে না হয় সেজন্য চিকিৎসার শুরুতেই এদের এবিষয়ে ওয়াকিবহাল করা উচিত।

৬) থাইয়োরিডাইজিন নামক অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধে কখনো কখনো চোখের রেটিনার ক্ষতি হতে পারে। এ রকম হলে সূচনাতেই ওই ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

৭) চামড়ায় ফুসকুড়ি এবং কালো কালো দাগ হতে পারে যদিও খুবই কম ক্ষেত্রে তা দেখা যায়। এ জন্যে বিশেষ কিছু করার দরকার হয় না, তবে ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া অথবা সেই ওষুধের বদলে অন্য কোনো অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

এগুলি ছাড়াও আরও কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে ; তাই যে সব রোগীদের অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দেওয়া হয়, তাদেরকে মধ্যে মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা দরকার এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেলেই তার প্রতিকার করা দরকার। রোগীর বাড়ির লোকদের এ বিষয়ে সজাগ থাকতে নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।

অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ওষুধের ক্ষেত্রে

১) প্রথম ২-৪ দিন একটু বেশি ঘুমের ভাব হতে পারে। এ ছাড়া জিভ, গলা শুকিয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, চোখে ঝাপসা দেখা, বেশি ঘাম হাওয়া, শোয়া অথবা বসা থেকে দাঁড়াতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখা এবং প্রস্রাবের অসুবিধা, শেষের দুটি অবশ্য বেশি বয়েসের ব্যক্তিদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। এগুলি সম্বন্ধে রোগীকে আগেই বলে দেওয়া দরকার এবং আরও বলা দরকার, এর জন্যে ভয়ের কিছু নেই— ক্রমে সহ্য হয়ে যাবে।

২) এপিলেপসি থাকলে সেই সব রোগীদের ফিটের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এরকম ঘটলে উপযুক্ত মাত্রায় অ্যান্টি এপিলেপটিক ওষুধ দিতে হয়।

৩) বিষণ্ণতা রোগ (depressive illness) চিকিৎসার জন্যে যে মাত্রায় অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ওষুধ দেওয়া হয়, তাতে বিপদের তেমন কিছু থাকে না, কিন্তু যদি কোনো রোগী এই ওষুধ অতিরিক্ত পরিমাণে খেয়ে ফেলে, তাহলে জীবন সংশয় ঘটতে পারে ও এ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। এ রকম অবস্থা দেখা গেলে তক্ষুনি রোগীকে হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

কোথায় এই সব ওযুধ দেওয়া ঠিক নয়

হৃৎপিণ্ডের কঠিন ব্যাধি, চোখে গ্লুকোমা, প্রস্টেট গ্রন্থের বৃদ্ধি, লিভারে গুরুতর ব্যাধি থাকলে অ্যান্টিডিপ্রেসিভ ওষুধ দেওয়া ঠিক নয়।

উৎকণ্ঠাপ্রশমনকারী ওষুধের ক্ষেত্রে

অধিক ক্লান্তি বোধ, তন্দ্রালুভাব, মাথা ঝিম ঝিম করা, গা বমি ভাব প্রায়ই দেখা যায়। দীর্ঘদিন ব্যবহারে ওষুধের প্রতি আসক্তি জন্মায়। হঠাৎ বন্ধ করলে এপিলেপসির মত ফিট হতে পারে। রোগ নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিন ব্যবহার করা ঠিক নয়। এবং বন্ধ করার সময়ে ওষুধের মাত্রা কমাতে হয় ধীরে ধীরে।

ঘুমের ওষুধের ক্ষেত্রে

আজকাল ঘুম আনার জন্যে উৎকণ্ঠা প্রশমনকারী ওষুধগুলি উপযুক্ত মাত্রায় শোবার আগে রোগীদের দেওয়া হয়। ঘুমের প্রয়োজনে বিপজ্জনক বারবিচুরেট ওষুধগুলির ব্যবহার একরকম লুপ্ত হয়েছে বলা যায়। উৎকণ্ঠা প্রশমনকারী ওষুধগুলি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

অ্যান্টিপারকিনসোনিয়ান ওষুধের ক্ষেত্রে

১) গলা, মুখ, জিভ শুকিয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাব করার অসুবিধা, গা-বমি ভাব— এইসব দেখা যেতে পারে। এমনটা হলে ওষুধের মাত্রা কিছু কমিয়ে দিতে হয়।

২) কখনো কখনো চোখে গ্লুকোমা দেখা যেতে পারে। বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। এ রকম হলে অ্যান্টিপারকিনসোনিয়ান ওষুধগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলির চিকিৎসা করা দরকার।

৩) বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে এইসব ঔষুধ প্রয়োগের ফলে প্রলাপ অবস্থা (delirious state) ঘটতে পারে। এমন অবস্থা দেখা গেলে এই সব ঔষধ বন্ধ করে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

অ্যান্টিএপিলেপটিক ওষুধের ক্ষেত্রে

প্রয়োগ বিধি এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

লিথিয়াম ওষুধের ক্ষেত্রে

১) হাতের মৃদু কম্পন, হাতের লেখার অসুবিধে, সাময়িকভাবে ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, মুখে, বুকে, পিঠে ব্রন-র প্রাদুর্ভাব এগুলি প্রায়ই দেখা যায়। এর জন্য বেশি কিছু করার দরকার হয় না প্রায় ক্ষেত্রে।

২) গর্ভাবস্থায় এবং দুগ্ধবতী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে লিথিয়াম প্রয়োগ করলে সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। এরকম অবস্থায় লিথিয়ামের প্রয়োগ না করাই ভাল।

৩) থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হতে পারে, ফলে, শরীরে থাইরয়েডহরমোন কমে যেতে পারে। এ রকম ঘটলে লিথিয়াম চিকিৎসার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন দিলেই অবস্থা ঠিক হয়ে যায়। থাইরয়েড গ্রন্থির স্থায়ী কোনো ক্ষতি হয় না।

৪) কোনো কারণে রক্তে লিথিয়ামের মাত্রা বেড়ে গেলে বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় হাতে পায়ে বেশি কম্পন, মাথা ঘোরা, হাঁটা-চলার সময়ে টলে যাওয়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, ঘুম-ঘুম ভাব এবং এরপরে আক্ষেপ (convulsion), অচৈতন্য অবস্থা, এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে রক্তে লিথিয়ামের মাত্রা প্রতি লিটারে ১·৫ মিলি ইকুইভ্যালেন্টের বেশি উঠতে দেওয়া উচিত নয়। এবং এর জন্য মধ্যে মধ্যে রক্তে লিথিয়ামের পরিমাণ (মাত্রা) দেখা দরকার। কোনো কারণেই এদের খাবারে লবণের মাত্রা কম হতে দেওয়া ঠিক নয়। বেশি বাড়াবাড়ি হবার আগেই তা বোঝা গেলে, খাবারে লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) একটু বেশি মাত্রায় (দৈনিক ১২ গ্রাম মত) দিতে হয় এবং লিথিয়াম প্রয়োগ বন্ধ করে দিলে সব ঠিক হয়ে যায়। তবে বেশি মাত্রায় লক্ষণ প্রকাশ পেলে তক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি করে জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

২৫

মানসিক রোগে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা

মনোচিকিৎসকদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, যাদের এপিলেপসির ফিট হয়, তাদের সিজোফ্রেনিয়া হয় না এবং যারা সিজোফ্রেনিয়াতে ভোগে, তাদের এপিলেপসির ফিট হয় না।

এই ধারণা থেকে হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট শহরের এক মনোরোগ চিকিৎসক ল্যাডিসলাউ ভন মেডুনা অনুমান করলেন— সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের যদি এপিলেপসির মত ফিট করানো যায়, তাহলে সিজোফ্রেনিয়ার মত দুরারোগ্য ব্যাধির কবলমুক্ত হবে।

এই সময়ে তিনি জানতে পারেন যে, মুমূর্ষু রোগীকে জীবিত রাখার চেষ্টায় যখন কর্পূর (camphor) ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তখন কর্পূরের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ওই রোগীর এপিলেপসির মত আক্ষেপ (convulsion) হয়। এটা জানবার পর মেড়ুনা সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের মাংসপেশীতে কর্পূর (camphor in ether or camphor in oil) ইনজেকশন দিয়ে এপিলেপসির মত আক্ষেপ (convulsion) ঘটাতে শুরু করলেন এবং উল্লসিত হলেন রোগীদের মানসিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে দেখে।

তখন তিনি তাঁর এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করলেন ১৯৩৩ সালে— সাড়া পড়ে গেল ইউরোপ আর আমেরিকার মনোরোগ চিকিৎসকদের মধ্যে। তাঁরাও শুরু করলেন এই চিকিৎসা এবং কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলেন :

(১) এ চিকিৎসায় মানসিক রোগ সেরে যায়, তবে সিজোফ্রেনিয়ায় তেমন কিছু সুবিধে হয় না, সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয় বিষণ্ণতা রোগে (depressive illness)।

(২) যে প্রচলিত ধারণাকে কেন্দ্র করে এই চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছিল, দেখা গেল সেই ধারণাটা ভুল ; অর্থাৎ সিজোফ্রেনিয়া এবং এপিলেপসির ফিট একই রোগীর মধ্যে থাকতে পারে না— এটা ঠিক নয়। সিজোফ্রেনিয়া রোগীর এপিলেপসির ফিট হয় এবং এপিলেপসি ফিটের রোগী যারা, তাদের সিজোফ্রেনিয়াও হতে পারে। ভ্রান্ত ধারণার বশে যার আবিষ্কার, সেই চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিল মানসিক রোগের চিকিৎসায়। কর্পূর (camphor) অথবা ওই জাতীয় অন্য ঔষধ যেমন, কার্ডিয়াজল (cardiazol), মেট্রাজল (metrazol), ইত্যাদি— মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দিলে কনভালশন হতে কিছু দেরি হয় এবং ওই সময়ে রোগীর কষ্ট হয় ; সেই কারণে এই ওষুধগুলিকে রক্তবহা শিরার (vein) মধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়ার রীতি প্রচলিত হল বটে, কিন্তু তাতেও দেখা গেল কনভালশন হতে সময় কম লাগছে, কিন্তু রোগীর কষ্ট থেকে যাচ্ছে।

এরপর ১৯৩৮ সালে ইতালির দুজন মনোরোগ চিকিৎসক ইউগো সারলেটি (Ugo Cericiti) এবং লিউগি বিনি (Luigi Bini) বিদ্যুৎ প্রয়োগে আধুনিক বৈদ্যুতিক আক্ষেপ চিকিৎসার (electric convulsion therapy) প্রবর্তন করেন। এতে সুবিধে হল অনেক। দেখা গেল, এ চিকিৎসা অনেক নিরাপদ, প্রয়োগ করা অনেক সহজ এবং রোগীর কোনো কষ্ট হয় না— কেন না প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

এত সত্ত্বেও কিছু অসুবিধে কিন্তু থেকে গেল ; যেমন, কখনো কখনো শরীরের কিছু কিছু হাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা অথবা গ্রন্থিচ্যুতি ঘটা এবং মাংসপেশীর তীব্র সঙ্কোচনের ফলে শরীরে ব্যথা।

অধুনা প্রচলিত চিকিৎসায় অবশ্য এই অসুবিধাগুলোকে দূর করা সম্ভব হয়েছে। আজকাল প্রথমে অজ্ঞান করানোর ঔষুধ শিরায় ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগীকে অজ্ঞান করা হয়। তারপর আরও একটি ইঞ্জেকশন দিয়ে শরীরের মাংসপেশীগুলোকে শিথিল করা হয় ; এর ফলে রোগীর আর কোনো কষ্টবোধ থাকে না, হাড় ভেঙে যাওয়া বা গ্রন্থিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।

এ চিকিৎসা চলার সময়ে মনে রাখার কিছু অসুবিধে (forgetfulness) দেখা যায়, চিকিৎসা শেষ হবার পর তা ঠিক হয়ে যায়।

কনভালশনের সময়ে যাতে জিভে কামড় না পড়ে, সেজন্যে মুখে দুই দাঁতের পাটির মাঝে নরম গ্যাগ্ রাখা হয়। চিকিৎসা প্রয়োগ করার আগে প্রস্রাব করিয়ে নেওয়া হয় এবং অন্তত ৫ ঘণ্টা উপবাসে রাখতে হয়। আলগা দাঁত থাকলে খুলে নেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত বিছানায় শোয়াতে হয় এবং এমনভাবে রোগীকে ধরে থাকতে হয় যাতে তার শরীরে কোনো আঘাত না লাগে।

এ চিকিৎসা প্রয়োগ করার আগে প্রতি রোগীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে তবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। শারীরিক কোনো রোগের আভাস পাওয়া গেলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বিশেষ করে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

কোন রোগে এই চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়

বিষণ্ণতা রোগ (depressive illness) এবং ক্যাটাটোনিক সিজোফ্রেনিয়াতেই (catatonic schizophrenia) সাধারণতঃ এই চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে।

কোথায় এই চিকিৎসা প্রয়োগ নিষেধ

যেখানে তীব্র কোনো শারীরিক ব্যাধি রয়েছে, বিশেষতঃ অল্প কিছুদিন আগে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হয়েছে, অথবা কোনো কঠিন হৃদরোগ আছে, এবং মস্তিষ্কে টিউমার আছে— এই সব ক্ষেত্রে রোগীকে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা দেওয়া নিষেধ।

এই চিকিৎসা নিয়মানুগভাবে বিশেষজ্ঞের দ্বারা দেওয়া হলে যথেষ্ট নিরাপদ, এমনকি কোনো ক্ষেত্রে যেমন— গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগে চিকিৎসার চেয়ে বেশী নিরাপদ।

২৬

মনোচিকিৎসা (Psychotherapy)

রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা অথবা অন্য কোনো উপায়ে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের পদ্ধতিকেই মনোচিকিৎসা বলা হয়। ওযুধ প্রয়োগে যেমন রোগীর রোগ নিরাময় সম্ভব, ঠিক তেমনি চিকিৎসকের কথাবার্তায় রোগীর মনের ওপর যে প্রভাব পড়ে— তার ফলেও তার ব্যাধিমুক্তি ঘটে। চিকিৎসকের আচার-আচরণ প্রায় সব রকম চিকিৎসার ক্ষেত্রেই রোগ নিরাময়ের সহায়ক। এখানে আমরা যে মনোচিকিৎসার কথা বলছি, সেটা অবশ্য বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির কথা, যেগুলির প্রয়োগে চিকিৎসকের মন রোগীর মনকে প্রভাবিত করে এবং রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের একটি ঘটনা আজকের মনোচিকিৎসার সূচনা ঘটিয়েছিল। ১৮৯৫ সালে ভিয়েনা শহরের দুই চিকিৎসক— যোশেফ ব্রায়ার এবং সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, একজন রোগীকে চিকিৎসা করার সময়ে লক্ষ্য করলেন, হিপনোটাইজড থাকা অবস্থায় হিস্টিরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিটি তার রোগের লক্ষণের সঙ্গে যুক্ত চিন্তা এবং আবেগকে কথায় যেই প্রকাশ করে ফেললেন, অমনি তাঁর রোগের উপশম ঘটে গেল।

এই দুই ডাক্তারের বিবরণে পাওয়া যায় এক মহিলার রোগ এবং নিরাময় বৃত্তান্ত। হঠাৎ একদিন সেই মহিলা লক্ষ্য করেছিলেন, গেলাস থেকে জল খেতে আর পারছেন না। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, অথচ জলভর্তি গেলাস মুখের কাছে তুলেই সভয়ে গেলাসকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন ঠিক জলাতঙ্ক রোগীর মতন।

তাই তিনি এসেছিলেন চিকিৎসার জন্যে। তাঁকে হিপনোটাইজ করে চিকিৎসা সময়ে ভদ্রমহিলা ব্যক্ত করলেন তাঁর একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ।

উনি গিয়েছিলেন তাঁর এক সহযোগী ভদ্রমহিলার বাড়িতে। দেখেছিলেন, সেই বাড়ির পোষা কুকুরটা জল খাচ্ছে গেলাস থেকে। দৃশ্যটি দেখেই তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ জেগে ওঠে এই ভদ্রমহিলার মনে যুগপৎ সহযোগী ভদ্রমহিলা এবং তার পোষা কুকুরের ওপর। অথচ কাউকে তা প্রকাশ করেননি, বিলক্ষণ শান্ত থেকেছেন।

জল খাওয়ার অসুবিধে শুরু হল এরপর থেকেই। অথচ একবারও মনে করেনি যে, জল খাওয়ার এই আতঙ্কের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে গেলাস থেকে কুকুরের জলপানের বিরক্তিকর দৃশ্যের সঙ্গে। কদর্য সেই ঘটনার কথাও তাঁর মনে ছিল না। কিন্তু হিপনোটাইজড় থাকা অবস্থায় ঘটনাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে গেলেন এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে

কুকুর আর কুকুরের মালিকের প্রতি তাঁর যে ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সমস্তই ঝেড়ে মন থেকে বের করে দিলেন।

এরপরেই এক গেলাস জল খেতে চাইলেন হিপনোটাজড থাকা অবস্থাতেই এবং নিমেষে পান করলেন গেলাস ভর্তি জল।

তারপর আর কোনো অসুবিধে হল না। জল পান করা অবস্থাতেই কেটে গেল তাঁর হিপনোটিজম্ এর ঘোর, তখনও দেখলেন খেয়ে চলেছেন হাতে গেলাসের জল।

এরপর থেকে গেলাসে জল ভরে নিয়ে গেলাস থেকে জলপানে আর তাঁর কোনো অসুবিধে দেখা দেয়নি।

এই ঘটনায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন ফ্রয়েড, তারই সূত্র ধরে আবিষ্কার করলেন তাঁর মনঃসমীক্ষা চিকিৎসা পদ্ধতি (psycho analytic method of treatment)।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন, হিপনোটাইজ না করেও রোগীকে যদি তাঁর মনের সমস্ত চিন্তার আনাগোনাকে নির্বিবাদে মুখ দিয়ে বলতে দেওয়া যায়, তাতেও একই কাজ হয়। ফ্রয়েড এই পদ্ধতির নাম দিলেন অবাধ-ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতি (free association method)।

এরপর ফ্রয়েড লক্ষ্য করলেন যে, রোগীর সদিচ্ছা যতই থাকুক না কেন, সে তার অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। কোথায় যেন একটা বাধা (resistance) থেকে যায়। অভিজ্ঞতার প্রকাশে এই বাধার কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখলেন-রোগীর চেতনায় (consciousness) ওই সব অভিজ্ঞতা সব সময়ে থাকে না, থাকে তার নির্জ্ঞান (unconscious) মনে। এই ধরনের ঘটনা, যার ফলে কোনো অভিজ্ঞতা নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হয় এবং সহজে ওই অভিজ্ঞতাকে চেতনায় আনা যায় না, তাকেই বলা হয় অবদমন (respression)।

অবদমন একটি বিশেষ মানসিক ক্রিয়া যার থেকে মনের কাজের গতিশীলতার (dynamism) পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসক এবং রোগী যখন কিছুদিন ধরে একান্তে আলোচনা করতে থাকে, তখন এদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের মত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রোগীর মনে নানা অসম্ভব চিন্তা, আবেগ এবং দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিতে থাকে। এগুলি অনভিজ্ঞ চিসিৎককে অবশ্যই বিব্রত করতে পারে। এই ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড উপলব্ধি করলেন যে— এই ধরনের আবেগ অনুভূতির মধ্যে দিয়ে রোগীকে যেতে হয়েছিল তার অতি-শৈশবে ; সেই সময়ের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি (যেমন, বাবা-মা)দের সম্বন্ধে যা-যা মনে হয়েছিল, এতদিন তা অজ্ঞাতই ছিল রোগীর কাছে ; কিন্তু এখন সেগুলি প্রতিফলিত হচ্ছে চিকিৎসকের ওপর। এক কথায়, শৈশবের ভুলে যাওয়া সমস্ত অভিজ্ঞতা চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এই ধরনের যে পারস্পরিক সম্পর্ক চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে প্রকাশ পায়, তাকে বলা হয় ট্রান্সফারেন্স (transference)। এই ট্রান্সফারেন্স কখনও হয় মিত্রভাবাপন্ন (positive transference), আবার কখনও হয় বিরোধীভাবাপন্ন (negative transference); মিত্র ভাবের অবস্থায় চিকিৎসককে রোগীর মনে হয় অসাধারণ সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি। এই অবস্থায় রোগী চায় চিকিৎসককে খুশি রাখতে এবং তার অতিশয় স্নেহভাজন হতে। বিরোধীভাব অবস্থায় চিকিৎসকের প্রতি রোগীর ঘৃণা, বিদ্বেষ, ইত্যাদি প্রকাশ পায় এবং চিকিৎসককে অতি নীচ, হীন ব্যক্তি বলে মনে হয়। এই অবস্থায় চিকিৎসকের প্রতি বিরূপ

মনোভাবের জন্যে চিকিৎসা বন্ধ করতেও উদ্যোগী হয় রোগী।

আপাতদৃষ্টিতে এই 'ট্রান্সফারেন্স সম্পর্ক' মনে হতে পারে অত্যন্ত অবাস্তব ঘটনা, কিন্তু এই সম্পর্কই হচ্ছে মনোচিকিৎসায় সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। উপযুক্ত ভাবে একে ব্যবহার করতে পারলে অনেক সুগম হয় রোগ নিরাময়ের পথ। এই পদ্ধতিকে ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারাটাই মনোচিকিৎসকের কৃতিত্ব।

এই ট্রান্সফারেন্সকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে রোগীর শৈশবের অভিজ্ঞতা (যা তার বিস্মৃতিতে ডুবে ছিল) গুলিকে যেমন স্বচ্ছভাবে বোঝা যায়, ঠিক তেমনি সেই সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান জীবনের সম্পর্ক এবং রোগের উৎস কোথায়, তার সন্ধান পাওয়া যায়।

মনোচিকিৎসকের কাজ হচ্ছে, এগুলিকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো। সফলভাবে তা করা গেলে রোগী তার নিজের মনোজগৎ সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি করতে পারে, লুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় এবং নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে বাস্তব জীবনের সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান করতে সক্ষম হয়। আরও একটা দিক আছে এই ট্রান্সফারেন্সের ; একে বলা হয় বিপরীত ট্রান্সফারেন্স (counter tranference); এর মাধ্যমে রোগীর প্রতি চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। ট্রান্সফারেন্সে যেমন চিকিৎসকের প্রতি রোগীর ধ্যান-ধারণা-আবেগ প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি বিপরীত ট্রান্সফারেন্সে রোগীর প্রতি চিকিৎসকের মনোভাব প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রে এই মনোভাব কখনো মিত্র ভাবাপন্ন, কখনো বিরোধী ভাবাপন্ন হতে পারে। চিকিৎসকের মন তাতে প্রভাবিত হয়ে চিকিৎসার বিভ্রাট ঘটাতে পারে।

এই সব কারণে মনোচিকিৎসক হিসেবে পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে মনঃসমীক্ষা দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে বোঝা প্রয়োজন এবং সে কাজ যথাযথভাবে করা থাকলে তবেই ট্রান্সফারেন্সের উপযুক্ত ব্যবহার করে মনোচিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময় সম্ভব।

এই চিকিৎসার বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী রোগী এবং চিকিৎসককে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। এই ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একদিকে রোগী যেমন তার সমস্ত তথ্য চিকিৎসকের কাছে প্রকাশ করবে, ঠিক তেমনি চিকিৎসকও বৃত্তিগত জ্ঞানের দৌলতে রোগীর মনোজগতের বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে রোগীর নিরাময়ের সহায়ক হবে।

এই চিকিৎসাকে যেমন মানসিক রোগ নিরাময়ে প্রয়োগ করা হয়, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যেও নিয়োগ করা হয়।

প্রধানতঃ মনঃসমীক্ষা পদ্ধতিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল এখানে। মূল এই পদ্ধতির নানারকম পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভব ঘটেছে অন্যান্য মনোচিকিৎসার।

মনঃসমীক্ষায় মনের কাজগুলির ব্যাখ্যা করা হয় মূল কয়েকটি তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে। তত্ত্বগুলি এই রকম :

(১) মনের কার্যকারিতা বিচার করলে দেখা যায় যে মন তিনটে অংশের সমাবেশে গঠিত। প্রত্যেকটি অংশের কাজ কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই তিনটি অংশকে বলা হয় : ক। অদম্ (id), খ। অহম (ego), এবং গ। অধিশাস্তা (super ego)।

ক। অদম্ (id)

মনের আদি অবস্থা —জন্মগ্রহণের সময়ে মনের যে অবস্থা থাকে। এর মধ্যে থাকে

কতকগুলি সহজাত বৃত্তি, যেগুলো অহরহ বাস্তব অবস্থাকে এবং বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে নির্বিচারে সুখের সন্ধানে ধাবিত হয়।

খ। অহম্ (ego)

বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অদমের একটি অংশ পরিবর্তিত হয়। এর প্রধান কাজ : বাস্তব অবস্থা এবং অধিশাস্তার অনুশাসনকে মেনে অদম্-এর বৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করা।

গ। অধিশাস্তা (super ego)

শৈশবে পিতামাতা অথবা পিতামাতা স্থানীয় ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকাকালীন তাদের আচার-আচরণের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য শিশুর মনকে প্রভাবিত করে এবং তার একটা স্থায়ী ছাপ স্মৃতিতে রেখে দেয় ; এর দ্বারাই অহম্-এর কিছু অংশ অধিশাস্তা রূপে উদ্ভূত হয়। এর প্রধান কাজ হচ্ছে শৈশবের শিক্ষালব্ধ নীতিবোধ এবং আদর্শ অনুসারে অহম্কে প্রভাবিত করা।

(২) দুটি সহজাত বৃত্তি (instincts) তাদের শক্তির সাহায্যে মনের সমস্ত কাজগুলিকে পরিচালনা করে। এরা ক) জীবনবৃত্তি (life instinct) আর খ) ধ্বংসবৃত্তি (destructive instinct) নামে পরিচিত।

(৩) শিশুর জন্মগ্রহণের পর থেকে মন তথা সমগ্র ব্যক্তিত্ব ধাপে-ধাপে কতকগুলি স্তরের মাধ্যমে বিকশিত হয়।

(৪) সমগ্র মনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রকৃতি বা গুণের অস্তিত্ব মানা হয়েছে। এই বিশিষ্ট প্রকৃতি বা গুণগুলি হচ্ছে :

ক। নির্জ্ঞান (unconscious)-মনের যে সব অভিজ্ঞতা নির্জ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেগুলির অস্তিত্ব সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

খ। আসংজ্ঞান (preconscious)-যে সব অভিজ্ঞতা আসংজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকে, সেই সব স্মৃতিকে সহজে চেতনায় (consciousness) আনা যায়।

গ। চেতনা (conscious) -এর প্রভাবে যে-সব অভিজ্ঞতা থাকে, সেগুলি হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের মনে যা রয়েছে।

মনের বিষয়ে এই সব মূল তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে মনঃসমীক্ষার বই পড়া দরকার।

মনোচিকিৎসা কত রকমের হতে পারে

মনোচিকিৎসা নানা ধরনের হতে পারে। যেমন :

(১) সরল অথবা জটিল পদ্ধতি।

(২) স্বল্প মেয়াদী অথবা দীর্ঘ মেয়দী।

(৩) একক অথবা একত্রে।

(৪) শিশু মনোচিকিৎসা অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের মনোচিকিৎসা, ইত্যাদি।

সহায়ক মনোচিকিৎসা (supportive psychotherapy) অপেক্ষাকৃত সরল মনোচিকিৎসা। এ চিকিৎসায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের শিক্ষার্থীকে কিছুদিন শিক্ষানবীশ হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে এ কাজ করার পর তবে তার পক্ষে এই চিকিৎসা প্রয়োগ করার যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব।

তবে যেগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল মনোচিকিৎসা, যেমন-মনঃসমীক্ষা (psychoanalysis)

-সে বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন বিশেষ নিয়মে পুঁথিগত এবং ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করতে হয়।

মনোচিকিৎসাকে আরও যেভাবে দেখা যায় : যখন একজন চিকিৎসক একই বৈঠকে (session or sitting) একজন রোগীর চিকিৎসা করেন, তখন তা একক মনোচিকিৎসা (individual psychotherapy) ; আর যখন একই বৈঠকে একাধিক রোগীর চিকিৎসা করা হয়, তখন তা একত্রে মনোচিকিৎসা (group psychotherapy)।

সহায়ক মনোচিকিৎসা (Supportive Psychotherapy)

এটি এক প্রকার সরল মনোচিকিৎসা। এতে বর্তমান জীবনের সমস্যা শোনা, তা নিয়ে আলোচনা করা, এবং যুক্তি পরামর্শ-উৎসাহ-আশ্বাস দিয়ে উৎকণ্ঠার প্রশমন করা হয় এবং রোগীকে ফের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করা হয়। যে রোগী কোনো দুরূহ অবস্থায় পড়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, তাঁর ক্ষেত্রে এবং কোনো কোনো নিউরোসিস ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।
অবস্থা বিশেষে এই সহায়ক মনোচিকিৎসা স্বল্পমেয়াদী অথবা দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে।

মনঃসমীক্ষা (Psychoanalysis)

মনঃসমীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। এই চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত জটিল। দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে, এমন নিউরোসিস রোগে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিকারে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। এতে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক বৈঠক এবং দীর্ঘ সময় লাগে।

একত্রে মনোচিকিৎসা (Group psychotherapy)

এ চিকিৎসায় একজন চিকিৎসক এবং কয়েকজন রোগীকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। প্রত্যেক রোগীই তার সমস্যা সকলের সামনে বলতে পারে এবং সেই সমস্যা নিয়ে দলের যে কেউ মন্তব্য করতে পারে। এখানে চিকিৎসকের ভূমিকা কতকটা নেতৃস্থানীয়র মত। এই নেতাই ঠিক করবেন দলে কি রকম রোগী থাকবে, সংখ্যা কত হবে, কে সুস্থ হয়ে ছেড়ে যাবে, নতুন কে আসবে ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলে একাধিক চিকিৎসকও থাকেতে পারে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীদের আত্মীয়স্বজনেরাও থাকতে পারে।

বিশেষ ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা একটি রোগী এবং ওই রোগীর সমগ্র পরিবারকে নিয়ে দল (family psychotherapy) গঠিত হতে পারে ; অবার দম্পতির দুজনকে নিয়ে (conjugate psychotherapy) এক বা একাধিক চিকিৎসক একসঙ্গে দল গঠন করতে পারেন।

এক্ষেত্রে মনোচিকিৎসায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ মনঃসমীক্ষা তত্ত্ব এবং পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়।

অনেক প্রকার মনোচিকিৎসা প্রচলিত আছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এইসব মনোচিকিৎসায় অনেক মিলও আছে। এই মিল (similarity)গুলি হচ্ছে :

(১) রোগীর কথা শোনা এবং তার সঙ্গে কথা বলা—চিকিৎসকের বেশির ভাগ মনোচিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর কথা বেশি শোনা প্রয়োজন—তাতে রোগীর পক্ষে নিজেকে বোঝার বেশি সুবিধে হয়। রোগীর কথা বলার অর্থ, তার চিন্তা কথায় ব্যক্ত করা। এতে রোগীর কাছে তার নিজের ধারণাগুলি আরও পরিষ্কার হয়।
(২) যারা মনোচিকিৎসায় আসে, তাদের আত্মবিশ্বাস প্রায়ই কমে যায়, তাই সব রকম মনোচিকিৎসাতেই এদের উৎসাহ দিয়ে মনোবল ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা হয়।
(৩) প্রায় প্রত্যেক মনোচিকিৎসাতেই রোগীকে তার আবেগ প্রকাশে সুযোগ দেওয়া হয়। তাতে রোগীর মনের ভার কমে।
(৪) প্রায় প্রত্যেক মনোচিকিৎসায় যুক্তিপূর্ণ বাস্তবধর্মী আলোচনা থাকে, যার ফলে রোগীর পক্ষে তার নিজের সমস্যাগুলিকে বুঝতে সুবিধে হয়, তেমনই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে এবং সমস্যার বাস্তব সমাধানের পথ বের করতে সহায়ক হয়।

মনোচিকিৎসায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে কি ধরনের ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন

মানুষকে যারা পছন্দ করে, যারা নিজের অস্তিত্বকে অবিচল রেখে সহজে অন্যের অনুভূতিতে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে, যারা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সহজে বুঝতে পারে, যারা ধৈর্যশীল, সংযমী, সহজে বিচলিত হয় না, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে যাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে এবং যারা বিভিন্ন অবস্থার মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলতে পারে, তারাই মনোচিকিৎসক হবার যোগ্য।

অনেক সময়ে একই রোগীর ক্ষেত্রে মনোচিকিৎসা এবং ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা একই সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। একজন মনোচিকিৎসকের ডাক্তারি ডিগ্রী না থাকতেও পারে। এই রকম মনোচিকিৎসক ওষুধ প্রয়োগের জন্যে উপযুক্ত ডাক্তারের কাছে রোগী পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন।

২৭

শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্ব
এবং
আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসা
(Principle of Learning and Behaviour Therapy)

আমরা শিক্ষালাভ করি কি ভাবে ? বিরামহীন ভাবে আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছি আর সেই অভিজ্ঞতার প্রভাব পরবর্তী কাজে কর্মে, আচার-ব্যবহারে প্রতিফলিত হচ্ছে। এইভাবে আমরা কর্মে দক্ষতা অর্জন করি এবং ক্রমে ক্রমে সেই দক্ষতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। সামাজিক আচার আচরণও এইভাবে বদলে যায়।

মানুষের হাব-ভাব আচার-আচরণ কখনো এমন হয় যা তার ব্যক্তিজীবনে আর সমাজ জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার উপযোগী হয়। এই ধরনের শিক্ষা আমাদের স্বাভাবিক ভাবে জীবন ধারণে সাহায্য করে। কখনো কখনো গোলমালে অবস্থায় পড়ে অভ্যাস, অথবা আচার-আচরণ এমনই অস্বাভাবিক হতে পারে যা মানুষের চলার পথে নানা বাধার সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রার অন্তরায় হয়। এই সব অস্বাভাবিক আচার-আচরণ কখনো কখনো মনোবিকারের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়।

যে-সব বিজ্ঞানী মানুষের শিক্ষার সঙ্গে আচরণের সম্বন্ধ নিয়ে গবেষণা করে মানসিক রোগের উৎস এবং তার প্রতিকারের পথের সন্ধান দিয়ে এক নতুন দিগন্তের আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করা আবশ্যক।

এই নতুন দিগন্তের মূল আবিষ্কর্তা হলেন বিশ্ব বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী আইভ্যান পেট্রোভিচ প্যাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬)। প্যাভলভের গবেষণা ছিল প্রধানতঃ গবেষণাগারে জীবজন্তুদের ওপর। তাঁর আবিষ্কারের সূত্র ধরে যে তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানী মানুষের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক আচরণের কারণ উদ্‌ঘাটন করা এবং অস্বাভাবিক আচরণকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হচ্ছেন জন ব্রোডাস ওয়াটসন (১৮৭৬-১৯৫৮), এডওয়ার্ড লী, থর্নডাইক (১৮৭৪-১৯৪৯), এবং বুরহাস ফ্রেডরিক স্কিনার (১৯০৪-১৯৯০)। এঁদের আবিষ্কারের কথা এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

আইভ্যান পেট্রোভিচ প্যাভলভ

বিখ্যাত শারীরবৃত্তবিদ্ (Physiologist) প্যাভলভ কুকুরের ওপর তাঁর গবেষণার সময়ে লক্ষ্য করলেন, শুধু যে মুখে খাদ্য দিলেই কুকুরের লালা নিঃসরণ হয়, তা নয়। এমন কি সে যখন খাবার দেখছেও না, খাবারের গন্ধও পাচ্ছে না, তখন যদি শুধু শুনতে পায় তারই পায়ের শব্দ যে তাকে রোজ খাবার খেতে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে লালায় ভরে ওঠে কুকুরের মুখ। এই যে পায়ের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে লালার নিঃসরণ ঘটছে, এটা একটা শারীরিক ক্রিয়া। প্যাভলভ এর নাম দিলেন, শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (conditional response)।

শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditional Response)

আমরা জানি মুখে খাদ্য দিলে লালা ঝরে— এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সংকেত বা শর্তহীন সংকেত (natural stimulus or unconditional stimulus)-এর কাজ করছে- যার ফলে শরীরের একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া বা **শর্তহীন প্রতিক্রিয়া** (natural **response or unconditional response)** সংঘটিত হয়। কিন্তু পায়ের শব্দ লালা নিঃসরণ হবার পক্ষে একটি স্বাভাবিক সংকেত নয়। দিনের পর দিন খাদ্য সরবরাহকারীর পায়ের শব্দের সঙ্গে মুখে খাদ্য দেওয়া যখন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে-তখনই শুধুমাত্র ওই শব্দই লালা ঝরাতে পারছে। এই ঘটনার অভিজ্ঞতা প্যাভলভ তাঁর গবেষণাগারে নানাভাবে অনুরূপ সংকেত দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, স্বাভাবিকভাবে ঘন্টা বাজালে কুকুরের লালা ঝরে না। কিন্তু ঘন্টা বাজানোর পরেই যদি নিয়মিত খাবার দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে-শুধুমাত্র ঘন্টা বাজালেই ওই কুকুরের লালা ঝরছে। এখানে ঘন্টার সংকেত হচ্ছে-সাপেক্ষ সংকেত (conditional stimulus); আর ঘন্টা বাজানোর জন্যে যে লালা নিঃসরণ হচ্ছে, তাকে বলা হয় শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (condtional response)।

প্যাভলভ তাঁর এই গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা চালিয়ে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। সংক্ষেপে সেগুলি হচ্ছে—

১) শর্তসাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার নিবৃত্তি (extinction)।
২) সামান্যীকরণ (generalization)।
৩) পার্থক্য বিচার (discrimination)।

১। নিবৃত্তি (Extinction)

শর্তসাপেক্ষ ঘন্টা বাজানোর ফলে শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া লালা নিঃসরণ ক্রিয়া চালু হল। এরপর যদি ঘন্টা বাজানোর পর খাবার দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ওইভাবে কিছুদিন চলতে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে, ঘন্টা বাজালেও ওই কুকুরের আর লালা ঝরছে না। এই প্রতিক্রিয়ার নাম নিবৃত্তি (extinction)।

চিত্র-৮
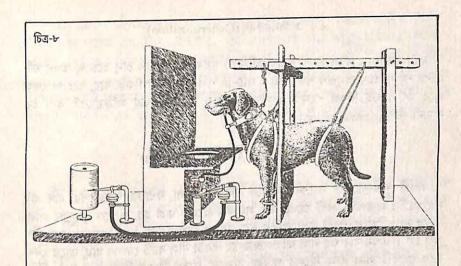
পরীক্ষাধীন কুকুর

আইভ্যানপ্যাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬)

২। সামান্যীকরণ (Generalization)

ঘণ্টা বাজানোর ফলে লালা ঝরার প্রক্রিয়াটি যখন ভালোভাবে চালু হয়েছে, তখন যদি ঘণ্টার শব্দের প্রায় অনুরূপ শব্দ ঘণ্টা বাজানোর পরিবর্তে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে ঘণ্টার ওই বিকল্প শব্দেও একইভাবে লালা ঝরছে। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সামান্যীকরণ (generalization)।

৩। পার্থক্য বিচার (Discrimination)

একটি শর্ত-সাপেক্ষ সংকেতের সঙ্গে কুকুরের লালা ঝরানো হবার পর যদি ওই সংকেতটির জায়গায় একটি যথেষ্ট ভিন্ন সংকেত প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কুকুরের লালা ঝরবে না। যেমন একটি লাল বাতির সঙ্গে খাবার দেওয়া যুক্ত করে লালা ঝরানো চালু করা হল। এখন যদি ওই লাল বাতির জায়গায় একটা নীল বাতি দেওয়া যায়, তাতে দেখা যাবে কুকুরটি লাল এবং নীলের পার্থক্য বুঝেছে, ফলে, নীল বাতিতে লালা ঝরেনি। একেই বলা হয় পার্থক্য বিচার (discrimination)। প্যাভলভের গবেষণাগারে যখন এই পার্থক্য বিচারের পরীক্ষা চলছিল, তখন একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটে, যে ঘটনাটি তাঁর গবেষণায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ঘটনাটি ১৯১৪ সালে ঘটে। ঘটনাটির বিবরণ এই রকম :

একটি ডিম্বাকৃতি দরজা পেরিয়ে গেলে খাবার পাওয়া যায়— এইভাবে শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর দেখা গেল, ডিম্বাকৃতি দরজাটি দেখলেই কুকুরটার লালা ঝরে। ডিম্বাকৃতি দরজার জায়গায় যখন সম্পূর্ণ বৃত্তাকার (গোলাকার) দরজা রাখা হল, তখন দেখা গেল, দুটি দরজার পার্থক্য বুঝতে পারছে সেই কুকুর এবং আর লালা ঝরছে না। এরপর এই ডিম্বাকার দরজাকে বৃত্তাকার দরজার পাশাপাশি রেখে ডিম্বাকার দরজাকে ক্রমে বৃত্তাকারের কাছাকাছি করতে করতে এমন অবস্থা করা হল যখন কুকুরটির পক্ষে ডিম্বাকারের সঙ্গে বৃত্তাকারের পার্থক্য বোঝা কঠিন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় পার্থক্য বের করার কঠিন সমস্যার মধ্যে রেখে আরও ৩ সপ্তাহ যাবৎ ওই পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সমাধান করা প্রায় অসম্ভব, এমন অবস্থায় কুকুরটাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে বাধ্য করার পর দেখা গেল,পার্থক্য বিচারে কাজের কিছুই উন্নতি তো হয়ইনি, বরং বিচার শক্তির অবনতি হতে হতে দুটি দরজার মধ্যে তফাৎ ধরবার ক্ষমতাও একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সেই কুকুরের। শুধু কি তাই? তার স্বভাব পর্যন্ত হঠাৎ বদলে গেল। শান্ত থেকে পরীক্ষার কাজে সহযোগিতা করে গেছে যে কুকুর, এখন সে বিরক্ত হয়ে চেঁচাচ্ছে, পরীক্ষার যন্ত্রপাতি কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবার চেষ্টা করছে। ওই অবস্থায় তাকে আরও পরীক্ষা করে দেখা গেল, আগে সে যতটুকু তফাৎ সহজেই বুঝতে পারছিল, এখন আর তাও পারছে না। সে যেন অন্য এক কুকুর। কুকুরের এই অবস্থাকে প্যাভলভ নাম দিলেন পরীক্ষামূলক নিউরোসিস (experimental neurosis)।

ঘুমের ওষুধ আর বিশ্রাম দিয়ে দীর্ঘদিন পর নিউরোসিস-আক্রান্ত কুকুরটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

এরপর প্যাভলভ নানা বিরক্তিকর, দুরূহ এবং বিপজ্জনক অবস্থায় কুকুরদের ফেলে তাদের মধ্যে পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টি করেছিলেন।

প্যাভলভের শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার ওপর মস্তিষ্কের প্রভাব বিষয়ে গবেষণার তাত্ত্বিক দিকের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান মানুষের মনের বিকারকে বুঝতে এবং তার চিকিৎসায় যথেষ্ট সাহায্য করেনি। কিন্তু তাঁর শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (conditioned response) এবং পরীক্ষামূলক নিউরোসিসের তথ্য বহু প্রতিভাবান গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং মনের রোগের কারণ উদ্‌ঘাটনে আর চিকিৎসায় যে পথের সন্ধান দিয়েছে, তা মনোরোগ চিকিৎসার প্রগতির পক্ষে এক অমূল্য সম্পদ।

জন ব্রোডাস ওয়াটসন (১৮৭৮-১৯৫৮)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মনের কাজগুলোকে বোঝাবার জন্য প্রধানতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণই ছিল মনোবিজ্ঞানীদের প্রধান বিচার্য বিষয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অন্তঃদর্শন পদ্ধতি (introspective method)। ওয়াটসন দেখলেন যে, এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ঠিকভাবে যাচাই করে দেখা যায় না। তাই তিনি মনে করলেন, এভাবে কখনো বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন মানুষের আচার-আচরণ অর্থাৎ তার হাব-ভাব, ব্যবহার (behaviour)কে একজন পর্যবেক্ষকের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা এবং সেগুলির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। তাছাড়া, যে-সব উদ্দীপক (stimulus)মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা কিছু ওই সব আচরণে উৎসাহ যোগায়, সেগুলিও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই আচরণ বিশ্লেষণ-যোগ্য এবং কার্যকারণ নীতির দ্বারা পরিচালিত। অতএব এই আচরণই বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য। ওয়াটসন এই বিজ্ঞানের নাম দিলেন আচরণ বিজ্ঞান বা চেষ্টিতবাদ (behaviourism)।

জনস্ হপকিনকস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াটসন ১৯১৯ সালে উপলব্ধি করলেন, প্যাভলভের শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার ফলেই ভয়-ভীতি-আতঙ্কের উদ্ভব হয়। এই সময়ের তাঁর একটি বিখ্যাত গবেষনার কথা বলি।

এলবার্ট নামে ১১ মাস বয়সের এক শিশু সাদা ইঁদুর খুব পছন্দ করতো। সাদা ইঁদুর দেখলেই তার কাছে সে যেতে চাইতো। এরপর এমন একটা ব্যবস্থা করা হল যাতে এলবার্ট যখনই সাদা ইঁদুরের কাছে যেতে চাইতো তখনই একটা বিশ্রী ভয়াবহ বিকট আওয়াজ করা হতে থাকলো। ঐ শব্দটা শুনলেই শিশুটি আঁৎকে ত উঠতোই, কখন কখন ডুকরে কেঁদেও ফেলত। বারে বারে ঐরকম করতে করতে দেখা গেল ঐ শব্দ ছাড়াই সাদা ইঁদুর দেখলেই ভয়ে আতঙ্কে শিশুটি অস্থির হয়ে পড়ছে। এলবার্ট এখন পুরোপুরি আতঙ্ক বা ফোবিয়া (phobia)র রোগী। এলবার্ট এখন আর শুধু সাদা ইঁদুরের প্রতিই ভয় পায় তা নয়, - যে কোন লোমশ প্রাণী বা লোমশ বস্তু দেখলেই সে ভয় পাচ্ছে। আতঙ্ক এখন যে কোন লোমশ জিনিসেই। এই যে এক জিনিসের ভয় থেকে অনুরূপ অন্য জিনিসের প্রতি ভয় জন্মায়, এগুলি সামান্যীকরণ (generalization) প্রক্রিয়ার ফলেই হয়।

এর কিছুদিন পরেই অবশ্য এই ধরনের আতঙ্কগ্রস্তদের জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছে আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসা।

এই পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়, শিক্ষার দ্বারাই (by way of learning) অস্বাভাবিক আচরণ অথবা মানসিক রোগের লক্ষণের উদ্ভব হতে পারে।

১৯২৪ সাল নাগাদ ওয়াটসন অনুমান করেছিলেন যে, মানুষের স্বাভাবিক অস্বাভাবিক

জে. বি. ওয়াটসন (১৮৭৮-১৯৫৮)

চিত্র-৯

সমস্ত স্বভাবের মূলে রয়েছে প্যাভলভের শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া।

এডওয়ার্ড লী থর্নডাইক (১৮৭৪-১৯৪৯)

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক থর্নডাইক জীবজন্তুদের ওপর শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় নিযুক্ত থাকার সময়ে ১৮৯৮ সালে যে শিক্ষা বিষয়ক নীতিটি আবিষ্কার করেছিলেন, সেটি -'কর্মের ফলই শিক্ষাকে নির্ধারণ করে (law of effect in learning)'। থর্নডাইক তাঁর গবেষণাগারে জীব-জন্তুদের ওপর পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিলেন, কিভাবে একটি কাজের ফলাফল থেকে শিক্ষালাভ সম্ভব। তাঁর একটি পরীক্ষার কথা বলছি।

ক্ষুধার্ত একটা বেড়ালকে রাখা হয়েছিল একটা খাঁচার মধ্যে। খাঁচার বাইরে রাখা হয়েছিল বেড়ালের পছন্দসই একটুকরো লোভনীয় খাবার। খাঁচা ছিল বন্ধ। খাঁচার মধ্যে দড়ি দিয়ে ঝোলানো ছিল একটা লোহার আংটা। এমনই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে আংটা ধরে টানলেই দড়ির টানে খুলে যাবে খাঁচার দরজা। এবার দেখা যাক, এ অবস্থায় কি করেছিল সেই বেড়াল।

অস্থিরভাবে সে খাঁচা থেকে বেরোতে চেষ্টা করেছিল, খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথা গলানোর চেষ্টা করেছিল, থাবা দিয়ে এটা-সেটা টানা-হ্যাঁচড়া করছে— আর শেষের এই অস্থির থাবা-চালনার সময়ে আংটায় থাবা মারতেই দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়তে খাঁচার দরজা গেছে খুলে। বিড়ালটি বেরিয়ে গিয়ে লোভনীয় খাবারটি মজা করে খেয়ে নিল।

খাবার শেষ হওয়ার পর আবার তাকে ফিরিয়ে আনা হল বন্ধ খাঁচার মধ্যে। আবার খাঁচার বাইরে রাখা হল লোভনীয় এক টুকরো খাবার। আবার শুরু হল তার অস্থিরতা, বাইরে বেরোনোর জন্যে ব্যাকুলতা, লম্ফঝম্প এবং থাবা চালনা। এইবারে কিন্তু প্রথমবারের চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই সে টান মারল আংটায়, খুলে গেল দরজা, তৎপর বাইরে গিয়ে খাবারটি খেল।

বার কয়েক এই ব্যাপারটা ঘটানোর পর দেখা যাবে, ক্ষুধার্ত বেড়াল আর বেশিক্ষণ এদিক ওদিক করছে না ; সোজা গিয়ে থাবা চালিয়ে, দড়ি টেনে, খুলে ফেলছে দরজা এবং বেরিয়ে গিয়ে খাবারটি খাচ্ছে।

সোজা গিয়ে আংটা টেনে খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবার খাওয়ার কায়দা তাহলে শিখে নিয়েছে বেড়াল। কি বলা হয় এই ধরনের শিক্ষাকে ? থর্নডাইক এই শিক্ষার নাম দিলেন -'বারে বারে নিষ্ফল চেষ্টা করতে করতে শেষে সফল হওয়ার শিক্ষা (trial and error learning)'।

এইভাবে প্রথম-প্রথম গবেষণাগারের প্রাণীদের ওপর, তারপরে মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে থর্নডাইক বুঝলেন, যে-কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি সেই কাজের ফলে সেই জীবটি পুরস্কৃত (rewarded) হয়, তাহলে সেই কাজটা পুনঃ পুনঃ করার প্রতি তার ঝোঁক হবে এবং ওই অবস্থায় ওই কাজ করবার প্রবণতা জোরদার (reinforced) হবে। কিন্তু যে কাজ করে পুরস্কৃত না হয়ে শাস্তি (punishment) পাবে, সে ধরনের কাজের প্রতি তার প্রবণতা নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মানুষের আচার-আচরণ বা আভ্যাস পুরস্কার আর শাস্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। আরও দেখলেন; মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরস্কারের প্রভাব অনেক বেশি, শাস্তির প্রভাব অতি নগণ্য। থর্নডাইকের এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব প্রায় সর্বত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে।

বুরহাস ফ্রেডরিক স্কিনার (১৯০৪-১৯৯০)

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্কিনার শিক্ষা বিষয়ক যে-দুটি গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে-দুটি হচ্ছে:

১) প্যাভলভের বিখ্যাত 'শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা' (Conditioned learning) এবং

২) থর্নডাইকের 'বারে বারে নিষ্ফল চেষ্টা করার শেষে সফল হওয়ার শিক্ষা' (trial and error learning)।

স্কিনার তাঁর গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে বুঝলেন শিক্ষা প্রধানতঃ নির্ভর করে প্রাণীটির চারদিকের ঘটনা (events) এবং উদ্দীপকগুলির (stimuli) ওপর। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে সব উদ্দীপকগুলি আছে, সেগুলি সেই প্রাণীর শিক্ষাকে পরিচালিত করে এবং তার আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই উদ্দীপকের শক্তি বা তীব্রতার দ্বারাই তার প্রতিক্রিয়া (response) নির্ধারিত হয়।

এরপর স্কিনার তাঁর গবেষণাগারে অত্যন্ত সহজ সরল পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করলেন যে, প্যাভলভের শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা এবং থর্নডাইকের 'বারে বারে নিষ্ফল চেষ্টা করার শেষে সফল হওয়ার শিক্ষার' মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। তাঁর একটা গবেষণার কথা ধরা যাক।

একটা খাঁচার মধ্যে টিনের ছোট্ট একটা বাটি আর একটা সাদা ইঁদুরকে রাখা হল। খাঁচার বাইরে একটা যন্ত্রকে রাখা হল এমন ভাবে যাতে ওই যন্ত্র থেকে ইঁদুরের প্রিয় খাবারের একটা বড়ি টুপ্ করে ফেলে দেওয়া যায় টিনের ছোট্ট বাটিটার মধ্যে। এমনই ব্যবস্থা করা হল যাতে বাটিতে খাবার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠুং করে শোনা যাবে একটা শব্দ। এখন দেখা যাক, ইঁদুর কি করেছিল বাটিতে বড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

দেখা গেল, বাটিতে সশব্দে খাবারের বড়ি আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর শব্দ শুনে এগিয়ে যাচ্ছে বাটির দিকে, যেখানেই তখন সে থাকুক না কেন, সেখান থেকেই সে এগোবে বাটি লক্ষ্য করে। কাছে গিয়েই দেখবে তার প্রিয় খাবার এবং খেয়েও ফেলবে তক্ষুনি।

কিছুক্ষণ পর পর একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করার পর দেখা যাবে, কাজটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে ইঁদুর ; ঠুং শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তীরবেগে ধেয়ে যাচ্ছে বাটি লক্ষ্য করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্কিনারের এই ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষার সঙ্গে থর্নডাইকের বেড়াল নিয়ে পরীক্ষার সঙ্গে খুব একটা তফাৎ নেই। শুধু যা বেড়ালের কাজটাকে ইঁদুরের কাজের চেয়ে একটু বেশি জটিল করা হয়েছে। ফলে, ইঁদুরের তুলনায় বেড়ালকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে, বেশি সময় নিতে হয়েছে খাবার জোগাড় করার জন্যে।

ইঁদুরের এই পরীক্ষাটিকে অবশ্য একটু জটিল করে দেওয়া যায়। যেমন, খাঁচার ভেতরে একটা তারের জাল দিয়ে খাঁচাকে দু-ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল। একভাগে রইল ইঁদুর, আর একভাগে বাটি। জালের বেড়ায় রইল একটা দরজা, আর রইল একটা বোতাম, যে বোতামে ইঁদুর তার থাবা দিয়ে সামান্য চাপ দিলেই দরজা, যাবে খুলে। ঈষৎ জটিল এই খাঁচা নিয়ে পরীক্ষা করেও দেখা গেছে, ফল হচ্ছে একই। ইঁদুরকে যা শুধু একটু বেশি মেহনৎ করতে হচ্ছে, শিখে নিতে একটু বেশি সময়ও নিচ্ছে।

তাহলে এখন প্যাভলভের শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষার সঙ্গে স্কিনারের এই গবেষণার তুলনা

বি. এফ. স্কিনার (১৯০৪-১৯৯০)

করা যাক।
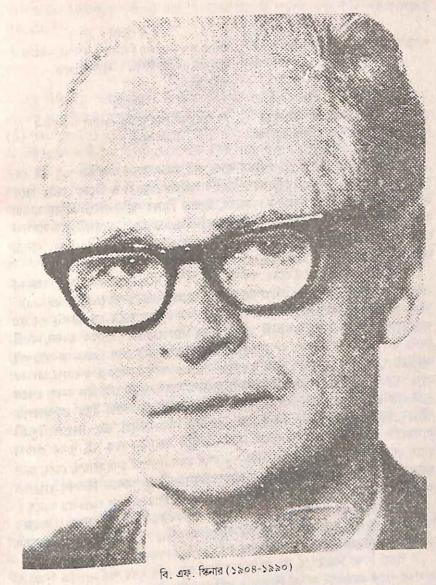
প্যাভ্‌লভের শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা	কুকুরের ঘণ্টার শব্দ→লালা নিঃসরণ→খাদ্য →ভক্ষণ শর্ত-সাপেক্ষ উদ্দীপন শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া
থর্ণডাইক অথবা স্কিনারের বারে বারে নিষ্ফল চেষ্টার পর সফল হওয়ার শিক্ষা	ইঁদুরের ঠুং শব্দ→টিনের বাটির→খাদ্য →ভক্ষণ দিকে গমন

দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, দুটি শিক্ষার মধ্যে সবই মিলে যাচ্ছে, গরমিল শুধু এই যে, কুকুরের লালা নিঃসরণ প্রক্রিয়াটি খাদ্য প্রাপ্তির সহায়ক নয়, কিন্তু টিনের বাটির দিকে ইঁদুরের গমন খাদ্য প্রাপ্তির সহায়ক। অর্থাৎ, ইঁদুরের টিনের বাটির দিকে এগিয়ে যাওয়া কাজটি শর্ত-সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned response) এবং ঠুং শব্দটি শর্ত-সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned stimulus)। স্কিনার তাঁর এই ধরনের শিক্ষার নাম দিলেন, সহায়ক শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা (operant or instrumental learning)।

আরও দেখা যাচ্ছে, সব রকমের শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যা-ই শেখা যাক না কেন, সেই শিক্ষাকে স্থায়ী করতে, জোরদার বা মজবুত করার ব্যবস্থা (reinforcement)টি থাকা আবশ্যক। এই জোরদার করার ব্যবস্থাটা এমন হতে পারে যে, একটা কাজের ফল-স্বরূপ যা ঘটল, তার ওই কাজটি পুনরায় করার দিকে ঝোঁকটা বাড়বে। যেমন, একটি কর্মের ফলস্বরূপ খাদ্য স্বীকৃতি, প্রশংসা, অর্থ, ইত্যাদি প্রাপ্তি ঘটে গেল ; এমন অবস্থায় ওই কর্মটিরই পুনঃ পুনঃ ঘটানোর দিকে প্রবণতা বাড়বে। আবার কাজের ফলাফল এমনও হতে পারে যে, কাজটার ফলে একটা বাধা সরে গেল, অথবা একটা কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। যেমন, গবেষণাগারে পরীক্ষার সময়ে একটা ইঁদুর যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে যদি যন্ত্রণাদায়ক বৈদ্যুতিক শক দেওয়া যায়, তাহলে ইঁদুরটি লাফালাফি করে এদিক সেদিক যেতে যেতে যেখানে বৈদ্যুতিক শক নই, এমন জায়গা পেয়ে গেলে, সেখানেই সে আশ্রয় নেবে। এরপর যখন নিরাপদ সেই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আবার বৈদ্যুতিক শক্ খায়, তাহলেই ফিরে আসবে নিরাপদ জায়গার আশ্রয়ে। এখানে, এই নিরাপদ স্থান প্রাপ্তিটা ওই লাফ দেবার কাজকে জোরদার করছে। মনে রাখতে হবে, এই জোরদার বা মজবুত করার পন্থাটি কিন্তু শাস্তি নয়। কোনো কাজের ফলে শাস্তি স্বরূপ যন্ত্রণাদায়ক কিছু ঘটলে, যে কাজটির ফলে এমনটা হয়েছে, সেই কাজটির আবার ঘটানো সম্ভাবনা কমে যায়।

এ পর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে যে সব আলোচনা করা হল, তার সবই শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা। বাস্তবিক পক্ষে যেভাবেই আমরা শিক্ষালাভ করি না কেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সব শিক্ষার মূলেই রয়েছে এই শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা সমাজের নানা লোকের সংস্পর্শে আসছি। তাদের সঙ্গে আমাদের ভাবের আদানপ্রদান ঘটছে। তাদের আচার-আচরণে যেগুলিকে আদর্শ স্বরূপ বলে মনে করছি, সেগুলিকে অনুকরণ করছি। অবশ্য এই অনুকরণের ফলে আমাদের আচার-ব্যবহারের যে পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তন সমাজে স্বীকৃত, পুরস্কৃত অথবা প্রশংসিত হওয়া চাই, তবেই সেই আচরণ স্থায়ী হবে। এই সব সামাজিক শিক্ষাগুলিকে

প্যাভলভের শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা এবং স্কিনারের সহায়ক শর্ত-সাপেক্ষ নীতি দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়।

আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসা (Behaviour Therapy)

এই চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক গবেষণা থেকে গৃহীত হয়েছে। যে চারজন বিজ্ঞানীর গবেষণা লব্ধ জ্ঞান থেকে এই চিকিৎসার উদ্ভব ঘটেছে, তাঁরা হচ্ছেন : (১) প্যাভলভ, (২) ওয়াটসন, (৩) থর্নডাইক এবং (৪) স্কিনার।

এই চিকিৎসা বিশ্বের তিনটি দেশে প্রায় একই সঙ্গে কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে শুরু হয়েছিল।

১। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গে উল্‌পে (Wolpe) তাঁর সহযোগীদের নিয়ে প্যাভলভের বিখ্যাত শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ করে তাঁর গবেষণাগারে প্রাণীদের মধ্যে নিউরোসিস নিরাময় করলেন কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এর পর তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার করে মানুষের আতঙ্ক (phobia) রোগে সেটি প্রয়োগ করে আশানুরূপ সুফল পেলেন। তাঁর এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম রীতিবদ্ধভাবে সংবেদনশীলতা মুক্ত করার পদ্ধতি(Systematic desensitization method)।

২। আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কিনার তাঁর আবিষ্কৃত সহায়ক শর্ত-সাপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতি গবেষণাগারে জীবজন্তুদের ওপর প্রয়োগ করে নিউরোসিস সৃষ্টি করলেন এবং সেগুলি সফলভাবে নিরাময়ও করলেন। তারপর তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং নৈপুণ্য মানুষের ওপর প্রয়োগ করেও সুফল পেলেন।

৩। গ্রেট বৃটেনের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাপিরো এবং আইসাক মার্ক মিলে অধুনা প্রচলিত শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বগুলির সাহায্যে উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করে পরীক্ষামূলক ভাবে রোগীদের নিউরোসিস নিরাময় করলেন। এবার প্রচলিত কয়েকটি আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসা পদ্ধতির (behaviour therapy) সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

(১) রীতিবদ্ধভাবে সংবেদনশীলতার অবসান ঘটানো (Systematic Desensitization)

যে-সব ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা উদ্রেককারী উদ্দীপকটিকে (anxiety provoking stimulus) পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়, সেই সব ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আতঙ্ক বা ফোবিয়া, অবসেশন, কমপালশন এবং কিছু যৌনবিকারে এই চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়।

এই চিকিৎসা তিনটি ধাপে প্রয়োগ করতে হয় :

ক) রোগীর লক্ষণগুলিকে উপযুক্তভাবে বিবেচনা করে যে-যে বস্তুতে বা অবস্থায় রোগীর উৎকণ্ঠা হয়, সেগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হয়। বস্তু বা অবস্থাগুলিকে তাদের উৎকণ্ঠা উৎপাদন করার ক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে পর-পর সাজাতে হবে যাতে সবচেয়ে মৃদুভয় বা উদ্বেগ উদ্রেককারীটি সবচেয়ে প্রথমে এবং সবচেয়ে তীব্র ভয় উদ্রেককারীটি সর্বশেষ স্থান পায়। এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম কাজ। এর একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

এক ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে খুবই আতঙ্কিত হন। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তাঁর ভয়

উদ্রেককারী উদ্দীপকগুলি সবচেয়ে কম থেকে সব চেয়ে বেশি পর্যন্ত গেলে এই রকম দাঁড়ায় :

অ। মরা কথাটা শুনলে ভয় (সবচেয়ে মৃদু)।

আ। দেখতে পাচ্ছেন না, দূর থেকে শুধু আওয়াজ শুনছেন 'বল হরি, হরি বোল' বলে মড়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে ভয়।

ই। সামনাসামনি মৃতদেহ দেখলে ভয়।

ঈ। শ্মশানে মৃতদেহ পুড়ছে। মৃতের পোড়াদেহ দেখলে ভয় (সবচেয়ে বেশি)।

খ) এরপর শরীর মনে একটা নিরুদ্বিগ্ন ভাবের সৃষ্টি করতে হয়। আমরা জানি উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হলে সে সময়ে শরীরে কতকগুলি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ সারা দেহের পেশীগুলি আংশিক সঙ্কুচিত হয়ে শরীরে একটা আড়ষ্ট ভাবের (tension) সৃষ্টি হয়। আরও দেখা যায় যে, শরীরের আড়ষ্ট ভাবের পরিবর্তে যদি শিথিল ভাব কোনক্রমে আনা যায়, তাহলে দেহে মনে একটা স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বিগ্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। ওই নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় কোনো উৎকণ্ঠা উদ্রেককারী উদ্দীপক বস্তু বা অবস্থা সহজে কোনো ব্যক্তির উদ্বেগ উদ্রেক করতে পারে না।

এই যে চিকিৎসা পদ্ধতি, যা দেহে মনে নিরুদ্বিগ্ন অবস্থার সৃষ্টি করে উৎকণ্ঠা উদ্রেককারী বস্তু বা উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রবণতাকে ব্যর্থ করে দেয়, তাকেই বলা হয়, বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে অবাঞ্ছিত মানসিক ক্রিয়াকে দমন করা (raciprocal inhibition)।

তাহলে এই দ্বিতীয় ধাপে আমাদের কাজ হচ্ছে, শরীরে শৈথিল্য আনার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই শৈথিল্যভাব সৃষ্টি করা যায় কিভাবে ?

সাধারণতঃ চারভাবে পেশীর শিথিল অবস্থা সৃষ্টি করা যায় :

অ) চিকিৎসক উপযুক্ত সংকেতের সাহায্যে রোগীর মনে এমন প্রেরণার সঞ্চার করতে পারে যাতে সেই প্রেরণার প্রভাবে রোগী তাঁর দেহকে ধীরে ধীরে শিথিল করতে পারেন।

আ) টেপ রেকর্ডারের নির্দেশের সাহায্যে রোগী নিজেই তাঁর শরীরে শৈথিল্য আনতে পারেন।

ই) সম্মোহনের দ্বারা এই কাজটি করা যায়।

ঈ) পেশীতে শৈথিল্যের সঞ্চার করতে পারে, এমন ওষুধ প্রয়োগেও সুফল পাওয়া যায়। ডায়াজেপাম জাতীয় ওষুধ এই কাজের পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

(গ) শেষ ধাপ হচ্ছে : সংবেদনশীলতার অবসান ঘটানো (Desensitization)

গভীরভাবে শরীর শিথিল থাকা অবস্থায় ক্রমোচ্চমানে সাজানো উদ্বেগসৃষ্টিকারী উদ্দীপকগুলিকে ক্রমান্বয়ে প্রয়োগের দ্বারা তাদের প্রভাব থেকে রোগীকে মুক্ত করা। শুরু করতে হবে সব চেয়ে কম মাত্রা থেকে, যাতে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয় -তারপর সেটা থেকে মুক্ত হলে যেতে হবে পরের উদ্দীপকে-এইভাবে পৌঁছতে হবে সর্বোচ্চ উৎকণ্ঠা সৃষ্টিকারী উদ্দীপকে। উদ্রেককারী বস্তু বা অবস্থাকে রোগীর কল্পনায় এনে, ছবিতে দেখিয়ে, অথবা বাস্তবিক অবস্থার মত সৃষ্টি করে, অথবা বাস্তবিক অবস্থার সম্মুখীন করিয়ে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করা যায়। রোগীর অবস্থা অনুসারে ধীরে ধীরে কিছুদিন যাবৎ ধৈর্য নিয়ে এই কাজ করতে হয়। উপযুক্ত শিক্ষাছাড়া এই কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয়।

২। তীব্রভাবে উদ্দীপক প্রয়োগ (Flooding)

আগের চিকিৎসা পদ্ধতিতে উদ্বেগসৃষ্টিকারী উদ্দীপকগুলিকে পর পর ক্রমোচ্চমান অনুযায়ী প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রথমেই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ সৃষ্টিকারী উদ্দীপকটিকে দেওয়া যায়। বাকি ব্যবস্থা আগের পদ্ধতির মতই। প্রথমেই তীব্রভাবে প্রয়োগ করলে চিকিৎসার সময় কম লাগে, কিন্তু রোগী একসঙ্গে সহ্য করতে পারবে কিনা, সেই বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩। অন্যের দেখে শেখার মাধ্যমে চিকিৎসা (Modelling)

শিক্ষার ত্রুটির জন্যে যেমন অযৌক্তিকভাবে ভয়ের উৎপত্তি হতে পারে, ঠিক তেমনি রোগীর যেখানে অহেতুক ভয়, সেখানে সে যদি লক্ষ্য করে ওই একই অবস্থায় বা বস্তুতে অন্যেরা নির্ভয়, তাহলে রোগীর সেই ভয় দূর হয়ে যেতে পারে। অহেতুক আতঙ্কগ্রস্ত শিশুকে যদি তার যেখানে ভয়, সেইখানে অন্য স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়— তাহলে স্বাভাবিক শিশুদের ওই অবস্থায় নির্ভয় আচরণ দেখার ফলে তারও আচরণ স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

একটি ৭/৮ বছরের শিশুর খরগোসের প্রতি ভয় ছিল। কিছুতেই তাকে খরগোসের কাছে নিয়ে যাওয়া যেত না। শিশুটিকে দিন কয়েক তার খেলার সাথীদের এক সঙ্গে নিয়ে খরগোসের সঙ্গে খেলতে দেওয়া হল। সে দেখল, অন্য শিশুরা দিব্বি খেলা করছে খরগোসের সঙ্গে। দিন কয়েক পরে সে নিজেই সাথীদের সঙ্গে, মিশে গিয়ে, খেলা শুরু করে দিল খরগোসের সঙ্গে।

৪। যন্ত্রণাদায়ক অথবা বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টির দ্বারা রোগ নিরাময় (Aversion Therapy)

বদ্ অভ্যাস বশে কোনো ব্যক্তি যখন একটি অবাঞ্ছিত কাজ করতে উদ্যত হচ্ছে, সেই সময়ে তাকে সেই কাজটি করতে দিয়ে একই সঙ্গে যদি তাকে কোনো যন্ত্রণাদায়ক বা বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, ওই অবাঞ্ছিত কাজটি করার দিকে তার ঝোঁকটা কমে গেছে, অথবা সম্পূর্ণ চলে গেছে। যেমন, মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তিকে যদি মদ্যপান করতে দিয়ে একই সঙ্গে বমি উদ্রেক করার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, ওই মদ্যাসক্ত ব্যক্তির মদ্যপানের প্রতি অনীহা জেগেছে।

৫। আকাঙ্খিত কাজের জন্য পুরস্কারের দ্বারা চিকিৎসা (Therapy by Positive Reinforcement)

শিশুদের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। এক্ষেত্রে শিশুর প্রতিটি বাঞ্ছিত বা আকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য তাকে তার পছন্দমত কিছু মুখরোচক খাদ্য দেওয়া, অথবা প্রশংসা করা (token economy);এর ফলে সেই আচরণটি পুনঃ পুনঃ করার দিকে শিশুটির মন আকৃষ্ট হবে। মনে করুন, একটি শিশু পরিষ্কার উচ্চারণ করে কথা বলতে পারে না ;

তাকে যদি প্রতিটি শুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে— পরিষ্কার উচ্চারণ করার দিকে শিশুটির প্রবণতা বাড়ছে।

২৮

সম্মোহন এবং সম্মোহন চিকিৎসা :
(Hypnosis and Hypnotherapy)

সম্মোহন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার প্রয়োগের ফলে সম্মোহিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ওই অবস্থায় সম্মোহনকারীর নির্দেশ অনুযায়ী সম্মোহিত ব্যক্তির ধারণার এবং অনুভূতির পরিবর্তন করানো যায়। এছাড়া, সম্মোহনকারীর আজ্ঞা অনুসারে সম্মোহিত ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ করানোও সম্ভব হয়।

এই সম্মোহন পদ্ধতির উদ্ভাবক অস্ট্রিয়ার একজন চিকিৎসক ফ্রান্‌জ অ্যানটন মেসমার (১৭৩৪-১৮১৫)। মেসমার ভিয়েনা থেকে মেধাবী ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করেন। তিনি যে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেছিলেন, তার বিষয়বস্তুও ছিল— "মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর গ্রহসমূহের প্রভাব"। মেসমার মানুষের দেহের ওপর চুম্বকশক্তির প্রভাব বিষয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এরপর তাঁর ধারণা হয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চুম্বকশক্তি নিহিত রয়েছে। এই থেকে তিনি যে সিদ্ধান্তে এলেন, তা এই : চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের দেহের এই চুম্বক শক্তি রোগীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে রোগীর দেহের চুম্বক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, এবং এই প্রক্রিয়ার দ্বারা রোগ নিরাময় করাও যাবে। তিনি এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছিলেন, মেসমেরিজম্‌। মানুষের দেহের এই চুম্বক শক্তিকেই প্রাণী চুম্বক (animal magnetism) মনে করা হত।

এরপর মেসমার তাঁর ওই ধারণা অনুযায়ী একটি চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কার করলেন। চিকিৎসার জন্যে জলভর্তি ঢাকনা দেওয়া টব রাখা হত এবং সেই টবে চুম্বক শক্তি সম্পন্ন কিছু লোহার গুঁড়ো দেওয়া থাকতো। টবের ঢাকনার ধারে কিছুদূরে থাকত অনেকগুলো ফুটো। প্রত্যেকটা ফুটো থেকে বেরিয়ে থাকত একটা করে লোহার রড। লোহার রডের দিকটা ডোবানো থাকতো টবের জলে। যাদের চিকিৎসা করা হবে, তাদের বসানো হত টবের চতুর্দিকের চেয়ারে। টব থেকে বেরিয়ে লোহার রডগুলির এক-একটিকে ছুঁয়ে থাকতো রোগীরা। আধো অন্ধকার বিরাজ করত চিসিৎসার ঘরে, -বাজানো হত একটা উপযুক্ত সঙ্গীতের সুর। এরপর মেসমার সেই ঘরে ঢুকতেন, টবের চারিদিকে পরিক্রমন করে নিতেন এবং চিকিৎসার প্রতীক্ষায় যারা চেয়ারে বসে আছে, তাদের প্রত্যেককে ছুঁয়ে যেতেন।

চিকিৎসার সুফল দেখে বাড়তে লাগল তাঁর খ্যাতি, সেই সঙ্গে বেড়ে যেতে লাগল তাঁর শত্রু। ফলে, তিনি ভিয়েনা ছেড়ে চলে গেলেন ফ্রান্সের প্যারি শহরে। সেখানেও

মেসমার (১৭৩৪-১৮১৫)

চিত্র-১২

মেসমারের প্রাণীচুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতি

জনসাধারণের কাছে চিকিৎসক হিসেবে বৃদ্ধি পেল তাঁর পসার, পেলেন প্রচুর সুখ্যাতি কিন্তু শত্রু হয়ে দাঁড়ালো অন্য চিকিৎসকরা। তাঁর চিকিৎসার সব দিক বিচার না করে তাঁকে ভণ্ড বলা হল এবং আরও নানা রকম অপমানজনক কুৎসা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হল। পরিণামে বিস্তর নির্যাতনের শিকার হতে হল তাঁকে। মনের দুঃখে তিনি চলে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং মারা গেলেন ৮১ বছর বয়সে। নানা অসম্মানের বোঝা নিয়ে মেসমারের মৃত্যু হলেও মৃত্যু হলো না তাঁর মেসমেরিজম-এর। পৃথিবীর বহু দেশেই অব্যাহত রইল তাঁর প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি।

মেসমারের মৃত্যুর ২৫ বছর পরে একজন স্কটিশ চিকিৎসক জেমস্ ব্রেড (১৭৭৫-১৮৬০) মেসমেরিজম্-এর ওপর গবেষণা করে স্থির করলেন-মেসমেরিজম্ এর ফলে রোগীর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা হচ্ছে একটি বিশেষ নিদ্রাবস্থা। এই কারণে তিনি এই পদ্ধতির নাম দিলেন— হিপনোসিস (hypnosis)।

সারকো ছাত্রদের সামনে সম্মোহন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করছেন

চিত্র-১৩

এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববিখ্যাত একজন ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিস্টিরিয়া রোগীদের ওপর হিপনোসিস বা সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগে চিকিৎসা করেছিলেন। ইনি প্যারি শহরের সন্ট পিটার হাসপাতালের প্রধান, জীন মার্টিন সারকো (১৮২৫-১৮৯৩)। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো—

১) হিস্টিরিয়া রোগ এক রকম সম্মোহিত অবস্থা ;

২) একমাত্র হিস্টিরিয়া রোগীদেরই সম্মোহিত করা সম্ভব ;

৩) এই সম্মোহিত অবস্থা একটি শারীরবৃত্তীয় (physiological) অবস্থা ;

৪) মস্তিষ্কের ক্ষয়ক্ষতি (degeneration of the brain)-এর ফলেই হিস্টিরিয়ার উদ্ভব হয়।

সম্মোহন চিকিৎসায় আগ্রহী, সারকোর-র সমসাময়িক, দু-জন চিকিৎসকের নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের একজন লিবলট (Liebeault) (১৮২৩-১৯০৪)। গ্রাম্য চিকিৎসক হলেও সম্মোহন করার ব্যাপারে এঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। আর একজন বার্ণহিম মস্তবড় স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। এই বার্ণহিম-ই লিবলট্-কে ডেকে নিয়ে এসে দুজনে মিলে বিখ্যাত ন্যানসি ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা করেন। বার্ণহিম আর লিবলট্ একযোগে গবেষণা করে যা পেলেন, তা দিয়ে সারকো-র হিস্টিরিয়া বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্তকে খন্ডন করা যায়।

এঁদের গবেষণার ফলগুলি এই :

১) হিস্টিরিয়ার শারীরিক লক্ষণগুলির কোনো শরীরভিত্তিক কারণ নেই ;

২) স্বাভাবিক ব্যক্তির ওপর সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগ করে হিস্টিরিয়ার সমস্ত লক্ষণগুলির আবির্ভাব ঘটানো যায় এবং ওই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে লক্ষণগুলি থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করা যায় ;

৩) সম্মোহিত অবস্থায় সম্মোহনকারীর আজ্ঞা অনুসারে ধারণা এবং কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করা সম্ভব ;

৪) সম্মোহনকারীর নির্দেশ অনুযায়ী ধারণার উদ্ভব এবং কর্মপ্রেরণার সঞ্চার যে প্রক্রিয়া দ্বারা ঘটে, তা সম্পূর্ণভাবে মানসিক প্রক্রিয়া।

এই নিয়ে ন্যানসি এবং সন্ট পিটারের মধ্যে দীর্ঘকাল বাক্‌বিতণ্ডা চলে। শেষে অবশ্য সারকো তাঁর ভুল স্বীকার করেন এবং সমস্ত মানসিক রোগেই যে মানসিক ক্রিয়ার প্রভাব থাকতে পারে, সেই ব্যাপারে গবেষণার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হন।

এখানে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের নামও উল্লেখ করা যায়। ইনি প্রথমে সারকো, পরে বার্ণহিমের কাছে, সম্মোহন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তার পর ভিয়েনায় ফিরে গিয়ে জোসেফ ব্রয়ারের সঙ্গে সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগে হিস্টিরিয়ার চিকিৎসা শুরু করেন। এই পদ্ধতিতে, হিস্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা চলাকালীন মানুষের চিন্তা আচার-আচরণে মনের নির্জ্জন অবস্থার প্রভাব তিনি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ফ্রয়েড মনোচিকিৎসায় সম্মোহন পদ্ধতির পরিবর্তে অবাধ ভাবানুসঙ্গ (free association) পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

যাকে খুশি তাকেই কি সম্মোহিত করা যায়

সকলের সম্মোহিত হবার ক্ষমতা একরকম থাকে না। সম্মোহিত হবার জন্যে যথেষ্ট আগ্রহ থাকা দরকার—অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে সম্মোহিত করা যায় না।

কিভাবে সম্মোহন করা হয়

এর পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সম্মোহন করার অনেক রকম পদ্ধতি আছে। তবে সবগুলির ক্ষেত্রেই রোগীকে কেনো বিশেষ বিষয় বা বস্তুর কল্পনায় মনোনিবেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে সম্মোহনের স্থান

অনেক রকম শারীরিক এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় সম্মোহন পদ্ধতির প্রয়োগ

করা হয়, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছে :

১) দন্ত চিকিৎসা এবং অনেক রকম শল্য চিকিৎসায় অনুভূতি বিলোপ করার কাজে এর প্রয়োগ চলে।

২) ড্রাগ এবং মদ্যপানে আসক্তির চিকিৎসায় এই পদ্ধতির প্রয়োগে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

৩) হাঁপানি এবং নানা প্রকার চর্মরোগ নিরাময়ে এর ব্যবহার আছে।

৪) আজও হিস্টিরিয়ার চিকিৎসায় এর প্রয়োগ অব্যাহত আছে।

৫) দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা-যন্ত্রণার চিকিৎসায় এই পদ্ধতির প্রয়োগে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

৬) শয্যামূত্রের চিকিৎসায় এর স্থান সুপরিচিত।

৭) আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসা (behaviour therapy)তে পেশী শিথিল করার কাজে এর প্রয়োগ হয়।

সাবধানতা

১) উপযুক্ত পুঁথিগত এবং ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়া এই চিকিৎসার প্রয়োগ করতে যাওয়া অনুচিত।

২) চিকিৎসা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিচার-বিবেচনা করে এবং যথাযথভাবে রোগ নির্ণয় করে তবেই এই চিকিৎসার প্রয়োগ করা উচিত।

৩) কোনো কোনো চিকিৎসক লক্ষ্য করেছেন, একটি অপেক্ষাকৃত মৃদু রোগ সারাতে গিয়ে সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগ করার পর অন্য একটি দুরূহ ব্যাধির আবির্ভাব ঘটেছে।

৪) এই চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হলে চিকিৎসা শাস্ত্রে নৈতিক বিধির কথা স্মরণ রাখা দরকার।

৫) যদিও সম্মোহনকারীর নীতি বিগর্হিত কোনো নির্দেশ সচরাচর কার্যকরী হয় না, তবুও ওই ধরনের কোনো নির্দেশ যাতে না দেওয়া হয় সে দিকে নজর রাখা দরকার।

এই চিকিৎসার ভবিষ্যৎ কি

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত হলেও এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। সম্মোহিত অবস্থায় শরীরের এমন সব অংশ আর কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা যায়, যা সজ্ঞান অবস্থায় সম্ভব নয়। সাধারণভাবে আমাদের দেহ-মনের যে সব কাজ একমাত্র স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomic nervous system) এবং মস্তিষ্কের লিম্বিক সিসটেম (limbic system) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই সব কাজের ওপর সম্মোহিত অবস্থায় কিভাবে নিয়ন্ত্রণ আসে, তা উদঘাটন করতে পারলে শরীর মনের বিষয়ে অনেক মৌলিক প্রশ্নের জবাব হয়ত মিলতে পারে।

২৯

নিদ্রা এবং নিদ্রার গোলযোগ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ২৪ ঘণ্টার কাজগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কতকগুলি ঘটনা নিয়মিত ঘটছে। যেমন, কিছু সময় পর পর ক্ষুধার উদ্রেক এবং আহারে তার নিবৃত্তি।

নিদ্রা এই রকমই একটি ঘটনা। কিছুটা সময় আমরা নিদ্রার ভাব অনুভব করি এবং কিছুক্ষণ নিদ্রিত থাকার পর ওই নিদ্রার ভাব চলে যায়। নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের দেহ অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে এবং বহির্জগতের সঙ্কেতে (stimulus) জাগ্রত অবস্থার মত অতটা দ্রুত সাড়া (response) দেয় না। এই সময়ে শরীর-মন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। নিদ্রা-জাগরণের এই আবর্তন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

বেশির ভাগ চিকিৎসাবিজ্ঞানী মনে করেন, নিদ্রা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঘুমন্ত অবস্থায় শরীরের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ ঘটে।

নিদ্রা এবং নিদ্রিত অবস্থার ঘটনা বিশেষ করে স্বপ্ন—আবহমান কাল যাবৎ মানুষের কৌতূহলকে জাগিয়ে রেখেছে। আধুনিককালে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখ (Electro-encephalogram)[১] এবং পলিগ্রাম (Polygram)[২] এর সাহায্যে নিদ্রা-বিষয়ক

[১] মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখ (**Electro encephalogram or EEG**)

কি নিদ্রায়, কি জাগরণে আমাদের মস্তিষ্ক সব সময়েই সক্রিয়। মস্তিষ্কে কাজ চলার সময়ে সেখানে অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং সেই বিদ্যুৎকে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তরঙ্গের আকারে অঙ্কিত করা যায় একেই বলা হয় বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখ। (electro encephalogram).

প্রায় সময়েই এই অঙ্কন রেখাগুলি অসমান এবং অনিয়মিতভাবে হলেও কোনো কোনো সময়ে এই অঙ্কন রেখাতে নিয়মিতভাবে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়।

এপিলেপসি বা মৃগীরোগের ক্ষেত্রে এই অঙ্কন রেখায় এমন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, তা থেকে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়ে কতকগুলি বিশেষ নিয়মিত তরঙ্গের রূপ এই অঙ্কন রেখাতে দেখা যায়। চারভাগে বিভক্ত করা যায় এই তরঙ্গ রেখাগুলিকে : আলফা (α), বিটা (β), থিটা (θ) এবং ডেল্টা (δ)।

আলফা (α) তরঙ্গ : জাগ্রত অবস্থায় শান্ত এবং চোখ বন্ধ থাকলে এই তরঙ্গ দেখা যায়। এটি প্রতি সেকেন্ডে ৮ থেকে ১৩ বার হয় ঘুমের মধ্যে অথবা চোখ খোলা থাকলে এই তরঙ্গ আর দেখা যায় না।

বিটা (β) তরঙ্গ : এটি প্রতি সেকেন্ডে ১৪ থেকে ৩০ বার হয়। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকলে একে দেখা যায়।

থিটা (θ) তরঙ্গ : এটি প্রতি সেকেন্ডে ৪ থেকে ৭ বার হয়। গভীর নিদ্রার সময়ে একে দেখা যায়।

ডেল্টা (δ) তরঙ্গ : এটি প্রতি সেকেন্ডে ০·৫ থেকে ৩·৫ বার হয় এবং এটিও নিদ্রার সময়ে দেখা যায়। ১৪ নং চিত্র।

[২] পলিগ্রাম (**Polygram**): একটি যন্ত্রে একই সঙ্গে শরীরের অনেকগুলি অংশের, যেমন : হৃৎপিণ্ড, ধমনী, ফুসফুস, মাংসপেশী, চক্ষু ইত্যাদির ক্রিয়াগুলি চিত্রাঙ্কলেখ রূপে পাওয়া যায়। অঙ্কনগুলিকে একসঙ্গে পলিগ্রাম বলা হয়।
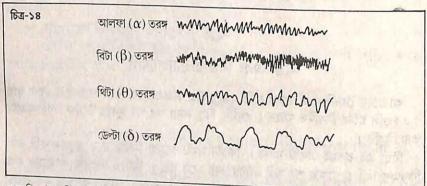
স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখ (Electroencephalogram)-তে যে ৪ প্রকার তরঙ্গ রেখা দেখা যায় সেগুলি এখানে দেখান হয়েছে

এখানে দেখান হচ্ছে—জাগ্রত অবস্থায় শান্ত এবং চোখ বন্ধ থাকলে নিয়মিত আলফা (α) তরঙ্গগুলি দেখা যায়। কিন্তু চোখ খুললেই ঐ তরঙ্গগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়।

গবেষণা হয়ে থাকে। পলিগ্রামে যে চিত্রাঙ্কনগুলি পাওয়া যায়, তাতে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখ (E.E.G.) ছাড়াও চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, পেশী, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদির ক্রিয়াগুলি কাগজে অঙ্কনরূপে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের পাতা বন্ধ থাকার জন্যে অক্ষিগোলক (eye ball) এর গতিবিধি দেখা যায় না। কিন্তু নিদ্রার গবেষকরা বুঝেছেন যে এই নিদ্রা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে অক্ষিগোলকের সঞ্চালন এবং একই সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্রিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। এই কাজ সম্ভব হয়েছে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখ এবং পলিগ্রামকে একসঙ্গে নিয়ে।

সমগ্র নিদ্রাব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে :

ক) একটি অবস্থা হচ্ছে যখন অক্ষিগোলকের দ্রুত সঞ্চালন (rapid eye movement or REM) হয়, এবং অন্যটি হচ্ছে,

খ) নিদ্রার যে অবস্থাতে অক্ষিগোলকের দ্রুত সঞ্চালন হয় না (non-rapid eye movement or NREM)।

নিদ্রার এই দুটি অবস্থার মধ্যে শুধু মস্তিষ্কের ক্রিয়াই নয়, সারা দেহের ক্রিয়ার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যগুলিকে এইভাবে ছকে দেখানো যেতে পারে :

নিদ্রার দুটি অবস্থা

নিদ্রার যে অবস্থায় অক্ষিগোলকের দ্রুত সঞ্চালন হয় (Rapid Eye Movement Sleep or REM Sleep)	নিদ্রার যে অবস্থায় অক্ষিগোলকের দ্রুত সঞ্চালন হয় না (Non-Rapid Eye Movement Sleep or NREM Sleep)
১) স্বপ্ন দর্শন এই অবস্থায় প্রায় অধিকাংশ সময়েই স্বপ্নদর্শন ঘটে। ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে দেখা গেছে, শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে ওই সময়ে স্বপ্নদর্শন চলছিল। ২) রক্ত সঞ্চালন এই অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন দ্রুতগতিতে হয় এবং মস্তিষ্ক জাগ্রত অবস্থার মতই সক্রিয় থাকে ৩) নিদ্রার গভীরতা এই অবস্থার নিদ্রাকে হাল্কা বা গভীর কোনোটাই বলা যায় না। এই অবস্থাকে সম্ভাব্যতা বিরোধী নিদ্রা (Paradoxical Sleep) বলা হয়। কারণ, এই অবস্থায় মস্তিষ্ক যথেষ্ট সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও ঘুমন্ত অবস্থা থেকে এই সময়ে জাগানো বেশ কষ্টকর।	১) স্বপ্ন দর্শন এই অবস্থায় স্বপ্নদর্শন প্রায় ঘটে না বললেই চলে। ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে দেখা গেছে, শতকরা মাত্র ৭ ভাগ ক্ষেত্রে স্বপ্নদর্শন চলছিল। ২) রক্ত সঞ্চালন এই অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে হয় এবং মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকে। ৩) নিদ্রার গভীরতা এই অবস্থাতে সবচেয়ে গভীর নিদ্রা হয়, তবে জাগিয়ে দেওয়া অত কষ্টকর নয়।

৪) লিঙ্গস্ফীতি এই অবস্থায় পুরুষের লিঙ্গস্ফীতি এবং শক্ত হতে দেখা যায়।	৪) লিঙ্গস্ফীতি ও রকম কিছু দেখা যায় না।
৫) হৃৎপিণ্ড, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেশি থাকে। রক্তের চাপও বৃদ্ধি পায়।	৫) হৃৎপিণ্ড, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অপেক্ষাকৃত কম থাকে। রক্তের চাপও অপেক্ষাকৃত কম থাকে।
৬) পেশী এবং শারীরিক ক্রিয়া মাংসপেশী ছাড়া শরীরের প্রায় সমস্ত অঙ্গেই কর্ম তৎপরতা দেখা যায়। পেশীগুলি খুবই শিথিল থাকে।	৬) পেশী এবং শারীরিক ক্রিয়া শরীরের সমস্ত অঙ্গই অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকে। পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত কম শিথিল থাকে।
৭) কতটা সময় নেয় এবং স্তরভেদ এই নিদ্রা সমগ্র নিদ্রার শতকরা ২০-২৫ ভাগ সময় মাত্র। এর মধ্যে কোনো স্তর (stage) নেই।	৭) কতটা সময় নেয় এবং স্তরভেদ সমগ্র নিদ্রার শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ সময়। এই অংশটিকে আবার ৪টি স্তরে ভাগ করা যায়। এই স্তরগুলি হচ্ছে : ১ম স্তর - ৫ ভাগ ২য় স্তর - ৪৫ ভাগ ৩য় স্তর - ১২ ভাগ | মোট ৭৫ ভাগ ৪র্থ স্তর - ১৩ ভাগ | মোট ৮০ ভাগ
৮) চিত্রাঙ্কলেখতে তরঙ্গ[১] এই অবস্থায় মস্তিষ্কের চিত্রাঙ্কলেখ-তে তরঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতির হয়।	৮) চিত্রাঙ্কলেখতে তরঙ্গ[১] এই অবস্থায় মস্তিষ্কের চিত্রাঙ্কলেখ-তে তরঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত ধীরগতির হয়।

জাগ্রত অবস্থায় আমরা যখন খুব সজাগ থাকি, তখন অপেক্ষাকৃত কম ভোল্টের প্রতি সেকেন্ডে ১৪ থেকে ৩০ তরঙ্গ দেখা যায়।

জাগ্রত অবস্থায় আমরা যখন খুব শান্ত এবং চোখ বন্ধ করে থাকি, তখন আল্‌ফা তরঙ্গ হয়। তাতে প্রতি সেকেন্ডে ৮ থেকে ১৩টি তরঙ্গ থাকে এবং তারা প্রায় ৫০ মাইক্রোভোল্টের হয়।

নিদ্রার যে অবস্থায় অক্ষিগোলকে দ্রুত সঞ্চালন হয় না, সে ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক

[১] জাগ্রত এবং নিদ্রিত অবস্থায় মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখ (E.E.G.) ১৫ নং চিত্র

চিত্রাঙ্কলেখ-তে তরঙ্গগুলি ধীর গতির হয়। নিদ্রার এই অবস্থায় ৪টি স্তর দেখা যায়।
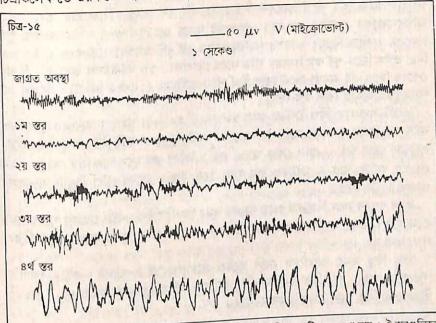
নিদ্রার যে অবস্থায় অক্ষিগোলকের দ্রত সঞ্চালন হয় না, সেঅবস্থায় নিদ্রার ৪টি স্তর দেখা যায়। ঐ স্তরগুলিতে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখর যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি এখানে দেখান হচ্ছে। এই সঙ্গে জাগ্রত অবস্থারও একটি লেখ্য দেখান হয়েছে।
(মানুষের বাঁ-দিকের প্যারাইটেল ক্ষেত্র থেকে এই একক প্রান্তিক (monopolar) লেখ্য নেওয়া হয়েছে)

১ম স্তর : এই স্তরে কম ভোল্টের দ্রুতগতির তরঙ্গ থাকে। এই স্তরেই ঘুম সবচেয়ে পাতলা হয়।

২য় স্তর : এই স্তরে অপেক্ষাকৃত কম ভোল্টের তরঙ্গের মাঝে মাঝে উচ্চ ভোল্টের প্রতি সেকেন্ডে ১৩ থেকে ১৫ তরঙ্গ দেখা যায় এবং ঐ তরঙ্গগুলি এক সঙ্গে দেখলে কতকটা তাঁতের টাকুর (spindle)-র মত দেখায়।

৩য় স্তর : এই স্তরে উচ্চ ভোল্টের ধীর গতির থিটা এবং ডেল্টা তরঙ্গ দেখা যায়।

৪র্থ স্তর : এই স্তরে উচ্চ ভোল্টের ধীর গতির ডেল্টা তরঙ্গ থাকে। এই স্তরের ঘুমই সবচেয়ে গভীর।

২য় স্তর থেকে তরঙ্গের ভোল্ট বাড়তে থাকে এবং গতি ধীর হতে থাকে। ৪র্থ স্তরে তরঙ্গের গতি সবচেয়ে ধীর হয় (প্রতি সেকেন্ডে ২ থেকে ৩)।

নিদ্রার যে অবস্থায় অক্ষিগোলকের দ্রুত সঞ্চালন হয়, সেই অবস্থাই স্বপ্নবহুল—সেই জন্যেই এই নিদ্রাকে স্বপ্ননিদ্রা (dream sleep)-ও বলা হয়। এই অবস্থায় বৈদ্যুতিক চিত্রাঙ্কলেখ-তে তরঙ্গগুলি কম ভোল্টের দ্রুতগতির হয় (সেকেণ্ডে ১৪-২৫)—যেমনটি জাগ্রত অবস্তাতেও দেখা যায়।

নিদ্রার যে দুটি অবস্থার কথা আলোচনা করা হল, সে দুটিই আবর্তনশীল। প্রতিটি অবস্থাই ৪/৫ বার করে আসে—নিদ্রার প্রথমটা যে অবস্থা দিয়ে শুরু হয়, তাতে অক্ষিগোলকের সঞ্চালন হয় না। এরপরেই আসে স্বপ্নবহুল এবং অক্ষিগোলকের দ্রুত সঞ্চালন অবস্থার নিদ্রা। তারপর পর্যায়বৃত্তভাবে ওই দুটি অবস্থা চলতে থাকে। স্বপ্নবহুল নিদ্রা প্রথম দিকে খুব কম সময়ের জন্য থাকে (সাধারণত ১০ মিনিটেরও কম) এবং নিদ্রার শেষের দিকে এই অবস্থা ক্রমে বেশি দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় (১৫-৪০ মিনিট)। নিদ্রার এই অবস্থাতেই আমরা বেশি স্বপ্ন দেখি।

একটি সদ্যজাত শিশু দৈনিক প্রায় ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা ঘুমায়। একজন যুবক যার বয়স ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে, সে গড়ে ৭১/২ ঘণ্টা ঘুমায়। ব্যক্তিবিশেষে ঘুমের সময়ের তারতম্য দেখা যায়। এমন লোক আছে, যার ৯ ঘণ্টার কম ঘুমে চলে না। আবার এমন লোকও আছে, যার ৬ ঘণ্টারও কম ঘুমে চলে যায়। ঘুমের মাত্রা কিছুটা অভ্যাসের ওপরও নির্ভর করে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে থাকার সময় অপরিবর্তিত থেকে গেলেও ঘুমের সময় কমে যায়। এবং, বেশিবার ঘুম ভেঙেও যায়। বৃদ্ধ বয়েসে ঘুমের মধ্যে কিছু অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়।

কিছু কিছু সময় আমাদের বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয়। যেমন : কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পর। শারীরিক এবং মানসিক ব্যধিতে অধিক ঘুমের আবশ্যক হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কিছু বেশি সময় ঘুমের দরকার।

ঘুমাতে না দিলে কি হয়

দীর্ঘদিন ঠিকমত ঘুম না হলে কাজে মনঃসংযোগের ক্ষমতা এবং কাজের দক্ষতা কমে যায়। কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে দেখা যায় এবং কঠিন মানসিক ব্যাধির লক্ষণ, যেমন—অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination) এবং অমূল প্রত্যয় (delusion) দেখা যায় এবং বাস্তব বুদ্ধি লোপ পায়।

অনিদ্রা ও অতিনিদ্রা (Insomnia and Hypersomnia)

নিদ্রার গোলযোগ দু'রকমের হতে পারে :

১) অনিদ্রা—নিদ্রা যেখানে কম হয়, এবং
২) অতিনিদ্রা—যেখানে অধিক নিদ্রা হয়।

অনিদ্রা দু'রকমের হয় :

ক) যেখানে ঘুম আসতে দেরি হয়, এবং
খ) যেখানে ঘুম বেশি সময় স্থায়ী হয় না।

যেখানে ঘুম বেশি সময় স্থায়ী হচ্ছে না, সেখানে এমনও হতে পারে যে, সারা রাতই ছাড়া ছাড়া ঘুম—কিছুক্ষণ করে ঘুম হচ্ছে আবার জেগে যাচ্ছে, কিন্তু পরেই আবার ঘুমিয়ে পড়ছে এইভাবে চলছে। কোনো কোনো সময়ে এমন হয় যে প্রথম রাতে ঠিকমত ঘুম

এসে গেল, কিন্তু ২/৩ ঘণ্টা পর সে ঘুম ভেঙে গেল আর এল না।

এছাড়া, এমনও হয় যে ঘুমের কোনো মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় নেই ; যেমন—মাঝরাত পর্যন্ত ঘুম হল না, কিন্তু রাজ্যের ঘুম নামল শেষ রাতে এবং সে-ঘুম চলল অনেক বেলা পর্যন্ত। আবার এমনও হতে পারে যে, ঘুম নেই রাতে, কিন্তু দিব্বি ঘুমোচ্ছে দিনের বেলায়।

অনিদ্রা কোনো রোগ নয়। অনিদ্রা নানা রোগের লক্ষণ হিসেবেই দেখা যায়।

সুনিদ্রা অনেক সময় পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। উপযুক্ত বিছানার অভাব, ছারপোকা, মশার উপদ্রব, ঘরের ভেতরে বা বাইরে বিরক্তিকর শব্দ, যেমন, বোমা, পটকা, লাউডস্পিকারের আওয়াজ, লোকের হৈ-হল্লা ; খুব বেশি ঠাণ্ডা অথবা অত্যন্ত গরম এসব অবস্থায় ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। যদি এমন শয়ন সঙ্গী থাকে যে বড় চঞ্চল, ঘুমের মধ্যে হাত-পা ছোঁড়ে অথবা যার নাক ডাকে—তাহলে তো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবেই। ঘরে যদি এমন রোগী শুয়ে থাকেন যিনি সমানে কেশে চলেছেন অথবা শরীরের ব্যথা-যন্ত্রণা সইতে না পেরে কাৎরে চলেছেন, তাহলেও ঘুমের বিলক্ষণ অসুবিধে ঘটবে। অবশ্য সুনিদ্রার এইসব অন্তরায়গুলো হাসপাতালেই বেশি করে দেখা যায়—সুনিদ্রা যেখানে বিশেষ দরকার। আবার এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা স্বগৃহে সুনিদ্রা উপভোগ করেন, অন্য কোথাও গেলে কিন্তু ভাল ঘুমোতে পারেন না।

শরীর মনের অবস্থার ওপরও সুনিদ্রা নির্ভর করে। ক্ষুধা, পিপাসা, অধিক আহার, বদহজম, বমি, পেটে ব্যথা, উদরাময়, হাঁপানি, কাশি, শরীর ব্যথা-বেদনা—এগুলি ঘুমের অসুবিধে ঘটাতে পারে। খুব ভোরে উঠে কোথাও যেতে হবে, এই ভাবনা নিয়ে শয্যাগ্রহণ করা হল—যথেষ্ট সময় থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভাল ঘুম হল না, এমনও হতে পারে। কিছু লোকের অভ্যেস আছে, শোবার আগে বেশি করে জল খাওয়ার—এর ফলে বারে বারে প্রস্রাব করার জন্য ঘুম ভেঙে যায়। কোনো কারণে ভয়, আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা থাকলেও ঘুমের অসুবিধে হতে পারে।

নেশার দ্রব্য এবং অনিদ্রা

বেশি চা, কফি এবং ধূমপানে ঘুম নষ্ট হতে পারে। অনেকে মনে করেন, মদ্যপানে বুঝি সুনিদ্রা হয় : কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মদ্যপায়ীদের ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। মদ্যপান বা আফিং জাতীয় নেশার দ্রব্য বন্ধ করে দিলে কঠিন অনিদ্রা হতে পারে। অ্যামফেটামিন জাতীয় ড্রাগ ব্যবহারে অনিদ্রা ঘটায়। ঘুমের বড়ি খেয়ে যারা ঘুমোতে অভ্যস্ত, তারা হঠাৎ বড়ি বন্ধ করলে ঘুমোতে পারে না। এছাড়া, চিকিৎসার জন্যে যেসব ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, সেগুলির জন্যেও কখনো কখনো ঘুমের অসুবিধে হয়—যেমন, থাইরয়েড হরমোন, গর্ভনিরোধক বড়ি এগুলি অনিদ্রার কারণ হতে পারে।

শরীর মনের অসুখ এবং অনিদ্রা

শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধি অনিদ্রার কারণ হতে পারে। যে সমস্ত অসুখে শরীরে ব্যথা-বেদনা হয়, তাতে অনিদ্রা হতে পারে। বেশিরভাগ মানসিক ব্যাধিতে, বিশেষতঃ উৎকণ্ঠা (anxiety) এবং বিষণ্নতা রোগে (depressive illness) অনিদ্রা অত্যন্ত

পীড়াদায়ক।

নিদ্রার মধ্যে অনেক রকম অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়। তার মধ্যে কয়েকটির আলোচনা এখানে করা হবে :

(১) স্বপ্নচারিতা (Somnambulism)

সুমিতের বয়স ৯/১০ বছর হবে, লেখাপড়ায় ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, সচ্ছল পরিবারের ছেলে, বাবা বেশ উঁচু পদে চাকরি করে। আপিসের কাজে সুমিতের বাবাকে বাইরে যেতে হল তিন মাসের জন্যে। বাবার বিদেশ যাত্রার একদিন পর দেখা গেল, সুমিত রাত্রে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রেফ্রিজারেটর খুলছে, বাতি জ্বালছে, মিটসেফ খুলছে, ইতস্ততঃ ঘুরছে। শব্দ শুনে সুমিতের মায়ের ঘুম ভেঙে গেছিল বলেই তিনি দেখেছিলেন ছেলের এইসব কাণ্ড। একটু বিরক্ত হয়ে ডাকলেন সুমিতকে। সুমিত কোনো সাড়া দিল না। আপন মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবার ওর মা বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি করছিস ? শুয়ে পড়।'

বিহ্বল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে রইল সুমিত—যেন চিনতে পারছে না মাকে।

ইতিমধ্যে মায়ের গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেছে সুমিতের ঠাকুমার। তিনিও বেরিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে। মা-ঠাকুমা দুজনেই বোঝানোর চেষ্টা করলেন—'এসব কি হচ্ছে ?'

সুমিত কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। তার ভাবেরও কোনো পরিবর্তন নেই। যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় !

কারো পীড়াপীড়িতে নয়, সুমিত নিজেই একটু পরে এসে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটল তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যে। রাত তখন বারোটা কি একটা। বাকি রাতটা ভালোভাবে ঘুমোতে পারলেন না মা আর ঠাকুমা। দুজনেই তাই দেখলেন, অকাতরে ঘুমোচ্ছে সুমিত।

পরের দিন সকালে যথাসময়ে ঘুম ভাঙল সুমিতের। যা-যা করণীয় ঘুম ভাঙার পর, সবই করে গেল পর পর। পড়াশুনা সেরে নিয়ে স্নান করে, খেয়েদেয়ে চলে গেল স্কুলে।

রাতের কাণ্ডকারখানার কথা বার বার জিজ্ঞেস করেছিলেন মা। সুমিত কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করল না। উল্টে দোষ দিল মা-কে, স্বপ্নে উল্টোপাল্টা ব্যাপার দেখেছে বলে।

কোনো পরিবর্তন এল না সুমিতের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীতে—শুধু রাতে ছাড়া। রাতের সেই ঘটনায় কোনো গুরুত্ব সে না দিলেও, দু-একদিন অন্তর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে চলল।

বড় চিন্তায় পড়লেন মা আর ঠাকুমা। পুজো দিয়ে এলেন ঠাকুরবাড়িতে, মাদুলি আনা হল জ্যোতিষী বাড়ি থেকে, লোহা বাধা হল বিছানার নিচে, পরামর্শ নেওয়া হল আত্মীয়স্বজনের। কেউ বললে—বাড়ির দোষ হয়েছে—রোজা ডাকো। রোজা এসে, ঝাড়ফুঁক করে দিয়ে গেল, দরগায় গিয়ে দোয়া চাওয়া হল—হল সবই, রাতের ঘটনায় কিন্তু কোনো পরিবর্তন এল না।

প্রায় দু-সপ্তাহ পরে বাড়ির ডাক্তারের পরামর্শে বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া হল। তিনি দিন কয়েকের জন্যে সামান্য পরিমাণে ঘুমের ওষুধের সুপারিশ করলেন এবং

মনোচিকিৎসায় রাখলেন সুমিতকে।

বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা শুরুর পর থেকে এই ঘটনা আর ঘটেনি। মনোচিকিৎসকের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা জিনিস জানা গেল। বাবার সঙ্গে সুমিতের সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ। ছেলেকে ছেড়ে তিনি কখনো এতদিন বিদেশে থাকেননি। এবারে যখন ঠিক হয় তিনি তিন মাসের জন্যে বাইরে থাকবেন, সুমিতের তখন বেশ চিন্তাও হয়েছিল।

টেলিফোন করে পুরো ব্যাপারটা জানানো হয়েছিল সুমিতের বাবাকে। বিদেশ থেকে টেলিফোনে তিনি সুমিতের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন বেশ কয়েকবার। বাবাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল সুমিত—কিচ্ছু চিন্তা কোরো না আমার জন্যে, ভালই আছি। বরং মাকে বোঝাও, মা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।

বাবার সঙ্গে টেলিফোনে সুমিতের এত কথার পরেও কিন্তু তার নৈশ ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। তাড়াতাড়ি কাজ চুকিয়ে ছ' সপ্তাহ পরে বাবা যখন ফিরে এলেন, তার আগেই অবশ্য সুমিত ঠিক হয়ে গেছে। তারপর দীর্ঘদিন গেছে, এ ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়নি।

এটি একটি স্বপ্নচারিতার ঘটনা। স্বপ্নচারিতা সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। এটি সচরাচর ঘটে ঘুমের প্রথম তৃতীয়াংশে। ঘুমন্ত অবস্থা থেকে হঠাৎই বিছানা থেকে উঠে কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—সকালে উঠে রাতের ঘটনার কিছুই আর মনে করতে পারে না। ছয় থেকে বারো বছরের মধ্যেই সাধারণতঃ শুরু হয় এবং কিশোর বয়স পর্যন্ত চলতে দেখা যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ক্ষেত্রেই এহেন নৈশ অস্বাভাবিক আচরণ বেশি দেখা যায়। মানসিক চাপ থাকলে বাড়ে—যেমন, পরীক্ষার আগে, বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ করলে। সঠিক কারণ সব সময়ে জানা যায় না, তবে শিশু বড় হয়ে গেলে এ ব্যাপার তেমন আর দেখা যায় না। সাধারণতঃ এই অস্বাভাবিক আচরণে তেমন কিছু ক্ষতি হয় না—তবে ওই অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা

সাধারণতঃ এদের বিশেষজ্ঞের কাছে আনা হয় না। শিশুর চিকিৎসা ছাড়াও পরিবারের অন্যান্যদের আশ্বস্ত করা আর পরামর্শ দেওয়া দরকার। মনোচিকিৎসা (psychotherapy) এবং আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসা (behaviour therapy) এই অবস্থায় খুবই উপযোগী। কিছু ঘুমের ওষুধ আছে যেগুলি সুনিদ্রা আনে, উৎকণ্ঠারও উপশম ঘটায়। চিকিৎসা চলাকালীন কখনো কখনো এই জাতীয় ওষুধ অল্প কিছুদিনের জন্য প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

(২) স্বপ্নে কথন (Sleeptalking or Somniloquy)

শিশুদের মধ্যে প্রায়ই এটা দেখা যায়, বড়দের মধ্যে কখনো কখনো দেখা যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় যেসব কথা বলা হয়, তার বেশিরভাগই অস্পষ্ট। এ একবারে খুব কম সময়ের জন্যে হলেও, একই রাতে অনেক বার হতে পারে। শুধুমাত্র স্বপ্নকথনের জন্যে কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। তবে কাছে যারা থাকে, তারা বিরক্ত হয়। কেননা,

স্বপ্নকথনের কথা বেশিরভাগ সময়ে ধীরে ধীরে হলেও, কখনো কখনো বেশ চিৎকার হয়ে বেরোয়। স্বপ্নকথন, স্বপ্নচারিতা আর নিশিআতঙ্ক একই সঙ্গে ঘটতে পারে ; চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তখনই।

(৩) নিশি আতঙ্ক(Night Terror)

সাধারণতঃ তিন থেকে ন' বছরের শিশুদের মধ্যে নিশি আতঙ্ক দেখা যায়। দিব্বি ঘুমন্ত শিশু আচমকা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে জেগে উঠে চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্না শুরু করে দেয়। স্বপ্নচারিতা আর নিশিআতঙ্ক একই ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই সময়ে হৃৎপিণ্ড আর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি দ্রুত হয়, শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে, জেগে উঠে কিন্তু ভয়ের স্বপ্নের কথা মনে করে বলতে পারে না। তখন সান্ত্বনা দিয়েও তাকে থামানো যায় না—কিছুক্ষণের জন্যে স্থান-কাল-পাত্রর জ্ঞান হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘুমিয়ে পড়ে একটু পরেই এবং সকালে উঠে ওই অবস্থার কিছুই স্মরণ করতে পারে না।

চিকিৎসা

সাধারণতঃ নিশি আতঙ্কের কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। শিশুর বাবা-মা অনেক সময়ে অস্থির হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় পারিবারিক মনোচিকিৎসা (family psychotherapy) এবং শিশুর জন্যে অল্পমাত্রায় কিছুদিনের জন্যে ডায়জাপাম (উৎকণ্ঠা প্রশমন এবং মৃদু ঘুমের ওষুধ) দিলে প্রায়ই ঠিক হয়ে যায়।

(৪) দুঃস্বপ্ন (Nightmare)

ভয়ের স্বপ্ন দেখে আতঙ্কে জেগে ওঠা ঘটে সাধারণতঃ শেষ রাতে। যে কোনো বয়সেই এরকমটা হতে পারে। খুবই সাধারণ ঘটনা। বহু লোকেরই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এই ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। আবার সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুঃস্বপ্ন দেখা দেয় অতিরিক্ত মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে।

জীবন বিপন্ন হয়েছিল এবং প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কোনোক্রমে বেঁচে গেছে—এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভয়াবহ সেই ঘটনা বার বার ফিরে আসতে পারে লোমহর্ষক স্বপ্নের মধ্যে। ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, উড়োজাহাজের দুর্ঘটনা অথবা আততায়ীর মারাত্মক আক্রমণ—প্রাণে বেঁচে গেলেও স্বপ্নের মধ্যে গা-কাঁপানো ঘটনাগুলো বার বার ফিরে আসতে থাকে। অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, এইসব দুর্ঘটনার স্বপ্ন দেখতে দেখতে দুর্ঘটনাগুলো সম্বন্ধে জমে থাকা উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক কমতে থাকে। কোনো প্রিয়জনের অকস্মাৎ প্রাণবিয়োগ, বিশেষ করে দুর্ঘটনার ফলে, এই ধরনের স্বপ্ন খুব বেশি দেখা যায়।

সাধারণতঃ এর কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না।

(৫) ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করা (Bruxism)

ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করা অল্পবিস্তর প্রায়ই দেখা যায়। খুব বেশি মাত্রায় হলে

অবশ্য দাঁতের ক্ষতি হতে পারে—তা নইলে, এ ব্যাপার একটা মোটামুটি নির্দোষ ঘটনা। যার দাঁত কিড়মিড় করে, সে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। তার ঘুমও ভাঙে না। কিন্তু একই ঘরে অন্য যারা থাকে, তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে বিরক্তিকর এই শব্দে।

এর কোনো চিকিৎসা সাধারণতঃ দরকার হয় না।

অতিনিদ্রা

এমন কতকগুলো অবস্থা আছে যখন অসময়ে এবং দীর্ঘসময় ধরে ঘুম হয়—এই অবস্থাগুলিকেই বলা হয় অতিনিদ্রা। অনিদ্রার তুলনায় অতিনিদ্রা খুব কমই দেখা যায়। অতিনিদ্রা হতে পারে অভ্যাসের বশে, অথবা শরীর মনের নানারকম অসুখের ফলে। তখন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত অবশ্যই। প্রকৃত রোগ নির্ণয় এবং তার যথাযথ চিকিৎসা প্রয়োজন।

অনিদ্রার চিকিৎসা

অনিদ্রা ঘটলেই যে ঘুমের ওষুধ খেতেই হবে, এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। চিকিৎসার আগে সঠিক কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত আবশ্যক। নির্দিষ্ট নিয়মে, নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমোনোর অভ্যেস গড়ে ওঠে প্রত্যেকের মধ্যেই। হঠাৎ যদি সেই অভ্যেসের পরিবর্তন ঘটে, ঘুমের অসুবিধে দেখা যায়। অধিক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা আর দূরদর্শন দেখার পর ঘুম আসে না অনেকেরই। এক ব্যক্তির অভ্যেস ছিল রাতে অল্প খাওয়া ; একদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে আকণ্ঠ ভোজন করলেন—সে রাতে তাঁর ঘুম তেমন হল না। দিন কয়েক আগে এক ভদ্রলোকের অনুযোগ শুনলাম—বেশ কদিন না ঘুমোনোর ফলে শরীর খারাপ লাগছে, কাজকর্মের অসুবিধে হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তাঁর বাড়িতে কিছু বাড়তি লোকের আগমন ঘটায় জলের অসুবিধার দরুণ মাস দেড়েক তিনি স্নান করেননি। স্নানের ব্যবস্থা করে দিতেই ভদ্রলোকের সুনিদ্রা ফিরে এল এবং শরীরের অন্যান্য কষ্টবোধও তিরোহিত হল। পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে পরামর্শ দিলে অনেক সময়ে ঘুমের বড়ি ছাড়াই কাজ হয়।

শারীরিক ব্যাধি আর দেহে যন্ত্রণা-বেদনার জন্যে যেসব ক্ষেত্রে ঘুমের অভাব ঘটছে, সেসব ক্ষেত্রে এইসব ব্যাধির চিকিৎসাই করতে হবে—যন্ত্রণা-বেদনা লাঘবের ব্যবস্থা করতে হবে—সেই সঙ্গে দরকার হলে কিছু ঘুমের ওষুধ দেওয়া যেতে পারে, যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়।

অনেক সময়ে কঠিন মানসিক ব্যাধির প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে অনিদ্রা দেখা দেয়—এসব অবস্থায় শুধু ঘুমের ওষুধ দিয়ে অনিদ্রার চিকিৎসা করা অতীব আবশ্যক। দেখা যায়, এই ধরনের রোগীরা প্রায়ই বিষণ্ণতা রোগে ভুগছেন। এঁদের যদি শুধু ঘুমের বড়ি খাইয়ে ঘুম এনে দেওয়া হয়, কদিন পরে দেখা যাবে—ঘুমের বড়িতেও আর কাজ হচ্ছে না এবং বিষণ্ণতা রোগ আরও বেড়ে গেছে। এইসব কারণেই মনে রাখা দরকার, অনিদ্রা নিজে কোনো রোগ নয়—অনেক রোগের লক্ষণ মাত্র। যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে সেই রোগকে নির্ণয় করে তার সুচিকিৎসা দরকার—সেই সঙ্গে প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্যে ঘুমের ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। ঘুমের ওষুধ কখনোই দীর্ঘদিন ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি করা হয়, তাহলে ওই ওষুধের প্রতি নির্ভরতা এসে যায়

এবং অন্যান্য ড্রাগ নির্ভরতার মতই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ম্যানিয়া রোগে প্রথমরাতে ২/৩ ঘণ্টা ঘুম হয়ে তারপর ঘুম ভেঙে গিয়ে আর ঘুম আসে না। ঘুম না হওয়ার দরুণ এদের কোনো ক্লান্তিবোধ থাকে না। ঘুমের তেমন কোনো প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে না। বাস্তবিক পক্ষে এই ম্যানিয়া রোগীদের অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা তো করতেই হবে– সেইসঙ্গে দেওয়া দরকার ঘুমের জন্য ঘুমের ওষুধ।

বেশি বয়সের লোকদের প্রায়ই ঘুমের অসুবিধে হয়। এসব ক্ষেত্রে ঘুম ভাল হচ্ছে না বলেই যে তাদের ঘুমের ওষুধ দিতে হবে, তার কোনো মানে নেই। কি কারণে ঘুম আসছে না, তার কারণ নির্ধারিণ করতে হবে। এই বয়সে বিষণ্ণতা রোগ (depressive illness) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই বেশি মাত্রায়—সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা দরকার এবং প্রয়োজনে তার চিকিৎসা করা দরকার। এছাড়া হাঁপানি, কাশি, বাতব্যাধিতেও অনিদ্রা হতে পারে। বয়স বেশি হলে যন্ত্রণাদায়ক শারীরিক ব্যাধি বেশি হয়। মনে রাখা দরকার, বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ঘুমের ওষুধে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। যেমন, ঘুম তো হলই না, উল্টে দেখা গেল, তাঁর অস্থিরতা বেড়ে গেছে; স্থান-কাল-পাত্র-র জ্ঞান লোপ পেয়েছে: লজ্জা-সরমের জ্ঞান হারিয়ে ঘরের মধ্যে বিবস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন; অথবা শয্যায় কাপড়-চোপড়ে প্রস্রাব-পায়খানা করতে শুরু করেছেন। এই কারণেই এঁদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সাবধানে এবং খুব মৃদু ওষুধ কম মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত।

এমনও দেখা যায়, রোগী বলছে তাঁর ঘুম নেই—অন্যেরা দেখছে তিনি ঘুমোচ্ছেন। বিষণ্ণতা রোগের দরুন এই অবস্থা প্রায়ই দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, ঘুম এঁদের ঠিকই হচ্ছে, তবে ঘুমের পর যে তৃপ্তির ভাবটা আসা দরকার—তার খুবই অভাব ঘটছে। শুধু ঘুমের ক্ষেত্রে নয়, তৃপ্তিবোধের এই অভাব দেখা যাচ্ছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও; যেমন, আহার, সিনেমা-থিয়েটার দেখা, লোকের সঙ্গে গল্প-গুজব করা কিছুই ভাল লাগছে না—তৃপ্তিদায়ক হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধ দেওয়া বা ঘুমের ওষুধ দেওয়া থাকলে তার মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া—এসবের কোনোটাই করা উচিত নয়। রোগীকে শুধু ভালভাবে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তার বিষণ্ণতা রোগের চিকিৎসা চলছে; সে রোগ সেরে গেলেই সবই তাঁর ভাল লাগবে, সবকিছুতেই তৃপ্তির অনুভূতি ফিরে পাবেন—সে জন্যে আলাদা ঘুমের ওষুধের কোনো দরকার নেই।

প্রয়োজনবোধে ডাক্তারের পরামর্শে ঘুমের ওষুধ যদি খেতে হয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এসব ক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধ খেলে হিতে বিপরীত হয়, এই ভেবে ডাক্তারের সুচিন্তিত অভিমতকে অগ্রাহ্য করাও ঠিক নয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজের খেয়াল খুশিমত ঘুমের ওষুধ খেলেই বরং বিপদ হতে পারে।

মনে রাখবেন, ঘুমের ওষুধ বাড়ির যেখানে-সেখানে অসাবধানে ফেলে রাখা ঠিক নয়। বাড়ির শিশুরা খাবার জিনিস ভেবে খেয়ে ফেলতে পারে, অথবা কোনো আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি অনেকগুলো ঘুমের বড়ি একসঙ্গে খেয়ে ফেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারে। উপযুক্ত ব্যবহারে ঘুমের ওষুধ রোগ নিরাময়ে সাহায্য তো করেই, উপরন্তু অনেক সময়ে জীবনদায়ীও হতে পারে। কিন্তু এর অপব্যবহারে নিদারুণ দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

৩০

মানসিক রোগে জরুরী অবস্থা
(Psychiatric Emergencies)

কোনো কোনো সময়ে মানসিক রোগের দরুন এমন সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে তার প্রতিকারের জন্য তৎপর কিছু করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে—এই ধরনের অবস্থাকেই মানসিক রোগে জরুরী অবস্থা বলা হয়।

এইরকম অবস্থা রোগীর পক্ষেও যেমন দুঃসহ তেমনই রোগীর আশপাশে যারা থাকে, তাদের পক্ষেও শুধু যে উদ্বেগজনক এবং পীড়াদায়ক তাই নয়, বিপজ্জনকও হতে পারে। একজন আত্মহত্যাপ্রবণ রোগী নিজে মারা গিয়ে তার সমস্ত পরিবারকে নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করতে পারে ; একজন উত্তেজিত মারমুখী রোগী দামি জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে তো পারেই, এমন কি অন্য মানুষজনকেও শারীরিক এবং মানসিকভাবে পীড়িত করতে পারে। যে ওষুধ দিয়ে রোগ সারানোর চেষ্টা হয়, তার থেকেই এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হতে পারে যা রোগী এবং তার আত্মীয়স্বজনের অন্তরে উদ্বেগ এবং ভীতির সঞ্চার করতে পারে।

এইরকম জরুরী অবস্থা বহুপ্রকার হতে পারে ; তবে এখানে মাত্র বিশেষ কয়েকটির আলোচনা করা হবে।

যে জরুরী অবস্থাগুলির আলোচনা করা হবে, সেগুলি হচ্ছে :

১। উত্তেজিত, মারমুখী অথবা কিংর্তব্যবিমূঢ় রোগী (Excited, violent or confused patient)।
২। আত্মহত্যাপ্রবণ রোগী (Suicidal patient)।
৩। আতঙ্কগ্রস্ত রোগী (Panicky patient)।
৪। নিশ্চল নিশ্চুপ রোগী (Stuporous patient)।
৫। মানসিক রোগে ব্যবহৃত ওষুধের তীব্র প্রতিক্রিয়া (Unwanted acute side-effects of psychiatric drugs)।

১। উত্তেজিত, মারমুখী অথবা কিংকর্তব্যবিমূঢ়-রোগী
(Excited, Violent or Confused Patient)

সাধারণ লোকের ধারণা মানসিক রোগী মাত্রই বিপজ্জনক এবং সহজেই এরা উত্তেজিত হয়ে অন্যদের আক্রমণ করে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই ধরনের আক্রমণাত্মক ভাব মানসিক রোগীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমই দেখা যায়। সাধারণতঃ দুটি কারণে মানসিক রোগীদের মধ্যে মারমুখীভাবের উদয় হয়—একটি হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণার বশে মনে করে অন্য লোকে

তার ক্ষতি করবে ; তখন সেই কাল্পনিক শত্রুকে বিনাশ করার জন্যে কখনো কখনো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, অন্যটি হচ্ছে মানসিক অসুখের কারণে উদ্ভট সব চিন্তার বশে তার মনে হয় সে বুঝি নিজেকে আপন আয়ত্তে রাখতে পারবে না—হয় নিজের অথবা অন্য কারও সে ক্ষতি করে ফেলবে। এই উভয় ক্ষেত্রেই ভয় আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসে।

এইসব উগ্র, উত্তেজিত, মারমুখী রোগীদের হাবভাব দেখে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে—তাই কখনো ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে আটকে রাখে, কখনো বা শেকল অথবা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে—যাতে এরা নিজেদের এবং অন্যদের কোনো বিপদ ঘটাতে না পারে। এদের আচরণে লক্ষ্য করা যায়, এরা অতিশয় চঞ্চল, চিৎকার করে কথা বলে, অশ্লীল ভাবভঙ্গী করে, কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দেয়, সামান্য প্ররোচনায় অথবা বিনা প্ররোচনায় অন্যদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। উত্তেজিত অবস্থায় তারা যা করে তার পরিণাম বিচারের ক্ষমতা তখন থাকে না। উত্তেজনার সময় এদের মধ্যে প্রবল শক্তি দেখা গেলেও ক্রমে এরা আহার নিদ্রার অভাবে ক্ষীণ এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

নানারকম মানসিক ব্যাধিতে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যেসব মানসিক রোগে সচরাচর উত্তেজনা এবং মারমুখী ভাব দেখা যায়, তাদের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

ক) শরীরভিত্তিক নয় এমন কঠিন মানসিক ব্যাধি—যেমন, সিজোফ্রেনিয়া, ম্যানিয়া ইত্যাদি (Non-organic serious mental illness like schizophrenia, mania etc)-তে এরকম হতে পারে। এই অসুখগুলি সাধারণতঃ হঠাৎ হয় না একটু খোঁজখবর নিলেই দেখা যায়, এইসব রোগে অন্যান্য লক্ষণের আভাস আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। সচরাচর এইসব রোগে চেতনার অবনতি (disturbances of consciousness) তেমন হয় না এবং স্থান কাল পাত্রের জ্ঞান ঠিকই থাকে। এই রোগগুলির বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

খ) শরীরভিত্তিক তীব্র স্বল্পস্থায়ী মানসিক ব্যাধি (acute organic mental disorder) এই রোগে উত্তেজনা ছাড়া স্থান, কাল এবং পাত্রের জ্ঞানলুপ্ত হয়, স্মৃতিভ্রংশ এবং চেতনার অবনতি ঘটে। এই রোগের পূর্বলক্ষণ এবং কারণ রোগীর আত্মীয়স্বজনের কাছে অনুসন্ধান করলে সহজেই জানা যায়। এ রোগের বিবরণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

গ) মাদক দ্রব্যের ব্যবহার এবং মদ্যপানের ফলে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা দেখা দিতে পারে। সামান্য খোঁজ খবর নিলেই সহজেই এর হদিস পাওয়া যায়।

ঘ) এপিলেপসির ফিটের রোগীদের—ফিটের পরিবর্তে অথবা ফিটের অব্যবহিত পরে প্রচণ্ড উন্মত্ততা কখনো কখনো দেখা যায়।

ঙ) হিস্টিরিয়া রোগেও কোনো কোনো সময়ে প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং উচ্ছৃঙ্খলা ভাব দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে মনে আঘাত পাবার মত ঘটনা রোগের সূচনার অব্যবহিত পূর্বে ঘটেছে, এমন সন্ধান পাওয়া যায়।

এই অবস্থার প্রতিকার কিভাবে করা যায়

রোগীর ক্রোধ, উত্তেজনা এবং হিংসাত্মক ভাবকে অধিক বল প্রয়োগের দ্বারা মোকাবিলা

করা বিপজ্জনক ; কারণ এতে রোগীর উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে—ফলে, তার শ্রান্ত অবসন্ন ভাব বেড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। রোগীকে সংযত করার জন্যে অধিক পরিমাণ শান্ত রাখার ওষুধ (sedative drug) ও দেওয়া ঠিক নয়।

এইসব রোগীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে কোনোভাবেই এদের ওপর শারীরিক নির্যাতন এবং মানসিকভাবে অবমাননা করা ঠিক নয়। এই রোগীদের বাইরের চণ্ড মূর্তির ভেতরে মনে প্রচণ্ড ভয় থাকে ; সেইজন্যে সাবধানে সাহসের সঙ্গে রোগীর আত্মমর্যাদাকে যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রেখে তাকে আশ্বস্ত করা দরকার—বোঝানো দরকার যে সমস্ত বিষয়েই তাকে সাহায্য করা হবে, যাতে কোনোভাবেই কেউ তার ক্ষতি করতে না পারে। এই আশ্বাস অনেক সময়ে ম্যাজিকের (ভোজবাজির) মত কাজ করে। যদি নিরুপায় হয়ে রোগীকে বাঁধতেই হয়, তাহলে শক্ত দড়ি দিয়ে কখনও তা করা উচিত নয়—নরম কাপড় দিয়ে এমনভাবে বাঁধা দরকার যাতে শারীরিক আঘাত না লাগে অথবা শরীরের রক্ত চলাচলে কোনোরকম ব্যাঘাত না হয়। এর পর যথাসম্ভব তৎপর রোগীকে আশ্বাস এবং ওষুধ দিয়ে শান্ত করে বাঁধন খুলে দেওয়া দরকার। রোগীর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র অথবা অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্র থাকলে অবশ্যই পুলিশের সাহায্য নেওয়া সঙ্গত।

শান্ত করার যে সমস্ত ওষুধ সবচেয়ে নিরাপদ এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ, তা হচ্ছে ডায়জেপাম এবং হ্যালোপিরিডল। উপযুক্ত মাত্রায় এগুলির ইঞ্জেকশন দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর অবস্থাকে আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়। এই ধরনের ওষুধগুলিকে মুখে খাওয়ানো সম্ভব হলে সেটাই প্রথমে চেষ্টা করে দেখা সরকার। ওষুধ প্রয়োগ করতে হলে চিকিৎসকের সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন।

যেখানে মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সেখানে সম্ভব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার (electric treatment) প্রয়োগ করলে অতিশীঘ্র উত্তেজনার প্রশমন সম্ভব হতে পারে।

প্রবল উত্তেজিত রোগীকে দীর্ঘ সময় বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হলে শরীরে লবণ এবং জলের অভাবের ফলে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

এই রোগীদের শান্ত করার ব্যবস্থা ছাড়াও অনুসন্ধান করে রোগের নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা দরকার এবং তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে।

২। আত্মহত্যাপ্রবণ রোগী (Suicidal Patients)

কখনোই কোনক্রমেই কোনো ব্যক্তির আত্মহত্যার কথা অথবা আত্মহত্যার চেষ্টাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। 'ভয় দেখানোর জন্যে বলছে, ভাল করছে, আসলে কিছুই করবে না'—এইসব মন্তব্য করে রোগীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা খুবই বিপজ্জনক। আত্মহত্যা প্রবণতা যেভাবেই প্রকাশিত হোক না কেন, সব সময়েই এতে গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং ধরে নেওয়াই শ্রেয় যে এটা ওই ব্যক্তির যথার্থ মৃত্যু ইচ্ছারই প্রকাশ।

কেউ যদি অধিক মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে বলে 'ভুল করে খেয়ে ফেলেছি, মরার জন্যে নয়'—সে কথা বিশ্বাস না করাই সমীচীন।

সাধারণ লোকের ধারণা রোগীর সঙ্গে তার আত্মহত্যার কথা আলোচনা করা হলে তার ওই ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং তাতে তার আত্মহত্যার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে—এই ধারণা একেবারেই অবাস্তব-মিথ্যা, বরং সোজাসুজি আলোচনা করা হলে

আত্মহত্যার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায়।

সাধারণতঃ আত্মহত্যার প্রবণতা তিনটি কারণে দেখা যায়। প্রথমটি হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণাদায়ক কঠিন মনোরোগ, যেমন, বিষণ্নতারোগ (depresssive illness)। দ্বিতীয়টি অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ী দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধি। তৃতীয়টি হচ্ছে দুরূহ সামাজিক পরিস্থিতি যাতে আত্মমর্যাদাহানির প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

প্রতিটি আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তির সঙ্গে এই বিষয়গুলি সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী :

ক) তার সমস্যাটা কি ? তার সেই সমস্যা সমাধানের জন্য মৃত্যুই যে একমাত্র পথ, সেই চিন্তার আসল উৎসটা কি, সেটা অনুসন্ধান করে বের করা দরকার।

খ) মনে রাখা দরকার, যেসব সমস্যা মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ হচ্ছে—যাতে ব্যক্তির মনে হয় এতে তার আত্মমর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার সম্ভাবনা বেশি। এই কারণে এই অবস্থায় তার মান সম্মান কিভাবেই বা ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং কিভাবে তাকে রক্ষা করা যায়—তা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আর কি কি ভাবে তার সমস্যার অন্যান্য বাস্তবিক সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে—তা নিয়েও আলোচনা করা দরকার।

গ) ধর্মবিশ্বাসী হলে ঈশ্বরের নামে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে এই পথ থেকে বিরত করার চেষ্টা করা যায়।

ঘ) জীবনের বেশিরভাগ সমস্যারই যে বাস্তবধর্মী সমাধান বের করা সম্ভব, তার আলোচনা আবশ্যক।

ঙ) যে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির সন্তান এবং অন্যান্য প্রাণপ্রিয় আত্মীয়স্বজন আছে, সে ক্ষেত্রে এদের কথা তুলে যুক্তি দিয়ে বোঝানো দরকার যে, আত্মহত্যার ফলে মৃত্যু ঘটলে এইসব প্রিয়জনের অবস্থাটা কি হবে এবং তাদের সেই অবস্থায় ফেলা কি তার কাছে বাঞ্ছনীয় ?

চ) আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তির কথা ধৈর্য নিয়ে শোনা দরকার এবং দরদ দিয়ে বাস্তবিক সমাধানের পথগুলি দেখতে উৎসাহ দেওয়া এবং আবশ্যক মত সক্রিয়ভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া দরকার।

ছ) অসুখের কারণে এই প্রবণতা হলে সক্রিয়ভাবে তাকে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করা দরকার।

জ) আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি যাতে ওই ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের পথকে সুগম করতে পারে, সেদিকে চেষ্টা করা অবশ্য প্রয়োজন।

ঝ) আত্মীয়স্বজনকে এর গুরুত্ব বিষয়ে অনুধাবন করানো দরকার এবং যতদিন বা যতক্ষণ এর সমাধানের পথ বের করা না হচ্ছে, সেই সময় পর্যন্ত ওই ব্যক্তি যাতে একা না থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

৩। আতঙ্কগ্রস্ত রোগী (Patients with acute attacks of anxiety or panic)

আতঙ্ক বা ফোবিয়া রোগের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে । এই রোগে দেখা যায়, যে, বিশেষ কোনো অবস্থায় পড়লে অথবা বিশেষ কোনো বস্তুর সম্মুখীন হলে রোগীদের তীব্র উৎকণ্ঠা বা আতঙ্ক হয়—রোগী মনে করে এখনি বুঝি মৃত্যু ঘটবে, হৃৎপিণ্ড

বন্ধ হয়ে যাবে, অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। উৎকণ্ঠার দৈহিক এবং মানসিক লক্ষণগুলি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

এদের রোগের ইতিহাস জানা থাকলে চিকিৎসা অত্যন্ত সহজ। কিছু আশ্বাস এবং শান্ত রাখার সামান্য ওষুধ (sedative drugs) —যেমন কম মাত্রায় ডায়জেপাম দিলেই অতি অল্প সময়েই ঠিক হয়ে যায়। এমন কি আগে থেকে এদের নির্দেশ দেওয়া থাকলে চিকিৎসকের আশ্বাসের কথা মনে করে নিজেরাই অল্প একটু ডায়জেপাম খেয়ে অল্প সময়েই নিরাময় হয়ে যেতে পারে।

এমন কিছু অবস্থা মানুষের জীবনে আকস্মিকভাবে এসে পড়তে পারে যাতে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে পড়েও কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা হয়ে যায় ; যেমন, কোথাও আগুন লাগা অবস্থায় আটকে পড়া, নৌকাডুবির ফলে ডুবে যাওয়া, এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় পড়া, আততায়ীর হাতে পড়া, অথবা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা যেমন বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির জন্যে প্রাণ সংশয় হওয়া, অথবা কারখানা বা খনিতে বিষাক্ত গ্যাস কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে আকস্মিকভাবে জীবন রক্ষা হয়ে গেলেও কিছু লোকের ক্ষেত্রে একটা আতঙ্কগ্রস্ত ভাব থেকে যায়।

এদের জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী মনোচিকিৎসা (psychotherapy) এবং সেই সঙ্গে শান্ত রাখার কিছু ওষুধ (sedative drugs) প্রয়োগের আবশ্যক হয়।

৪। যে রোগী নিশ্চল-নির্বাক হয়ে আছে (Stuporous Patient)

এমন কিছু মানসিক রোগ আছে যাতে কখনো কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন রোগী একেবারে নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ বন্ধ করার ফলে একটা দারুণ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ক্যাটাটোনিক সিজোফ্রেনিয়া (Catatonic Schizophrenia) এবং বিষণ্ণতা রোগে এটা বেশি দেখা যায়। এই অবস্থাকে একটি বিশেষ জরুরী অবস্থা বলে গণ্য করা হয়—কারণ এর চিকিৎসা খুব তৎপর না করা হলে শরীরে জল, লবণ এবং খাদ্যের অভাবে এমন জটিল শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এদের চিকিৎসার জন্য তৎপর শরীরে জল, লবণ এবং খাদ্যের অভাব আবশ্যকমত কৃত্রিম উপায়ে নাকের মধ্যে দিয়ে পাকস্থলীতে নল ঢুকিয়ে, অথবা শিরায় ইঞ্জেকশন দিয়ে (লাগাতারভাবে) পূরণ করা অত্যন্ত জরুরী। এর পর যে কারণে এই দুরূহ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাকে নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসা করা দরকার। মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে এবং সম্ভব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা (electric treatment) দেওয়া গেলে রোগীর জীবন রক্ষা এবং অতি দ্রুত ও নির্বিঘ্নে আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়।

৫। মানসিক রোগে ব্যবহৃত ওষুধের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া (Unwanted acute side effects of psychiatric drugs)

ওষুধ মাত্রেরই কিছু না কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকে। কিন্তু মানসিক রোগে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ আছে যাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কোনো কোনো সময়ে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি

করে। এর মধ্যে দুই প্রকার ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা এখানে আলোচনা করা হবে।

ক) দুরূহ মানসিক রোগে খুবই ব্যবহার করা হয় যেমন ক্লোরপ্রমাজিন, ট্রাইফ্লুয়োপ্যারাজিন, হ্যালোপিরিডল ইত্যাদি ওষুধগুলোর ব্যবহারে কোনো কোনো সময়ে দেখা যায় যে, রোগীর সারা দেহ কাঁপছে, মুখে খুব বেশি লালা ঝরছে, শরীর ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে, ঘাড় ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে বেঁকে যাচ্ছে, চক্ষু গোলক (eye ball) ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে ইত্যাদি।
এসব দেখলে রোগী এবং বাড়ির লোকেরা যথেষ্ট ঘাবড়ে যায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আপাত দৃষ্টিতে এই অবস্থাটা খুব ভয়াবহ মনে হলেও এর থেকে রোগীর সাংঘাতিক বিপদ কিছু হয় না। অতি সহজেই এই অবস্থাকে আয়ত্তে আনা যায়।

এর চিকিৎসা কি

যেসব রোগী নিজেদের বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করাবে, তাদের আত্মীয়দের ওষুধ প্রয়োগের আগে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে এইসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে—কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই এবং যদি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তখন তার প্রতিকারের জন্যে ডাক্তারকে জানানো ছাড়া তারা নিজেরা কি করবে,—সেটাও বুঝিয়ে দিতে হয়।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে ট্রাইহেক্সিফেনিডিল (trihexiphenydil) ২ মিলিগ্রামের বড়ি তখনই ২টি বড়ি এক সঙ্গে দিতে হবে এবং দৈনিক তিন থেকে চারটি করে ঐ বড়ি ২/৩ দিন চালাতে হবে ; যে ওষুধ থেকে এই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, হয় তার মাত্রা কমাতে হবে, অথবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। এই ব্যবস্থায় অল্প কয়েক ঘণ্টাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

যদি অবস্থাটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়, অথবা মুখে ওষুধ খাওয়ানোর অসুবিধা হয় তাহলে ১টি ২৫-৫০ মিলিগ্রামের প্রোমেথাজিন ইন্ট্রামাসকুলার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ কয়েক মিনিটেই সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রোমেথাজিনের পরিবর্তে ডায়জেপাম ১০ মিলিগ্রামের ইন্ট্রামাসকুলার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলেও ঐ একই সুফল পাওয়া যায়।

খ) আর একরকম ওষুধ আছে যাকে এন্টিডিপ্রেসিভ ড্রাগ বলা হয়, যেমন, ইমিপ্রামিন (Imipramine), এমিট্রিপটিলিন (Amitriptyline), ডক্সিপিন (Doxipine) ইত্যাদি। এই ওষুধগুলি বিষণ্ণতা রোগে ব্যবহার হয়। এ ওষুধ যখন কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তখন কোনো কোনো সময়ে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে।

প্রতিকারের জন্য ওষুধ প্রয়োগের পূর্বেই রোগীর বাড়ির লোককে এ বিষয়ে বলে দেওয়া দরকার এবং আরও আশ্বাস দেওয়া দরকার এই বলে যে, যদি ওরকম কিছু হয়, তাতেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওষুধ তখনকার মত সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়ে, দরকার হলে ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে খুব কম মাত্রায় ওষুধ শুরু করে মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ালে, ওই প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা থাকলে, প্রস্রাব একেবারে বন্ধ না হয়ে, যখনই প্রস্রাবের কিছু অসুবিধা দেখা দেবে—তখনই মাত্রাটা একটু কমিয়ে দিলে, ঐ বিরূপ প্রতিক্রিয়া আর হবার সম্ভাবনা থাকে না।

৩১

যুগে যুগে মানসিক চিকিৎসার ইতিহাস

আদিম মানুষের কাছে মৃত্যু যেমন ছিল রহস্যজনক, ঠিক তেমনিই বিস্ময়কর ছিল মানুষের অবাস্তব আর অস্বাভাবিক আচরণ। বিচিত্র ঘটনাগুলো তাদেরকে আশ্চর্য করেছে, ভয়ও পাইয়েছে। উৎস সন্ধানে ব্যস্ত হয়েছে—পরিত্রাণের পথ খুঁজেছে। আদিম যুগের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জেনেছিল, মানুষকে খায় মানুষের চাইতেও শক্তিশালী হিংস্র জন্তু। ভয়ানক সেই দৃশ্যগুলো দেখেছে চোখের সামনেই। মানুষ যখন মরেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়ে, তখনও ভেবেছে নিশ্চয় মানুষের চাইতেও শক্তিশালী কোনো জীবন নিজেদের অদৃশ্য রেখে এইভাবে মানুষ হত্যা করে চলেছে। অদৃশ্য এই শক্তিগুলিই কখনো ভূমিকম্প, কখনো প্লাবন, কখনো ঝঞ্ঝা হয়ে তাদের বিনাশ করেছে। মহামারীর প্রকোপে কাতারে কাতারে মানুষকে মরতে দেখেছে একই রকমের দৈহিক কষ্টে—কল্পনা করে নিয়েছে নিশ্চয় এর পেছনেও রয়েছে অতি ভয়াবহ প্রবল কোনো হিংস্র শক্তি। চোখে দেখা হিংস্র জন্তু বা হিংস্র মানুষের আক্রমণে মৃত্যুর মতন করেই মানুষের সবকিছু দুঃখকষ্ট আর মৃত্যুর কারণকে বুঝতে চেয়েছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই কল্পনা করে নিয়েছে, নিশ্চয়ই কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে মানুষের শরীর বা মনের বিকার ঘটছে। আর এই অশুভ শক্তির খোঁজ করতে গিয়েই ভূত, প্রেত, ডাইনি, পিশাচ, ডেভিল, ডেমন, জিন, পরী ইত্যাদির কথা ভেবে নিয়েছে। এইসব অশুভ শক্তিকে দেখা যায় না ; তবে এদের প্রকৃতি যে দুষ্ট, হিংস্র পশু বা মানুষের মত—সেটা বোঝা যায়। এরা কখনো কখনো মানুষের দেহে প্রবেশ করে দেহ-মনের নানা বৈকল্য ঘটায়। এইসব অশুভ শক্তির মধ্যে যারা অতি-প্রবল, অতি-পরাক্রান্ত, রূপকথা বা পুরাণের দানবের মত, তারাই বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভয়াবহ মহামারী ইত্যাদি ঘটায়। এদেরকে অপদেবতা আখ্যাও দেওয়া হয়।

মানুষের মনের মধ্যে কিভাবে এল এইসব ভূত-প্রেতের কল্পনা ? কল্পনায় ভূত, প্রেত, আত্মা—সবই এক হয়ে গেছে। আজও মানুষ বিশ্বাস করে আত্মার অস্তিত্বে। আমরা এখানে ধর্মীয় বা দার্শনিক তত্ত্বে যাচ্ছি না। সাধারণ মানুষ আত্মা বলতে কি বোঝে, সেটাই দেখছি। জীবিত প্রাণীর মধ্যে দেহ ছাড়া আরও একটা কিছু থাকে, যাকে দেখা যায় না, যা মৃত্যুর সময়ে দেহ ছেড়ে চলে যায় এবং যার মৃত্যু নেই—এই রকম একটা কিছুকেই আত্মা বলে মনে করা হয়। আদিম যুগের মানুষ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের মানুষ পর্যন্ত, অনেকেই বিশ্বাস করে অদেখা আত্মার অস্তিত্বে। কিন্তু কেন ? কারণটা এই : আত্মার

অস্তিত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের হাতে এমন কিছু তথ্য আছে, যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় আত্মার অস্তিত্ব। তথ্যগুলি হচ্ছে :

১। মানুষ মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখতে পায়, তার কথা শুনতে পায়, সেই কথা হয় কখনো শাসানি, কখনো অভয়বাণী।

২। গুরুতর রোগীর প্রলাপের মধ্যে মৃত ব্যক্তির, বিশেষ করে মৃত আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতি ঘটে। 'ভর' হওয়া মানুষের মধ্যেও মৃত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটছে, এমনটাও দেখা যায়।

দুই ক্ষেত্রেই শুধু মৃতব্যক্তিই আবির্ভূত হয় না, কখনো কখনো দেবদেবীরও আবির্ভাব ঘটে। এইসব আত্মা অথবা দেবদেবী কখনো হিতকারী (benevolent), কখনো ক্ষতিকারক (malevolent) হতে পারে।

যখনি কোনো মানসিক রোগীর অবাস্তব কথাবার্তা আর আচার-আচরণের মধ্যে ধর্মীয় ভাবের লক্ষণ থাকে, লোকে তাদের শ্রদ্ধা করে, তাদের সঙ্গ চায়। আবার যদি কোনো মানসিক রোগী অশালীন, ধর্মবিরোধী আচরণ চালিয়ে যায়, মানুষ তাদের ভয় করে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়। পাগলা বাবা, পাগলা ঠাকুর, অথবা ঠাকুর-দেবতার 'ভর' পাওয়া ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাই পায় শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা। ধর্মবিরোধী আর অসামাজিক আচরণকারী ব্যক্তিদের ধরে বেঁধে রেখে, ওঝা ডেকে তার ভেতরের ভূতকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

রোগ, দুঃখ, অশান্তির মূলে রয়েছে ভৌতিক কারণ, এ বিশ্বাস শুধু যে আদিমকালেই ছিল, তা নয়। আজও এইসব ধারণা অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত আর অশিক্ষিত গ্রাম্য সমাজে বিলক্ষণ বিদ্যমান, এমন কি শিক্ষিত সমাজেও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই এই ভ্রান্ত ধারণার অধীন। সহজেই বোঝা যায়, এইসব ধারণার ভিত কতখানি মজবুত। প্রকৃতির অনেক রহস্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আজকের মুনষ যেমন উদ্‌ঘাটন করেছে, তেমনই বুঝেছে, ভূত-প্রেত-অপদেবতা মানুষেরই অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। প্রাকৃতিক কারণেই মানুষের অসুখ-বিসুখ হয়—বিজ্ঞানের বিচারে তা প্রমাণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, আদিম কুসংস্কার আর ভ্রান্ত ধারণা রুদ্ধ করে রেখেছে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পথ।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। মাত্র ৪/৫ বছর আগেকার কথা। তখন মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণার জন্যে প্রায়ই কতকগুলো গ্রামে যেতে হত। তখনি জানতে পারি, অদ্ভুত এক রোগ সংক্রামিত হয়ে চলেছে একটি গ্রামে। সেই গ্রামে—যা দেখেছিলাম আর শুনেছিলাম, এবার তা বলি।

রোগের বিবরণ এই রকম : আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের কোনো জায়গায় হঠাৎ শুরু হয় একটা বিরক্তিকর অনুভূতি—কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। হাতে বা পায়ে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে যেমন ঝিন্‌ঝিনি লাগে এই অনুভূতি কতকটা সেই রকম। আক্রান্ত ব্যক্তি ভীষণ ভয় পায়। প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে তার কেবলই মনে হতে থাকে—মৃত্যুর আর দেরি নেই। এই অবস্থায় নাকি রোগীকে দাঁড় করিয়ে রেখে মাথায় অনবরত জল ঢেলে গেলে রোগের উপশম ঘটে। এই অবস্থা থাকে পনেরো মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত। তারপর অদ্ভুত অনুভূতিময় আতঙ্কিত অবস্থাটা চলে যায় বটে, রোগীর সারা শরীরে একটা ক্লান্তির ভাব থেকে যায় কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত।

ব্যাপার দেখে গ্রামের ৮/১০ জন যুবক স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তুলেছিল। ঘটনা কানে

এলেই দল বেঁধে ছুটতো সেখানে—হুড়হুড় করে জল ঢেলে যেত রোগীর মাথায়। স্বেচ্ছাসেবক দলের একজনও আক্রান্ত হয়েছিল একই রোগে। গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দু'হাজার। স্ত্রী পুরুষ মিলে আক্রান্ত হয়েছিল আঠারো জন।

এ রোগ প্রথম যার হয়েছিল, সে দূরের এক গ্রামে শুনে এসেছিল অদ্ভুত এই ব্যাধির বৃত্তান্ত। এমন কথাও শুনেছিল, করাল এই ব্যাধি যাকে ধরে, বহু ক্ষেত্রেই তার মৃত্যুও ঘটে। সেই সঙ্গে জেনেছিল, রোগের উপশম ঘটে যদি মাথায় এন্তার জল ঢেলে যাওয়া যায়।

এমন একটা মুখরোচক ঘটনার বৃত্তান্ত নিজের গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে না দিয়ে কি থাকা যায় ? বাড়ি ফিরেই লোকটি সেই কাজটি করেছিল নিষ্ঠার সঙ্গে।

আর, তার কয়েকঘন্টা পরেই নিজেই আক্রান্ত সেই রোগে। দেখতে দেখতে বিচিত্র ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে।

একটা গুজবও রটেছিল এই রোগের কারণ হিসেবে। গুজবটা এই : এই অসুখ প্রথম দেখা দেয় যে গ্রামে, সে গ্রামে ছিল একটা বিরাট আম বাগান। সেই বাগানের সব ক'টা গাছ কেটে ফেলার পর থেকেই রোগের আবির্ভাব ঘটেছে সেই গ্রামে। গ্রামবাসীদের ধারণা, বাগানে ছিল একটা জিন [১] ভূতের আস্তানা। গাছ কেটে তাকে বাস্তুহারা করা হয়েছে বলেই মহাখাপ্পা হয়ে সে এই রোগে ভুগিয়ে মারছে গ্রামের লোকদের।

ভুগেছে ঠিকই, মরেনি কেউই। অন্য কোথাও যে রোগটা প্রাণঘাতী রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন কথাও শোনা যায়নি নিশ্চিতভাবে।

রোগের সমস্ত বিবরণ শোনার পর আর রোগীদের পরীক্ষা করার পর দেখা গেল, রোগটা ভূতে বানাচ্ছে না—মনের মধ্যেই তৈরী হচ্ছে। একরকম স্বল্পক্ষণ স্থায়ী নিউরোসিস ব্যাধিতে ভুগছে আক্রান্ত ব্যক্তিরা—মৃত্যু ঘটানোর মত করাল ব্যাধি মোটেই নয়।

মানসিক রোগের উৎপত্তি যদি ভূত-প্রেতের প্রভাবেই হয়, তাহলে তার প্রতিকারের কথা সেই পুরাকালে মানুষ চিন্তা করেছিল কিভাবে, এবার তা দেখা যাক।

ভূত, প্রেত, অপদেবতা, ইত্যাদি এরা তো সব অশুভ শক্তি। সুতরাং এদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্যে মানুষ শক্তিমান শুভশক্তিকে কল্পনা করে নিয়েছে। সর্বশক্তিমান সেই শক্তি হিতকারী শক্তি অবশ্যই। অদৃশ্য সেই সর্বশক্তিমানের কাছে নানাভাবে পূজা আর প্রার্থনা জানিয়েছে—যাতে তিনি রক্ষা করেন মানুষকে। যে ধারণাটা মানুষকে আনত হতে বাধ্য করেছে সর্বশক্তিমানের কাছে তা এই : মানুষ যদি সর্বশক্তিমানকে পূজা-প্রার্থনা জানিয়ে মেনে চলে, তাহলে তিনি তাদের রক্ষা করবেন ; আর মানুষ যদি তাঁর অনুশাসন না মানে, তাহলে তিনি আর মানুষকে রক্ষা করবেন না ; ফলে মানুষ ওই সব প্রেতাত্মাদের কবলে পড়বে, তাদের দৌরাত্মের শিকার হবে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে না মানে, তাহলে শুধুসেই ব্যক্তিই ভুগবে আর মরবে ; আর যদি সমষ্টিগতভাবে অমান্য তাচ্ছিল্য করা হয় ঈশ্বরকে —তাহলে সমষ্টিগতভাবেই দেশব্যাপী মহামারী আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের অবিশ্বাস উপেক্ষার মহা সাজা দিয়ে যাবে।

এখন দেখা যাক, এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে কিভাবে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল সেকালে।

(১) দেবতার স্থানে নিয়ে যাওয়া হত রোগীদের। পুরোহিত রোগীর নিরাময়ের জন্যে

[১] জিন— অশরীরী দানব বিশেষ

প্রার্থনা জানাত ঈশ্বরের কাছে।

(২) এতেও কাজ না হলে, এই ধরনের মানসিক রোগীদের দেহের ভেতর থেকে প্রেতাত্মাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হত। প্রেত বিতাড়নের পন্থা ছিল অনেক রকমের। রোগীদের ওপর দৈহিক নির্যাতন করা হত নানাভাবে। যেমন,

ক) চাবুক দিয়ে মারা।

খ) গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দেহে ক্ষত সৃষ্টি করা।

গ) শিরা কেটে শরীরের রক্ত বের করে দেওয়া।

ঘ) খাদ্যে কটু দুঃর্গন্ধযুক্ত বস্তু মিশিয়ে খাওয়ানো।

ঙ) ভীষণভাবে ভেদ এবং বমি হতে পারে, এমন সব দ্রব্য খাওয়ানো।

চ) মাথার খুলিতে ফুটো করে দিয়ে ভূতের বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেওয়া।

এর পরেও ছিল, রোগীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা—যাতে ভেতরকার প্রেতাত্মা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

আবার বলি, এই হতভাগ্যদের কাউকেই কিন্তু রোগী বলে মনে করা হত না। সুতরাং ভূত-বিতাড়ন পদ্ধতিগুলোও ভূত-প্রেত-পিশাচদের মতই পৈশাচিক।

এখন দেখা যাক, মানসিক রোগ চিকিৎসার ইতিহাসে চিকিৎসার কি-কি নজির পাওয়া যায়।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, প্রায় ৫ কোটি বছর আগে, মানুষ যখন প্রস্তর যুগে গুহায়

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাথার খুলি

চিত্র-১৬
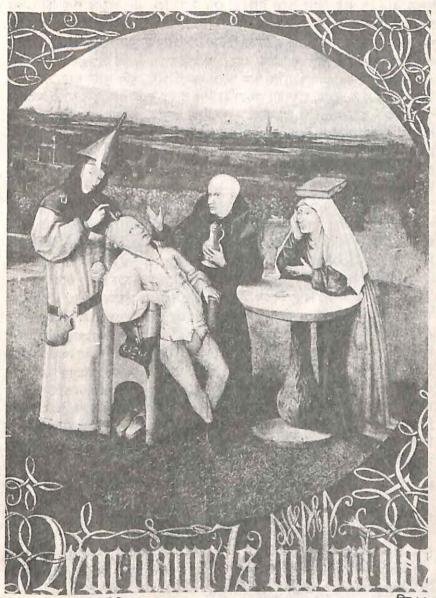
মধ্যযুগের ট্রেফাইনিং শল্যচিকিৎসা

চিত্র-১৭

বাস করত, তখনকার দিনের মানুষের মাথার খুলিতে গোলাকার ছিদ্র পাওয়া গেছে। এখনকার দিনে যাকে বলা হয় ট্রেফাইনিং (trephining), এটা সেই শল্যচিকিৎসার চিহ্ন। ছিদ্রের চারপাশ ঘিরে, নতুন হাড় গজানোর প্রমাণ থাকায় মনে করা যেতে পারে যে সেই ব্যক্তি খুলিতে ফুটো হওয়ার পরেও বেঁচেছিল। ছিদ্র করা হয়েছিল কি কারণে, সেটা অবশ্য অনুমান সাপেক্ষ। তবে ওই ধরনের শল্য চিকিৎসার উপযুক্ত অস্ত্র সে সময়ে ছিল

নিশ্চয় এবং সে অস্ত্র পাথর দিয়ে তৈরি। সেই সঙ্গে ছিল এই ধরনের শল্য চিকিৎসার নৈপুণ্য। হয়তো মাথার অসহ্য যন্ত্রণার উপশমের জন্যেই খুলি ফুটো করা হয়েছিল পাথরের যন্ত্র দিয়ে ; সে যন্ত্রণা মস্তিষ্কের টিউমারের জন্যেও হতে পারে, অথবা মানসিক ব্যাধির জন্যেও হতে পারে। অথবা হয়তো মনোবিকারের কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল, নিশ্চয় বদ প্রেতাত্মা ঢুকে বসে আছে মাথার মধ্যে, খুলি ফুটো করে দিয়ে তার বেরুবার পথ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফুটো-ওলা খুলি বলেই এত সব অনুমানের মধ্যে যেতে হচ্ছে আমাদের— মধ্যযুগে মানুষের মাথায় কেন ছিদ্র করা হত শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে ইস্পাতের ট্রেফাইন যন্ত্র দিয়ে, তার প্রমাণযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে। নির্দেশ দিত দেবালয়ের পুরোহিতরা মাথা ফুটো করে প্রেতাত্মাকে টেনে বের করে দেওয়া হোক। মানসিক রোগীদের করোটি ছিদ্র করতে ট্রেফাইনিং যন্ত্র তুলে নিত শল্য চিকিৎসকরা।

ভূত, প্রেত, পিশাচ অপদেবতারা মানুষের দেহে প্রবেশ করে মনোবিকার ঘটায়— অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির আচার-আচরণ, অশালীন আর ধর্মবিরোধী হয়ে যায়—এই ধারণা প্রাচীন চৈনিক, মিশরীয়, গ্রীক, ভারতীয় আর হিব্রুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সর্বত্রই ভূত বিতাড়নই ছিল এই রোগের চিকিৎসা। দু-ভাবে করা হত এই ভূত বিতাড়ন ক্রিয়া :

(১) দেবতার কাছে পূজা-প্রার্থনা, যাতে দেবতা তুষ্ট হয়ে ভূতকে বিদায় করেন।

(২) রোগীর ওপর কিছু দৈহিক নির্যাতন করা ; যাতে ভূতের পক্ষে ওই দেহের আস্তানা অসহ্য হয়ে ওঠে। এই চিকিৎসা হত দেবতার স্থানে, পুরোহিতরা ধর্মীয় ব্যাপারে পৌরোহিত্য করা ছাড়াও চিকিৎসকের কাজও করতেন। অনেক জায়গাতেই চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত পুরোহিতদের। কোথাও দেবস্থান সংলগ্ন জায়গায় মানসিক রোগীদের রেখে সেইখানেই চিকিৎসা করা হত। কোনো কোনো জায়গায় রোগীদের প্রতি যথেষ্ট মানবিক ব্যবহার করতেন পুরোহিতরা। যেমন, রোগীদের মনোরঞ্জনের জন্যে নানা রকম ব্যবস্থার আয়োজন। প্রাচীন গ্রীসের যখন সুবর্ণযুগ, তখনি আবির্ভাব ঘটেছে হিপোক্র্যাটিসের (খ্রী: পূ ৪৬০-৩৭৭)। এই হিপোক্র্যাটিসকেই বলা হয় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। ইনিও চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে। মানসিক রোগ বিষয়ে তিনি যা যা বলেছিলেন তা এই :

(১) মানুষের অসুখ-বিসুখের সঙ্গে দেব-দেবীর অথবা ভূত-প্রেতের কোনো সম্পর্ক নেই।

(২) প্রাকৃতিক কারণেই মানসিক রোগ হয় এবং তার চিকিৎসা অন্যান্য রোগের চিকিৎসার মতই হওয়া দরকার।

(৩) গ্রীক দার্শনিক পাইথ্যাগোরাসের যেমন ধারণা ছিল মস্তিষ্কই বুদ্ধি-বৃত্তির কেন্দ্র এবং মস্তিষ্কের বিকারের ফলেই মানসিক রোগের উৎপত্তি হয়। হিপোক্র্যাটিসও যথেষ্ট জোর দিয়ে তার পুনরুল্লেখ করেছিলেন।

(৪) হিস্টিরিয়া রোগ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদেরই হয় এবং এই রোগে যৌন বিক্ষোভ ঘটে, যার ফলে ইউরেটাস শরীরের সর্বত্র বিচরণ করতে থাকে।

(৫) শরীরের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত চার রকম শরীরজাত দ্রব্যের (humors) কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এগুলির মাত্রার তারতম্যের ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া নির্ধারিত হয় সুসম মাত্রায় থাকলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে। এদের মাত্রার অসামঞ্জস্য ঘটলে মানুষ নানা রকম শারীরিক আর মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই চার
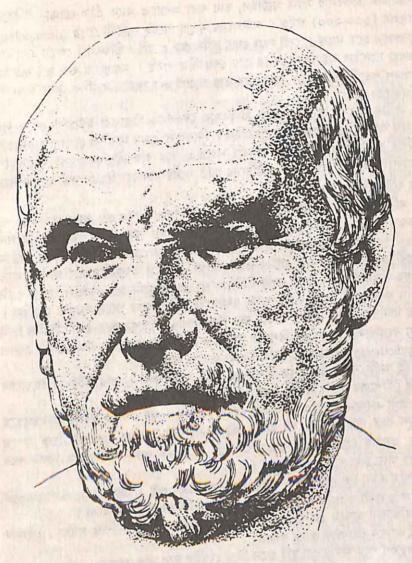
চিত্র-১৮

হিপোক্র্যাটিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৭৭)

প্রকার দ্রব্যগুলি হচ্ছে : ক) শোনিত (blood), খ) কৃষ্ণপিত্ত (black bile), গ) পীত পিত্ত (yellow bile), এবং ঘ) কফ (phlegm)।

চরক-সংহিতায় যে বায়ু-পিত্ত-কফের উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে এই গ্রীক তত্ত্বে।

হিপোক্র্যাটিসের চিকিৎসা পদ্ধতি যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিল এবং তাঁর সময়ে যে

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সূচনা ঘটেছিল, তার ধারা অব্যাহত থাকে গ্রীক-রোম্যান ইতিহাসে গ্যালেন (১৩০-২০০) পর্যন্ত। গ্যালেনের মৃত্যুর পরেই ডাকিনীতত্ত্বের (demonology) পুনরুত্থান হতে থাকে। সেই সঙ্গে ঘোর দুর্দিন শুরু হয়েছিল চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং সেই দুরবস্থা চলেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ সীমা পর্যন্ত। মধ্যযুগের শুরু যদি ধরা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, তাহলে দেখা যাবে তার আগেই শুরু হয়েছে মানসিক রোগ চিকিৎসার অন্ধকারের যুগ।

প্রাচীন গ্রীসের মানসিক রোগ চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ইউরোপ থেকে লুপ্ত হলেও আরব দেশে কিন্তু থেকে গিয়েছিল। বিশ্বের সর্বপ্রথম মানসিক রোগের হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল ৭৯২ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ শহরে। তার অল্প কিছুদিন পরেই দামাসকাস, অ্যালেপ্পো, ইত্যাদি জায়গায়। রোগীদের প্রতি যথেষ্ট মানবিক আচরণ করা হত ওপরের সব কটি চিকিৎসা কেন্দ্রে।

মার্কিন ঐতিহাসিক ব্রাউনের লেখা 'আরবীয় চিকিৎসা' নামক গ্রন্থ থেকে আরব দেশের একজন বিখ্যাত মুসলমান চিকিৎসকের কথা জানা যায়—নাম তাঁর আভিসেনা (৯৮০-১০৩৭)। আভিসেনা নিজের ধর্মভাবকে অক্ষুণ্ন রেখে প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকে আরবী ভাষায় লেখেন এবং প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত চিকিৎসার সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর লেখা চিকিৎসা শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। নানা দেশে সকল ধর্মবিলম্বী চিকিৎসকের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। নানা মানসিক ব্যাধির বিবরণ পাওয়া যায় তার লেখায়। বিশেষ করে একটি জিনিস তিনি লক্ষ্য করেছিলেন : **মানসিক বিপর্যয়ে শারীরিক ব্যাধি হতে পারে।** এবং মনোচিকিৎসার (psychotherapy) প্রয়োগে সেগুলি নিরাময়ও হতে পারে।

এই আভিসেনার চিকিৎসক হিসাবেও বিস্তর খ্যাতি ছিল। তাঁর চিকিৎসা প্রয়োগের অপূর্ব কৌশলের একটা নিদর্শন এখানে দিচ্ছি :

রোগী একজন রাজপুত্র। বিষণ্নতা রোগে আক্রান্ত। এই রোগের ফলেই মনে জন্মেছে বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা—সে যেন একটা গরু। এই ভ্রান্ত ধারণার বশে সে যাকে সামনে পেত, তাকেই ধরে জ্বালিয়ে মারত আর চি৺ৎকার করে বলত—"আমাকে জবাই করে আমার মাংস রান্না করে তোমরা খাও।"

শেষে এমন হল যে, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল রোগী। এই অবস্থায় আভিসেনাকে বলে কয়ে রাজী করানো হল বিশেষ এই রোগীর চিকিৎসা করানোর জন্যে।

আভিসেনা প্রথমে রোগীর কাছে খবর পাঠালেন— "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ; তোমার কশাই আসছে তোমাকে জবাই করতে"।

কিছুক্ষণ পরে আভিসেনা ছুরি হাতে নিয়ে রোগীর ঘরে ঢুকে বললেন— "কোথায় সেই গরু"? এখুনি তাকে আমি জবাই করব।

রোগী তখন দীনভাবে নিজেকে দেখিয়ে বললে "আমি এখানে"।

আভিসেনা তখন রোগীর সারা দেহ পরীক্ষা করে বললেন, এ যে বড়ড় রোগা, একে এখন মেরে কোনো কাজ হবে না একটু মোটাসোটা হওয়া দরকার।

শুনে রোগীর খুব খাবার আগ্রহ জাগল। খুব ভাল ভাল খাবার নিয়মিত দেওয়া হল তাকে। কিছুদিনের মধ্যেই দেহ বেশ পুষ্ট হল, সেই সঙ্গে বিদায় নিল ভ্রান্ত ধারণা। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল রোগী।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই ধরনের উপস্থিত এবং বিচক্ষণতার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুব বেশি

পাওয়া যাবে না।

মধ্যযুগে মানসিক রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা

মধ্যযুগের ইউরোপে মানসিক রোগের চিকিৎসা প্রধানতঃ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ২০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মোটামুটি মধ্যযুগ বলা যায়। এই মধ্যযুগের প্রথম ভাগে মানসিক রোগীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের কিছু কিছু নজির পাওয়া যায়। এই সময়ে কোনো কোনো স্থানে ধর্মীয় মঠে মানসিক রোগীদের আশ্রয় দেওয়া হত এবং তাদের আরোগ্য কামনা করে ঈশ্বরের কাছে পূজা-প্রার্থনা করা হত। রোগীদের দেহ থেকে ভূত বিতাড়নের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল—তবে মৃদু মাত্রায়। যেমন, উৎকট গন্ধ আর কটু স্বাদ বিশিষ্ট গাছ গাছড়ার রস মদের সঙ্গে মিশিয়ে পাঁচন বানিয়ে পান করানো হত।

এরপর একটু একটু করে ভূত বিতাড়নের ব্যবস্থা কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। এর মধ্যে উদ্দেশ্যটা ছিল এই : যে অদৃশ্য শয়তানটা মানুষের মধ্যে ঢুকে তার স্বভাব-বিকৃত করে দিচ্ছে, তাকে যেভাবেই হোক শরীর থেকে বের করে দিতে হবে। মানসিক রোগীর ওপর ভূত বিতাড়নের নামে যে অবর্ণনীয় দৈহিক আর মানসিক নির্যাতন করা হত, তার লক্ষ্য ছিল অনুপ্রবেশকারী সেই শয়তান, মানুষটা নয়। অত্যাচার চালানো হত এই ধারণা নিয়েই নিষ্ঠুর, নির্মমভাবে।

মানসিক রোগীদের ওপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচার তুঙ্গে উঠেছিল ১৪৮৬ সালে—একটি তথাকথিত পবিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর। বইটির নাম 'ডাইনির মুগুর' (malleus maleficarum/ The Witche's Hammer)। এ বই লেখা হয়েছিল পোপের নির্দেশে। লিখেছিলেন দুজন ধর্মতত্ত্ববিৎ, হেনরী ক্র্যামার আর মেস্ স্প্রেন্জার। ইতিহাসের এক নির্লজ্জ বৃত্তান্ত বলা চলে সেই বইকে, যে বই অন্ধ কুসংস্কারকে সংস্কাররূপে গ্রহণ করে মানবতার চরম অপমান আর মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল।

এই বইতে ছিল ডাইনি বিদ্যা (Witchcraft)-এর বিশদ বিবরণ এবং ডাইনি অনুসন্ধানের পন্থা। ডাইনির যেসব লক্ষণের কথা বলা হয়েছিল এই গ্রন্থে, সেগুলো কঠিন মানসিক রোগগ্রস্ত এবং হিস্টিরিয়া আক্রান্ত স্ত্রীলোকের প্রলাপ, আর অস্বাভাবিক আচার-আচরণের বিবরণ ছাড়া কিছুই নয়। এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে, ডাইনির কুপ্রভাবে মানুষের যে কোনো শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধি হতে পারে। আরও বলা হয়েছে, ডাইনিতে ধরার সবচেয়ে নিশ্চিত আর সন্দেহাতীত অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে —ডাইনিতে ধরা ব্যক্তিকে দিয়েই তা স্বীকার করানো। স্বীকার করানোর পর্বে, স্বীকৃতি আদায় না হওয়া পর্যন্ত, অত্যাচার চালিয়েই যেতে হবে। খুবই কাজ দিয়েছিল এই পন্থা। নির্যাতনের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ত মানসিক রোগীরা —রেহাই পাওয়ার জন্যে অত্যাচারীর দল যা বলত, তাই স্বীকার করে নিত স্বমুখে। এছাড়াও, নানা রকম জবরদস্তি করে রোগীদের কাছে জানতে চাওয়া হত তাদের এই দুষ্কর্মে সহযোগীদের নাম কি ? যে নামগুলো পাওয়া যেত নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের ওপর প্রয়োগ করা হত একই অত্যাচার পরম্পরা—মুখ থেকে স্বীকৃতি আদায় না করা পর্যন্ত। পৈশাচিক পন্থায় সংগ্রহীত এই স্বীকৃতিই ছিল ডাইনির অস্তিত্ব আর ডাকিনীতত্ত্ব প্রমাণের সব সেরা তথ্য। এত করেও স্বীকৃতি আদায় করা না গেলে, চরম দণ্ডের ব্যবস্থাও হত।

ডাইনি সম্বন্ধে আরও কিছু ধারণা প্রবল ছিল এই সময়ে। যেমন, তাদের থাকত অনেক রকমের অলৌকিক ক্ষমতা। তারা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে শরীরের আর মনের বিবিধ বিকৃতি ঘটাতে তো পারেই, তেমনি পারে মহামারীকে ডেকে আনতে, শস্যের ক্ষতি করতে, এমন কি দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ঝঞ্ঝাও তাদের হুকুমের বশ। এরা পুরুষের ধ্বজভঙ্গ ঘটাতে পারে, দুগ্ধবতীর দুধ নষ্ট করে দিতে পারে, মায়াবলে নানা আকৃতি ধারণ করতেও পারে, যে কোনো প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আর মানুষের সমাজের নানা ক্ষতি করতে পারে এরা এদের এই অতিপ্রাকৃত শক্তি দিয়ে।

মধ্যযুগের ডাইনি পোড়ানো

চিত্র-১৯
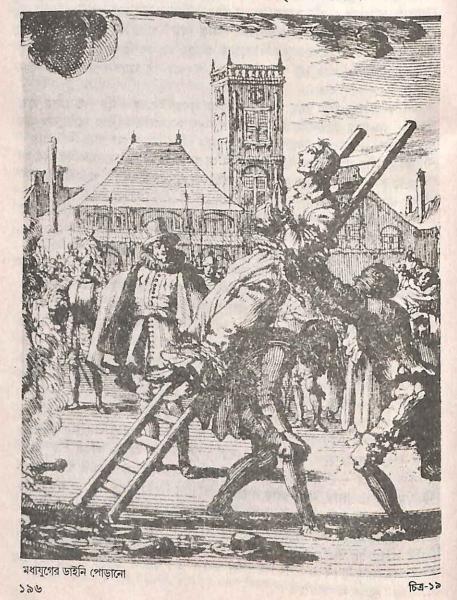
ভূত-প্রেত পিশাচ দানো সম্বন্ধে এই ধরনের লোমহর্ষক ধারণা প্রচলিত ছিল সমাজে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধারণাগুলো ভীষণভাবে পেয়ে বসে মানুষকে। 'ডাইনির মুগুর'- বইটা যে এই বদ্ধ বিশ্বাসগুলোয় যথেষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডাইনি আতঙ্কে দারুণভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষ। আশ্চর্য এই যে, তৎকালীন ইউরোপে এবং অন্যান্য অনেক দেশে ধর্মীয় সংস্থার আর জনসাধারণের কর্তৃপক্ষরাও পরম বিশ্বাসে এই সব উদ্ভট তত্ত্বকে সরকারীভাবে গ্রহণ করেছিল। এই সময়েই, প্রায় ১৫০ বছর ধরে, আনুষ্ঠানিক ভাবে আদালতের মাধ্যমে, হাজার হাজার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল জনসমক্ষে—যাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল স্ত্রীলোক।

সাধারণতঃ তিনভাবে দেওয়া হত এই শাস্তি :

ক) শিরচ্ছেদ বা শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার পর পোড়ানো।

খ) জীবন্ত পোড়ানো।

গ) অঙ্গচ্ছেদ করে তারপর পোড়ানো।

এই তাণ্ডবলীলা ইউরোপে নাটকীয় রূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। তবে, ডাইনির কুপ্রভাবে অথবা কুদৃষ্টিতে যে মানসিক বিকার ঘটে যেতে পারে, এমন ধারণা ছিল উনবিংশ শতাব্দীতেও।

ভারতবর্ষে কি ভাবে এসেছিল এই ডাকিনীতত্ত্ব, এখন সে আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। ইউরোপের মত অত নিকৃষ্ট রূপ না নিলেও, এদেশেও ওই ধারণার যে বিস্তার ঘটেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধারণা আর প্রথা যে এদেশ থেকে বর্তমানে বিদায় নিয়েছে, এমন কথাও বলা যাবে না। আজও বিক্ষিপ্তভাবে ডাইনি নিধনের সংবাদ আসছে ভারতের নানান অঞ্চল থেকে।

উৎকট ডাইনি বিশ্বাসের যুগেও কিছু মহান ব্যক্তি নির্ভীকভাবে এই ডাইনি তত্ত্ব আর ডাইনি নিধনের বিরোধিতা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) মোহান উইয়ার (১৫১৫-১৫৮৮)-ইনি একটি বই লিখেছিলেন। তাতে বলেছিলেন-'ডাইনি বলে যাদের ওপর অত্যাচার চলছে, এবং পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তারা আসলে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অসুস্থ। এইভাবে নিরপরাধ ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া ঘোরতর অপরাধ।' চার্চ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল এই গ্রন্থের ওপর এবং তা প্রযোজ্য ছিল বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

(২) রেজিন্যাল্ড স্কট (১৫৩৮-১৫৯৯)—ইনি ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। ডাইনির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন সেই গ্রন্থে। বইটির নাম 'ডাইনি আবিষ্কার' (The discovery of Witchcraft)। বইয়ের বক্তব্য ছিল এই : ডাইনি বলা হচ্ছে যে সব স্ত্রীলোকদের, তারা আসলে মানসিক রোগী। এদের কথাবার্তা আচার-আচরণ সবই মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ এবং এই মস্তিষ্ক বিকারের জন্যেই এদের সুস্থ বিচার বিবেচনার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকেই অবশ্য স্কটের এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সমর্থন করেননি, বরং উপহাস আর বিরোধিতাই করেছিলেন।

নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও খৃষ্টান ধর্মীয় সমাজেরও কিছু ব্যক্তি এই ডাইনি তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল (১৫৭৬-১৬৬০) নিজের জীবন বিপন্ন করেও প্রচার করেছিলেন মানসিক রোগ শারীরিক রোগ থেকে ভিন্ন নয়। খ্রীষ্ট ধর্মের উচিত এই রোগীদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা এবং এদের নিরাময় করা।

এইভাবে প্রায় দুশো বছরেরও বেশি যাবৎ এই ডাইনি তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার পর ইউরোপে ডাইনি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা অপসারিত হয়েছিল।

মানসিক রোগের হাসপাতাল ও সেগুলির সংস্কার

৭৯২ খৃষ্টাব্দে এবং এর সমসাময়িক সময়ে আরবদেশে মানসিক রোগীদের জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, সেগুলিতে মানবিক ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীদের আরোগ্য করার ব্যবস্থা ছিল। এগুলিকে অবশ্যই হাসপাতাল বলা যায়। কিন্তু মধ্যযুগে ষষ্ঠদশ

শৃঙ্খলিত রোগী

চিত্র-২০
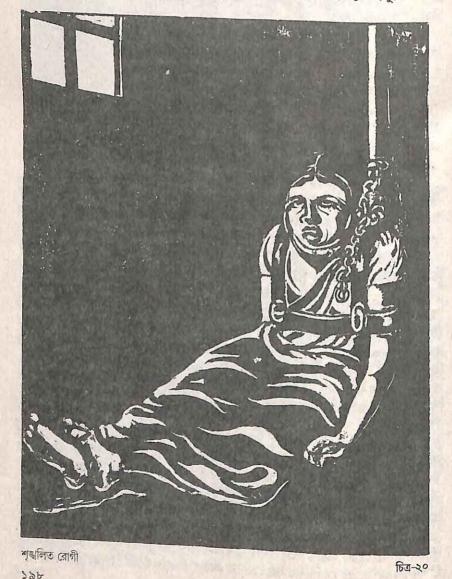
শৃঙ্খল মুক্তি

ফিলিপ্পি পিনেল (১৭৪৫-১৮২৬)

চিত্র-২১
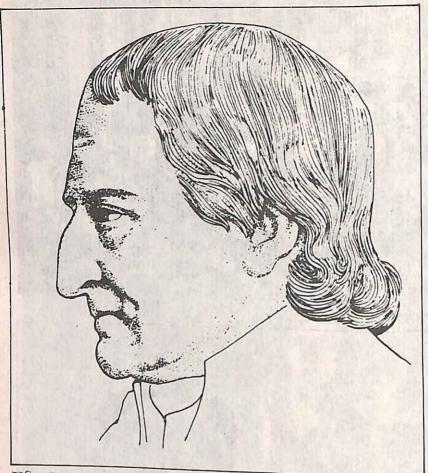
উইলিয়াম টুক (১৭৩২-১৮২২)

চিত্র-২২

শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মানসিক রোগীদের রাখা হত, সেগুলিকে ঠিক হাসপাতাল বলা চলে না। প্রথম দিকে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল, উন্মাদাগার বা উন্মাদ আশ্রম (Lunatic Asylum), পরে অবশ্য এদের নাম পরিবর্তন করে মানসিক হাসপাতাল বলা হয়েছে। মধ্যযুগের এই প্রতিষ্ঠানগুলি রোগীদের চিকিৎসার জন্যে নির্মিত হয়নি। হয়েছিল ডাইনিতে-ধরা লোকগুলিকে খোঁয়াড়ের মত জায়গায় আটকে রাখার জন্যে। সেখানে রোগীদের আষ্টেপৃষ্ঠে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত এবং চিকিৎসার নামে নানা দৈহিক আর মানসিক অত্যাচার চলত। পয়সার বিনিময়ে পর্যটকদের দেখানো হত এই সব রোগীদের—ঠিক যেভাবে চিড়িয়াখানায় দেখানো হয় জন্তু জানোয়ারদের।

তথাকথিত এই ধরনের মানসিক হাসপাতালগুলির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছিলেন ১৭৯২ সালে একজন ফরাসী-চিকিৎসক। সময়টা ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের শেষ অংশ। এই চিকিৎসকের নাম ফিলিপ্পি পিনেল (১৭৪৫-১৮২৬)। ইনি

প্যারি শহরের দুটি হাসপাতালের (বিসেত্রা আর সল্টপিটার) রোগীদের শৃঙ্খলমুক্ত করে দিয়ে দেখালেন, মুক্ত পরিবেশ মনের রোগ নিরাময়ে কতটা হিতকারী। তিনি বন্ধনমুক্ত রোগীদের উত্তম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম, উপযুক্ত কাজ, কাজের মাধ্যমে চিকিৎসা (occupational therapy) মনোরঞ্জন এবং মনোরম পরিবেশের ব্যবস্থা করলেন।

মানসিক রোগীদের মানবিক অধিকারকে স্বীকার করে নিয়ে যে দৃষ্টান্ত উনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলে পরবর্তীকালে অনেকেই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম টুক (১৭৩২-১৯১৯) নানা বাধা অতিক্রম করে ইংল্যাণ্ডে ইয়র্ক রিট্রিট প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে মনোরম শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, উপযুক্ত কাজ এবং

চিত্র-২৩

ডরোথি ডিক্স (১৮০২-১৮৮৭)

ক্লিফোর্ড বিয়ার (১৮৭৬-১৯৪৩)

চিত্র-২৪

বিশ্রাম মানসিক রোগ নিরাময়ের পক্ষে যে কতখানি উপযোগী, তা তিনি প্রমাণ করলেন।

ডরোথি ডিক্স (১৮০২-১৮৮৭) নামে আমেরিকার এক মহীয়সী মহিলা ১৮৪১ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রচারের মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের সামনে তুলে ধরলেন মানসিক হাসপাতালের দুরবস্থা এবং সেখানে রোগীদের ওপর অমানুষিক নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। সংগ্রহ করলেন প্রচুর অর্থ, তা দিয়ে আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে বহু আদর্শ হাসপাতাল স্থাপন করলেন। অনেক পুরাতন হাসপাতালেরও সংস্কার করেছিলেন ইনি।

১৯০৮ সালে ক্লিফোর্ড বিয়ার (১৮৭৬-১৯৪৩) একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই পুস্তকে তিনি নিজে মানসিক রোগী হিসেবে আমেরিকার তিনটি মানসিক রোগ চিকিৎসার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকা অবস্থায় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই পুস্তকটির নাম 'যে মন নিজেকে আবিষ্কার করেছিল' (The Mind That Found Itself)তখনকার ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসার করুণ অভিজ্ঞতার কথা তিনি

বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন এই গ্রন্থে। পরে তিনি সুস্থ হন, একজন পরিচারকের সহৃদয় ব্যবস্থার মধ্যে থেকে। নিদারুণ সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসার নামে যে সব ব্যবস্থা চালু ছিল—চিকিৎসার পক্ষে তা একেবারেই অনুপযুক্ত। এই লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং এগিয়ে এসেছিলেন প্রতিকারের জন্যে। আমেরিকার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস আর বিশ্ববিখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসক অ্যাডলফ মায়ার (Adolf Meyer) ছিলেন এঁদের মধ্যে। ১৯০৩ সালে মানসিক স্বাস্থ্যের জাতীয় সমিতি স্থাপন করেন ক্লিফোর্ড বিয়ার। এখন তা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

মস্তিষ্ক ও মনোবিকার

মস্তিষ্কের কাজের গোলযোগই যে মানসিক রোগের কারণ, এ বিষয়ে অনেক মনীষীই অনুমান করেছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করা শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে। এমিল ক্রেপিলিন (১৮৫৬-১৯২৬) খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন, মস্তিষ্কের গোলযোগেই মানসিক রোগের উদ্ভব হয়। ক্রেপিলিন সমস্ত মানসিক রোগগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন, প্রত্যেক মানসিক রোগের প্রকৃতি আলাদা। রোগগুলি কিভাবে শুরু হয়, তারা কি গতিতে বৃদ্ধি পায়, লক্ষণগুলি কি নিয়মে প্রকট হয় এবং পরিণামে কি ঘটে। যদি প্রতিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা যায়, তাহলেই তাদের ভিন্নতা ধরা পড়বে।

জেনারেল প্যারালিসিস অব দ্য ইনসেন (General Paralysis of the Insane) নামে একটা মানসিক ব্যাধির ওপর গবেষণা চালিয়ে রিচার্ড ক্রাফট এবিং (১৮৪০-১৯০২) ১৮৯৭ সালে প্রমাণ করলেন যে, মস্তিষ্কে সিফিলিসের আক্রমণের ফলেই এই রোগের উদ্ভব হয়।

১৯১৩ সালে নোগুচি (১৮৭৬-১৯২৮) জেনারেল প্যারালিসিসের রোগীদের মৃত্যুর পর সিফিলিসের জীবাণুর অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখান।

১৯১৭ সালে জুলিয়াস ওয়েগনার জোরেগ রোগীদের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিমভাবে ম্যালেরিয়া রোগের সৃষ্টি করে জেনারেল প্যারালিসিস রোগীদের সুস্থ করে প্রমাণ করলেন, শারীরিক চিকিৎসায় মানসিক রোগ সেরে যায়।

এর পর থেকে মানসিক রোগে যে সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটেছে, সেগুলি 'মানসিক রোগের চিকিৎসা'- এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে চিকিৎসার প্রবর্তকদের নাম আর তাঁদের প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ করা হচ্ছে।

ম্যানফ্রেড সেকেল (১৯০০-১৯৫৭)

১৯৩৫ সালে ইনসুলিন কোমা থেরাপির প্রবর্তন করেন।

মেডুনা (১৮৯৬-১৯৬৪)

১৯৩৫ সালে আক্ষেপ চিকিৎসা বা কনভালসিভ চিকিৎসার প্রবর্তন করেন।

চিত্র-২৫

এমিল ক্রেপিলিন (১৮৫৬-১৯২৬)
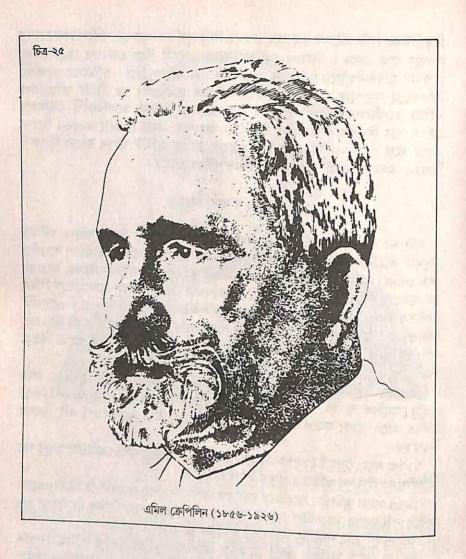
সারলেটি (১৮৭৭-১৯৬৩) এবং বিনি (১৯০৪-১৯৬৪)

১৯৩৮ সালে বৈদ্যুতিক আক্ষেপ চিকিৎসা বা ইলেকট্রিক কনভালসিভ থেরাপির প্রবর্তন করেন।

মনিজ (১৮৭৪-১৯৫৫)

১৯৩৫ সালে মানসিক রোগ নিরাময়ে মস্তিষ্কে শল্য চিকিৎসার প্রবর্তন করেন।

ডিলে (১৯০৭-) এবং ডেনিকার (১৯১৭-)

১৯৫২ সালে ওষুধ প্রয়োগে মানসিক রোগের চিকিৎসার প্রবর্তন করেন।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)
১৮৯৬ সালে মনঃসমীক্ষা —মনোচিকিৎসার প্রবর্তন করেন।

প্যাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬), থর্নডাইক (১৮৭৪-১৯৪৯) এবং স্কিনার (১৯০৪-১৯৯০)
এঁদের শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে উলপে, স্কিনার এবং সাপিরো ১৯৬০-এর দশকে আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসার প্রবর্তন করেন।

সমাপ্ত

নির্দেশিকা

জন্ম : ১৩ আগস্ট ১৯২১। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার পাহাড়পুর গ্রামে।

শিক্ষা : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রামের স্কুলে। ১৯৩৭-এ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এস-সি ক্লাশে প্রবেশ। আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি-বি-এস্, বিজ্ঞান কলেজ থেকে সাইকোলজিতে এম. এস্-সি এবং সাইকোলজিকাল মেডিসিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্-ডি ডিগ্রি লাভ। আধুনিক ভারতে মনঃসমীক্ষা চর্চার প্রবর্তক ডাঃ গিরিন্দ্রশেখর বসুর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও মনঃসমীক্ষায় ডিপ্লোমা। পরে গ্রেট ব্রিটেন থেকে ডি. পি. এম্ ও এফ্-আর-সি-পি।

কর্মজীবন : সাইকোলজি এবং সাইকোলজিকাল মেডিসিন-এ মেডিক্যাল কলেজ/ আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়ি বছর অধ্যাপনা করেছেন এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাজে ৪৪ বছর নিযুক্ত আছেন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের জাতীয় সংগঠনগুলির সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন এবং উপস্থিত ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির সভাপতির পদে আছেন।

গবেষণা : মনোরোগ বিষয়ে গবেষণার কাজে ৪০ বছর নিযুক্ত আছেন এবং দেশ ও বিদেশের নানা চিকিৎসা পত্রিকায় ৮০-এর অধিক গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং এইসব গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন।

প্রচ্ছদ □ নির্মলেন্দু মন্ডল